আমাদের গাছপালা

কৃষিবিদ শফিউল ইসলাম

আমাদের গাছপালা

web

আমাদের গাছপালা

কৃষিবিদ শফিউল ইসলাম

SANSDOC Library
Accession No. 21620
Date

শব্দশৈলী

আমাদের গাছপালা
কৃষিবিদ শফিউল ইসলাম

© প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০৮

প্রকাশক : ইফতেখার আমিন
শব্দশৈলী
৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৪১৬৫

বানান সমন্বয় : ঝন্টু চৌধুরী

বর্ণবিন্যাস : সাব্বির কম্পিউটার
৪৫ বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট
৪র্থ তলা ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ : সালমানী মুদ্রণ সংস্থা
নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ : ইফতেখার আমিন

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN : 984-8657-24-X

AMADER GACHPALA By Shafiul Islam Published By Iftakhar Amin;
Sobdhoshaily, 38/4, Banglabazar, Dhaka-1100.
Price : 150 BDT.
E-mail-Sobdhoshaily@yahoo.Com.

ভূমিকা

আমার মতো একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এ রকম একটি বিষয় নিয়ে বই লেখাকে দুঃসাহসিক উদ্যোগ বলেই মনে করি। তবুও কেন সেই কাজে হাত দিয়েছি তার একটা কৈফিয়ৎ অবশ্যই আছে। গাছের সঙ্গে পরিচয় শৈশবকালেই। গ্রামগঞ্জ-শহরতলি যেখানে যে ব্যাপারেই যাই না কেন— খুঁজে পেতে জেনেছি সেখানে কি ধরনের গাছপালা আছে। তাদের গায়ে হাত বুলিয়েও মনের শাধ মেটেনি। এক সময় জাতীয় সড়ক ধরে মাইলের পর মাইল হেঁটেছি। দু'পাশে গাছের সারির সঙ্গে পরিচিত হবার কামনায়। সে যে কি ঐশ্বর্যময় অনুভূতি। তা কি শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব! নিজে অবাক হয়ে ভাবি, আমার শৈশব এখনও বেঁচে আছে। বেঁচে আছে সেই বালকটি, একটি গাছকে কাটতে দেখলে যার চোখ দিয়ে নেমে আসত জলের রেখা। যে নদীর বুকে ভেসে বেড়াত মাছের সঙ্গী হয়ে। সে এখনও ঘুরে বেড়ায় গ্রাম বাংলার পথে পথে। এখনও প্রকৃতির ঐশ্বর্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চায়। কত গাছের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। এক একটি গাছের এক এক রকম পাতা, ফুল, ফল, গন্ধ। সে সব ইতিহাস হয়ে যায়নি। কিছুই হারায়নি। আজ হঠাৎ তাদের ডাক পড়ল বইয়ের পাতায়। বাংলার ঐশ্বর্যময় প্রকৃতি উজ্জ্বল উপস্থিতিতে তার চিরনবীন হাতছানি আমাকে এক অসীম সুন্দরের জগতে আনন্দের সন্ধান দিল নতুন করে। নিজের জানা গাছের কথা লিখতে গিয়ে হেরে গেলাম। তা নিয়ে কবিতা হতে পারে মাত্র। গাছের বর্ণনা লেখা যায় না। সে সব বইপত্র একদিন পড়েছি। তাদের পাতায় পাতায় রয়েছে গাছদের জীবনকথা। সেইসব নথি সংগ্রহ করতে থাকি দিনরাত জেগে। নতুন করে প্রকৃতি পাঠের 'হাতেখড়ি' হলো যেন। কোন জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনা নয়, খুবই সাধারণভাবে গাছদের কথা বলা। কিছু ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে তা অস্বাভাবিক নয়। পাঠকদের কাছে নিবেদন, ক্ষমা করে দেবেন। অক্ষমতাকে মার্জনা করবেন। যেসব বই আমার লেখালেখির সূত্র তাদের তালিকাও দেওয়া হলো বইয়ের শেষে।

সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কৃষিবিদ শফিউল ইসলাম

সূচিপত্র

অর্জুন	৯
অনন্তমূল	১১
অশোক	১২
অশ্বগন্ধা	১৪
অড়হর	১৫
আকন্দ	১৬
আগর	১৮
আদা	১৯
আপাং	২০
আমলিক	২১
উলটকম্বল	২৩
উলটচন্ডাল	২৫
একাংগি	২৬
কদবেল	২৭
কনকচাঁপা	২৮
করবী	২৯
কর্পূর	৩০
কামিনী	৩১
কারান্‌জা	৩২
কালকাসুন্দা	৩৪
কালোজিরা	৩৫
কালোজাম	৩৬
কালোমেঘ	৩৭
কুঁচিলা	৩৯
কুড়চি	৪০
কুমারীলতা	৪১
কুসুম	৪২
ক্যালেন্ডুলা	৪৩
খয়ের	৪৪
গন্ধবাদালি	৪৬
গিলা	৪৭
গোলমরিচ	৪৮
গোলাপ	৪৯
গুলঞ্চ	৫১
গাঁদা	৫২
ঘোড়া নিম	৫৩
ঘৃতকুমারী	৫৪
চই	৫৬
চালতা	৫৭
ছাতিম	৫৮
জবা	৬০
জৈন/যোয়ান	৬১
ডালিম	৬২
তেজপাতা	৬৩
তেজবল	৬৫
তেঁতুল	৬৬
তেলাকুচা	৬৭
তোকমা	৬৮
তুলসী	৬৯
থানকুনি	৭১
দারুচিনি	৭২
ধনিয়া	৭৩
ধাইফুল	৭৫
ধুতুরা	৭৬
নয়নতারা	৭৭
নাগেশ্বর	৭৮

নিম ৮০
নিশিন্দা ৮২
পাথরকুচি ৮৩
পান ৮৪
পিতরাজ ৮৫
পিপুল ৮৬
পুদিনা ৮৭
পুনর্ণবা ৮৯
বকফুল ৯০
বহেড়া ৯১
বাসক ৯৩
বিছুটি/ আলকুশী ৯৪
বিষকাঁটালি ৯৫
বেল ৯৬
ভেরেন্ডার ৯৮
ভূঁইকুমড়া ৯৯
ভৃঙ্গরাজ ১০০
মেহগনি ১০২
মেথী ১০৩
মেহেদী ১০৫
মুথা ১০৬
মুন্ডি/ছাগলনাদী ১০৭
মৌরি ১০৮
রক্ত চন্দন ১০৯
রসুন ১১০
রাম তুলসী ১১১
রীঠা ১১৩
লজ্জাবতী ১১৪
লেমনগ্রাস ১১৫
শঠী ১১৬
শতমূলী ১১৭
শিমুল ১১৯
শেফালী/শিউলী ১২০
শ্বেত চন্দন ১২১
শ্বেতদ্রোণ ১২৩
সাজনা ১২৪
সর্পগন্ধা ১২৫
সিন্দুরী ১২৭
সুপারি ১২৮
সোনাপাতা ১২৯
সোনালু ১৩০
হলুদ ১৩১
হাড়জোড়া ১৩৩
হরিতকি ১৩৪
১০০টি উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত তথ্য ১৩৬
অঞ্চলভিত্তিক ঔষধি উদ্ভিদের তালিকা ১৪৭
মেয়াদভিত্তিক ঔষধি উদ্ভিদের তালিকা ১৫৭
সহায়ক গ্রন্থ ১৫৯

১. অর্জুন

সংস্কৃত নাম : অর্জুনা
Botanical Name : *Terminalia arjuna (Roxb.) W. & A.*
Common Name : *Arjun*
English Name : *Arjuna Myrobalan*
Family : *Combretaceae.*

পরিচিতি : অর্জুন বৃহদাকৃতির পত্রঝরা বৃক্ষ। উচ্চতায় এটি ২৫ মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। গাছটির মাথা ছড়ানো, ডালগুলি নিচের দিকে ঝুলানো থাকে, বাকল মসৃণ। অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন মাসে পাতা ঝরে এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে নতুন পাতা গজায়। ছাল খুব মোটা এবং ধূসর বর্ণের। ফল দেখতে কামরাংগার মতো তবে আকারে ছোট।
রাসায়নিক উপাদান : ছালে প্রচুর অ্যালকালয়ডীয় ও গ্লাইকোসাইডীয় উপাদান, স্যাপোজেনিন, ফ্ল্যাভোন, ল্যাকটোন, উদ্বায়ী তৈল ও জৈব এসিড বিদ্যমান।
প্রাপ্তিস্থান : এটি বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে প্রায় সর্বত্র বিশেষত রাস্তার দু'পাশে এবং চট্টগ্রাম ও সিলেটের বনাঞ্চলে প্রচুর অর্জুন গাছ জন্মে থাকে।
চাষাবাদ : অর্জুনের বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা যায়। বাংলাদেশের সর্বত্র রাস্তার দু'পাশে ও বনাঞ্চলে লাগানো হয়। এপ্রিল-মে মাসে ফুল ফোটে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে ফল পাকে। তখন বীজ সংগ্রহ করে ব্যাগে চারা উত্তোলন করা যায়। পরিপক্ব ফল থেকে বীজ সংগ্রহের পর তা ভালভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে ৬-১২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। বীজ বপনের পূর্বে কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে বীজতলায় বপন করতে হয়। বীজতলার মাটি ও গোবরের অনুপাত হবে ৩ ঃ ১। তাছাড়া ব্যাগে একই মিশ্রণে পুঁতে চারা উৎপাদন করা যায়। অঙ্কুরিত চারার বয়স ৮-৯ মাস হলে তা রোপণ করা উত্তম। বর্ষার শুরুতেই নির্দিষ্ট স্থানে চারা রোপণ করতে হয়। স্ট্যাম্প কাটিংয়ের মাধ্যমেও এর বংশ বিস্তার করা যায়। ১৫ মাস বয়সী চারা থেকে ২০ সে.মি. লম্বা মূল এবং ৫ সে.মি. লম্বা বিটপ কেটে নিয়ে ব্যাগে/পটে চারা তৈরি করা হয়।
লাগানোর দূরত্ব : ২০ থেকে ৩০ ফুট।
উপযোগী মাটি : আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া অর্জুন গাছের জন্য উপযোগী। সাধারণত দো-আঁশ মাটিতে এ গাছটি ভালো হয়ে থাকে।
বীজ আহরণ ও সংরক্ষণ : সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাসে পরিপক্ব ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। পরিপক্ব ফল থেকে বীজ সংগ্রহের পর তা ভালভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে ৬-১২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।
প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ১০০ থেকে ১৫০টি।
ছাল সংগ্রহের সময় : অর্জুন ছাল শরৎকাল অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিনে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) সংগ্রহ করতে হয়।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : পরিপক্ব গাছ থেকে ছাল উঠিয়ে (সংগ্রহ করে) ছোট ছোট টুকরা করে নিতে হবে। অতঃপর ৪-৫ দিন রৌদ্রে শুকিয়ে চটের বস্তায় ভরে শুষ্ক স্থানে

রেখে দিলে ১ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় এবং এর কার্যকারিতা অটুট থাকে। তাছাড়া বীজ পুরোপুরিভাবে পরিপক্ব গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। অতঃপর সংগৃহীত বীজ ভালভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে বায়ুরোধী পাত্রে রেখে ১ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : প্রধানত ছাল, তবে ক্ষেত্র বিশেষে পাতা ও ফল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : অর্জুন গাছের ছাল হৃদরোগের মহৌষধ। এছাড়াও ছাল রতি শক্তিবর্ধক এবং শুক্রমেহ রোগে বিশেষ উপকারী। আঘাতজনিত ব্যথায় অর্জুন ছাল প্রলেপ এবং ক্বাথ সেবনে উপকারী। অর্জুন ছালের ক্বাথ দ্বারা কুলি করলে দাঁতের গোড়া শক্ত থাকে। অর্জুন পাতা, ফল ও ছাল সেবনে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়। বর্তমান বাজারে এর অনেক পেটেন্ট ঔষধ পাওয়া যায়। অর্জুন ছাল ভালভাবে বেটে চিনি ও গরুর দুধের সাথে প্রতিদিন সকাল-বিকাল খেলে হৃদরোগ এবং বুক ধড়ফড় কমে যায়।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- রক্তে নিম্নচাপ থাকলে অর্জুনের ছালের রস সেবনে উপকার হয়।
- রক্তক্ষরণে ৫-৬ গ্রাম ছাল রাতে পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে ছেঁকে পানি খেলে আরোগ্য হয়।
- শ্বেত বা রক্ত প্রদরের ছাল ভিজানো পানি আধ চামচ কাঁচা হলুদের রস মিশিয়ে খেলে রোগের উপশম হয়।
- ক্ষয় কাশে অর্জুনের ছালের গুঁড়া বাসক পাতার রসে ভিজিয়ে ঘি, মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- রক্ত আমাশয় অর্জুন ছালের চূর্ণ ছাগলের দুধ মিশিয়ে খেলে সেরে যায়।
- এছাড়া হাঁপানিতে অর্জুন ফল টুকরো করে তামাকের মতো ধোঁয়া টানলে উপকার পাওয়া যায়।
- হার্নিয়াতে অর্জুন ফল কোমরে বেঁধে রাখলে উপকার পাওয়া যায়। কাঁচা পাতার রস সেবনে আমাশয় রোগ ভাল হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : অর্জুন গাছ সাধারণত ৪-৫ বছরে পরিপক্ব হয় তবে পূর্ণাঙ্গ পরিপক্ব হতে ১০ বছর সময় প্রয়োজন।

অন্যান্য ব্যবহার : অর্জুন কাঠ খুব শক্ত। গরুর গাড়ির চাকা, নৌকা, নৌকার দাঁড় ইত্যাদি বানানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্র তৈরিতেও অর্জুন কাঠ ব্যবহার হয়।

আয় : একটি প্রাপ্তবয়স্ক অর্জুন গাছে ৫০-৭০ কেজি ফল পাওয়া যায়, যার বাজার মূল্য প্রায় ১০০০ টাকা। একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছ থেকে বছরে ৬০-৮০ কেজি শুকনো ছাল সংগ্রহ করা যায়, যার বাজার মূল্য কমপক্ষে ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা। এছাড়াও একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছ এককালীন ৩,০০০-২০,০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রয় করা সম্ভব।

২. অনন্তমূল

সংস্কৃত নাম : কারিবা
Botanical Name : *Hemidesmus Indicus (Linn.) R. Br.*
Common Name : *Anantamool*
English Name : *Indidan Sarsaparilla*
Family : *Asclepiadaceae*

পরিচিতি : সরু এবং লতা জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা লোমযুক্ত এবং কাণ্ডের দু'দিকে জন্মায়। কিছুটা ডিম্বাকৃতির অথবা লম্বা এবং আগার দিকটা মোটা থাকে। ফলের বাইরের দিকের রঙ সবুজ আর ভেতরে বেগুনি। বীজ ছোট ও চ্যাপ্টা, রঙ কালো। গাছের পাতার মাঝখানে সাদা দাগ থাকে।

রাসায়নিক উপাদান : মূলের প্রধান উপাদান কুমারিন ও উদ্বায়ী তেল। তাছাড়াও এতে স্টেরল, টার্পিন, অ্যালকোহল, লুপিয়ল, স্যাপোনিন ও ট্যানিন বিদ্যমান।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ভারত ও মিয়ানমার এর আদি বাসস্থান। ঢাকা ও ময়মনসিংহের শালবনে এ গাছ বেশি দেখা যায়।

চাষাবাদ : সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকলে সে সময়ই চাষাবাদ করা যায়। বীজ থেকে চারা তৈরি করে লাগানো যায়। তবে অঙ্গজ অংশের মাধ্যমে এর বংশ বিস্তার করা হয়। বর্ষা মৌসুমের পূর্বে বীজ বপন করতে হয়।

লাগানোর দূরত্ব : ৪ ফুট অন্তর চারা লাগাতে হয়।

উপযোগী মাটি : এঁটেল মাটিতে এই গাছ ভালো জন্মে।

বীজ আহরণ ও সংরক্ষণ : সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকলে তা থেকে বীজ সংগ্রহ/সংরক্ষণ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ১৫০,০০০ থেকে ১৬০,০০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সেপ্টেম্বর মাসে বীজ সংগ্রহের পর সাথে সাথে লাগাতে হবে। কারণ বীজ সংরক্ষণ করা যায় না।

ব্যবহার্য অংশ : মূল।

উপকারীতা/লোকজ ব্যবহার : অনন্তমূল রক্ত পরিষ্কারক, বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ-খুজলি, পাঁচড়া, চুলকানি, দাঁদ এবং পুরাতন সিফিলিস ও কুষ্ঠ রোগে, পরিপাক শক্তি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি করে এবং পুরাতন বাত রোগে, জ্বর ও শ্বাস রোগে, সন্ধিবাত, বিষাক্ত ক্ষত ও জরায়ুর বিভিন্ন রোগে অনন্তমূল অত্যন্ত উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহার হয় :

- **অর্শ :** তিন গ্রাম অনন্তমূল বেটে গরুর দুধের সঙ্গে জ্বাল দিয়ে দই পাততে হবে। সন্ধ্যার সময় এটা করা দরকার। পরের দিন সে দই খেলে অর্শ-রোগে অবশ্যই উপকার হবে। সে সাথে খাবারে রুচি এবং ক্ষিদেও বাড়বে।
- **পাথুরীর যন্ত্রণা :** গরুর দুধ দিয়ে ২/৩ গ্রাম অনন্তমূল বেটে খাওয়ালে খুব তাড়াতাড়ি রোগী অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পায়।

- **জিহ্বাক্ষত :** ২০ মিলিমিটার ভেড়ার দুধে শুকনো অনন্তমূল ঘষে মাঝে মাঝে ক্ষতস্থানে লাগালে জিভ ও মুখের ঘা সারে।
- **অনিয়মিত ঋতু :** নির্দিষ্ট দিন চলে গেলেও মাসিক হয় না। অসময়ে এবং পনের থেকে ২০ দিন দেরিতে হলেও পরিমাণে খুব কম হয় এবং স্রাবে দুর্গন্ধ থাকে। তিন গ্রাম অনন্তমূল সামান্য পানি দিয়ে বেটে এক কাপ জ্বাল দেয়া গরুর ঠাণ্ডা দুধে মিশিয়ে সকাল-বিকেল মোট দুবার খাওয়ালে ঋতু নিয়মিত হবে এবং স্রাবে কোন দুর্গন্ধও থাকবে না।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৬ থেকে ৮ মাসেই এই গাছ পরিপক্ব হয়ে থাকে।
আয় : প্রতি একর জমিতে ৬০,০০০ টাকা থেকে ৭০,০০০ টাকা।

৩. অশোক

সংস্কৃত নাম : অশোকা
Botanical Name : *Saraca indica Linn.*
Common Name : *Ashok*
English Name : *Ashoka*
Family : *Leguminosae*

পরিচিতি : অশোক মাঝারি আকৃতির চিরসবুজ, বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট ছায়াতরু বৃক্ষ। কাণ্ড মসৃণ, ধূসর ও উন্নত। বর্তমানে বিভিন্ন বাগানের শোভা বর্ধনের জন্য অশোক গাছ লাগানো হয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন রাস্তার ধারে রোপণ করতে দেখা যায়। পূর্ণ বয়স্ক গাছ ২৫ থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা বিরাট আকৃতির ৫ থেকে ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। ডাঁটায় সাধারণত ৫-৬ জোড়া পাতা হয়। কচি পাতার বর্ণ কালচে ও তামাটে হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে লালচে কমলা রঙের ফুল হয়।

রাসায়নিক উপাদান : ছালে প্রচুর পরিমাণ ট্যানিন, হিমাটক্সাইলিন ও খনিজ দ্রব্য বিদ্যমান। এছাড়া এতে কিটোস্টেরল এবং স্যাপোনিন বিদ্যমান।

প্রাপ্তিস্থান : অশোক ভারত, মিয়ানমার ও বাংলাদেশসহ বিভিন্ন অঞ্চলের বাগানে কিংবা পথের ধারে লাগানো হয়। এছাড়াও চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে এ গাছ বেশি দেখা যায়। এইসব অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবেই এ গাছ জন্মে থাকে।

চাষাবাদ : বীজের মাধ্যমে এটির বংশ বিস্তার ভাল হয়। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে এই গাছের ফল পেকে যায়। ফল থেকে বীজ সংগ্রহের পর তা রৌদ্রে শুকিয়ে বীজতলায় বা ব্যাগ/পটে লাগানো উত্তম। কারণ এর বীজ বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না।

লাগানোর দূরত্ব : ১৫ থেকে ২০ ফুট।
উপযোগী মাটি : সাধারণত দো-আঁশ মাটিতে এ গাছটি ভালো হয়ে থাকে, পাহাড়ি অঞ্চলের মাটিতে জন্মাতে দেখা যায়।
প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ৫৫০-৬৫০টি।
বীজ আহরণ ও সংগ্রহের সময় : বীজের মাধ্যমে এটির বংশ বৃদ্ধি ভালো হয়। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে এই গাছের ফল পেকে যায়। ফল থেকে বীজ সংগ্রহের পর তা রৌদ্রে

শুকিয়ে বীজতলায় বা ব্যাগে লাগানো উত্তম। এর বীজ বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বৃক্ষ বড় হয়ে পরিপূর্ণ ছাল হওয়ার পরে ছাল ধারালো ছুরি দিয়ে এমনভাবে সংগ্রহ করতে হবে যেনো বৃক্ষের ভিতরের অংশের কোন ক্ষতি না হয়। ছাল পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর কাটা ছাল রৌদ্রে শুকিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে প্যাকেট করে বাজারজাত করতে হবে। এক্ষেত্রে শতকরা ২ ভাগ আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে। প্যাকেটের গায়ে সংগ্রহের তারিখ, উৎসস্থল, শনাক্তকরণ এবং ব্যবহারের শেষ সময় অবশ্যই উল্লেখ রাখতে হবে।

ছাল সংরক্ষণের সময় : শরৎকাল অর্থাৎ আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস।

ব্যবহার্য অংশ : সাধারণত অশোক গাছের ছাল ব্যবহৃত হয়। তবে ফুল এবং বীজও ব্যবহার করা হয়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : রোগের বিভিন্ন যন্ত্রণা উপশমে এই গাছ বিশেষ কার্যকরী। কবিরাজগণ অশোকের ত্বককে স্ত্রীলোকের যাবতীয় ঋতুস্রাবলীন সমস্যার মূল্যবান ঔষধ বলে নির্দেশ করেছেন।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- জরায়ুঘটিত যে কোন রোগে অশোক ভাল নিরাময়ক।
- প্রস্রাব বন্ধ হলে অশোকের একটি বীজ ঠাণ্ডা পানিসহ বেটে খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- অত্যন্ত পিপাসা বোধ করলে অশোকের কিছু ছাল বেটে কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপরে ঐ পানি অল্প করে ৩/৪ বার চুমুক দিয়ে পান করলে পিপাসা বোধ কমে আসে।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৪-৫ বছরে পরিপক্ব হয় তবে পূর্ণাঙ্গ পরিপক্ব হতে ৮-১০ বছর সময় প্রয়োজন।

অন্যান্য ব্যবহার : হিন্দু সম্প্রদায় অশোক গাছকে পবিত্র মনে করে বলে মন্দিরের প্রাঙ্গণে এ গাছ লাগানো হয়। অন্য কাঠের তুলনায় নরম বলে অশোক কাঠের ব্যবহার সীমিত। জ্বালানি এবং কাগজের মণ্ড হিসেবে এ কাঠ ব্যবহার করা যায়। অশোক গাছের শিম জাতীয় ফল উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য।

চাহিদা : ঔষধ শিল্পে এর বাৎসরিক চাহিদা ১২,০০,০০০ কেজি এবং সাধারণ শিল্পে এর বাৎসরিক চাহিদা ১০,০০,০০০ কেজি।

আয় : বাণিজ্যিকভাবে অশোক চাষ আমাদের দেশে কোথাও দেখা যায় না। একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছ থেকে বছরে ২০০০ টাকার ছাল, বীজ ও ফুল পাওয়া সম্ভব।

৪. অশ্বগন্ধা

সংস্কৃত নাম : অশ্বগন্ধা
Botanical Name : *Withania somnifera Dunal.*
Common Name : *Ashwagandha*
English Name : *Winter Cherry*
Family : *Solanaceae*

পরিচিতি : অশ্বগন্ধা ঝোপ জাতীয় গাছ এবং এর মূল ব্যবহৃত হয়। এর মূল আঙুলের ন্যায় এবং ভাঙলে ভিতরে সাদা দেখা যায়। পাতা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু ও ডাঁটার গা শুষ্ক সাদা লোমযুক্ত। এ গাছ উচ্চতায় ও গঠনে অনেকটা বেগুন গাছের মতো। সাধারণত ৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। গাছের যে অংশে পাতা বের হয় সেখান থেকে সবুজ বহিরাবরণে ঢাকা মটরের মতো ফল হয়। ফুল সবুজের আভাযুক্ত। ফল গোলাকার সবুজ, পাকলে লাল বর্ণ ধারণ করে। বীজ মসৃণ ও চ্যাপ্টা। শিকড় নরম ও ঘোড়ার গন্ধের মতো বলে একে অশ্বগন্ধা বলা হয়। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অশ্বগন্ধা চীনের জিনসেং অপেক্ষা অধিক কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। অশ্বগন্ধার শিকড় ও বীজ ব্যবহৃত হয়। অক্টোবর-মে মাসে ফুল আসে এবং জুন-আগস্ট মাসে ফল পাকে।

প্রাপ্তিস্থান : কোন কোন কবিরাজের বাড়িতে পাওয়া যায়। বুনো অবস্থায় পাওয়া যায় না বললেই চলে। বর্তমানে নাটোর, বগুড়াসহ দেশের উত্তরাঞ্চল ও ভাওয়াল (ভাওয়াল ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত) অঞ্চলে পাওয়া যায়।

চাষাবাদ : জুন-আগস্ট মাসে পরিপক্ব ফল/বীজ সংগ্রহ করে সেই বীজ ছিটিয়ে অথবা বীজ থেকে চারা তৈরির মাধ্যমে অশ্বগন্ধা চাষ করা যায়। এই গাছ পানিবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় পানি জমতে পারে না এরকম জায়গায় বীজ ছিটানো বা চারা রোপণ করতে হবে। এছাড়াও নিয়মিত পরিচর্যা এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচ প্রয়োজন বিধায় সমতল উঁচু জমিতে চাষ করা ভালো।

লাগানোর দূরত্ব : ২ থেকে ৩ ফুট।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে এ গাছ জন্মে তবে বেলে-দোআঁশ মাটিতে ভাল জন্মে।

বীজ আহরণ : জুন-আগস্ট মাসে ফল পাকলে সে ফল সংগ্রহ করে ফলের উপরের আবরণ ফেলে দিয়ে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : চার থেকে পাঁচ হাজার।

ব্যবহার্য অংশ : অশ্বগন্ধার মূল/শিকড় ব্যবহার হয়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : অশ্বগন্ধা বলকারক, মোটাকারক, বীর্য বর্ধক, যৌন উত্তেজক ও জরায়ুর শক্তিবর্ধক। শুক্র দৌর্বল্য, বাত, রক্তচাপ, শোথ, ভ্রম ও অনিদ্রা, শ্বাসকষ্ট, কাশ, ব্রঙ্কাইটিস, কোমর ও বাত ব্যথায় উপকারী। প্রসূতিকে প্রসবান্তে অশ্বগন্ধা সেবন করালে বিশেষ উপকার হয়।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- শোথ রোগ হলে চার গ্রাম পরিমিত অশ্বগন্ধার মূলচূর্ণ ঘি ও মধুসহ খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- কফ রোগে তিন গ্রাম পরিমিত অশ্বগন্ধার মূলচূর্ণ গরম পানির সংগে খেলে কফ রোগ ভালো হয়।
- শ্বাস রোগে অশ্বগন্ধার মূলের ছাই, মধুসহ খেলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৬-৭ মাসেই পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অশ্বগন্ধার মূল চীনের জিনসেং অপেক্ষা অধিক কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া গাছ জ্বালানি পশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

আয় : প্রতি একর জমিতে বার্ষিক ৮০,০০০ টাকা থেকে ১০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

৫. অড়হর

Botanical Name : *Cajanus cajan Mill.*
Common Name : *Arhor*
English Name : *Pigeon Pea*
Family : *Leguminosae.*

পরিচিতি : অড়হর শাখা-প্রশাখাযুক্ত গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। ২ থেকে ২.৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। গাছ শক্ত হলেও শাখা-প্রশাখা নরম। প্রতিটি বৃন্তে ৩টি করে পাতা থাকে। পাতাগুলো ৫-৭ সে.মি. লম্বা ও ১-১.৫ সে.মি. বা আধা ইঞ্চি চওড়া এবং নিচের দিকে অপেক্ষাকৃত সাদা হয়।

রাসায়নিক উপাদান :

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশ, ভারতসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ গাছ দেখা যায় বা জন্মে। তবে ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহারে এর ব্যাপক চাষ হয়। বাংলাদেশের সমগ্র এলাকায় বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় জুম ও বন বিভাগের বাগানে সেবক *(Nurse Crop)* গাছ হিসেবে অড়হর গাছ চাষ করা হয়।

চাষাবাদ : এপ্রিল-মে মাসে জমি উত্তমরূপে তৈরি করে জমিতে বীজ ছিটিয়ে অড়হর বপন করতে হয়। জুলাই-আগস্ট মাসে গাছে ফুল হয়। মার্চ মাসে ফল পরিপক্ব হয়।

লাগানোর দূরত্ব : ২-৩ ফুট দূরত্বে বপন/রোপণ করতে হবে।

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ।

বীজ আহরণ ও সংগ্রহের সময় : জুলাই-আগস্ট মাসে হলুদ রঙের ফুল ফোটে। প্রতিটি ফলে ৩/৫টি বীজ/অড়হর থাকে। হালকা রোদে শুকালে বীজ আলাদা হয়ে যায়। বীজ ৪/৫ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। এপ্রিল-মে মাসে বীজতলায় অথবা রোপণ স্থানে সরাসরি বীজ বপন করা হয়। বীজ ৭-৮ দিনের মধ্যে গজায় এবং ভাল বীজের অংকুরোদগম হার

শতকরা ৭০-৮০ ভাগ। বীজ বপনের আগে ২৪ ঘণ্টা তা পানিতে ভিজিয়ে নিলে অংকুরোদগম ভাল হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ১০০০-১২০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : ফল পরিপক্ব হবার পর গাছ গোঁড়া থেকে কেটে নিয়ে ফলের মধ্যকার বীজ পৃথক করা হয়। তারপর নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় শুকিয়ে নিয়ে তাকে সংরক্ষণ করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ : ফুল, পাতা, ডাল, মূল, বীজ ইত্যাদি।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : অড়হর পাভার রস হেপাটাইটিসজনিত যকৃতের প্রদাহে বা জণ্ডিস রোগে অতি প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে অনন্য একটি ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এছাড়া অরুচি, অর্শরোগ, কাশি ও ফোলাতেও উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- **জণ্ডিস বা কমলা রোগে :** অড়হর পাতার রস ২/৩ চা চামচ একটু লবণ মিশিয়ে খাবার পর সামান্য গরম করে একবার খেতে হবে।
- **অরুচিতে :** ডালের জুস পরিমাণমতো আদা, মরিচ, অল্প লবণ মিশিয়ে দিনে এক দেড় কাপ অল্প অল্প করে খেতে হবে।
- **অর্শরোগে :** পাতার রস ২ চামচ একটু গরম করে সকাল-বিকেল ২ বার খেতে হবে। সাথে সাথে যদি অড়হর ডালের জুস ঘিয়ে ভেজে খাওয়া যায় আরো ভাল।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ১০ মাস।

অন্যান্য ব্যবহার : অড়হর ডাল হিসাবে পুষ্টিকর খাদ্য। ডালপালাসহ পুরো গাছ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহর করা যায়।

আয় : প্রতি একর জমিতে ২০,০০০ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকা।

৬. আকন্দ

সংস্কৃত নাম : আক, আর্ক
Botanical Name : *Calotropis gigantea R.Br.*
Common Name : *Akonda, Baro Akonda*
English Name : *Gigantic swallow wort*
Family : *Asclepiadaceae.*

পরিচিতি : আকন্দ মাঝারি ধরনের ঝোপ জাতীয় উদ্ভিদ। ৫ থেকে ৭ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। গাছের ছাল ধূসর বর্ণের এবং কাণ্ড শক্ত ও কচি ডাল লোমযুক্ত। পাতা ৪ থেকে ৮ ইঞ্চি লম্বা উপরিভাগ মসৃণ ও নিচের দিক তুলোর ন্যায় লোমাচ্ছাদিত সাদা সবুজাভ। ক্ষুদ্র বৃন্ত এবং বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। গাছের পাতা ও শাখা ভাঙ্গলে দুধের মতো সাদা আঠা বের হয়। পুষ্পদণ্ড বহু শাখাবিশিষ্ট অনেকগুলো সাদা বা ঘেগুনি বর্ণের ফুল হয়। ফল ডিম্বাকৃতির ও টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা, ৩ থেকে ৪ ইঞ্চি লম্বা হয়।

রাসায়নিক উপাদান : পাতায় এনজাইম সমৃদ্ধ তরুক্ষীয় বিদ্যমান, এতে বিভিন্ন গ্লাইকোসাইড, বিটা-এমাইরিন ও স্টিগমাস্টেরল আছে।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আকন্দ জন্মে।

চাষাবাদ : মে-জুন মাসে ফল পাকলে ফেটে বীজ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এ সময়ই চাষাবাদের জন্য সঠিক সময়। ব্যাপক চাষাবাদের জন্য বীজ হতে বংশবিস্তার করাই উত্তম। কাণ্ডের কাটা অংশ (কাটিং) দ্বারাও বংশবিস্তার হয়। কাটিং সংগ্রহ করে বছরের যে কোন সময় মাটি ও গোবর মিশ্রিত (৩ ঃ ১) বীজতলায় লাগিয়ে প্রয়োজনমতো পানি দিলে অনায়াসে চারা গজায়। শুকনো মাটিতেও চাষ সম্ভব।

লাগানোর দূরত্ব : ২ থেকে ৪ ফুট।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে আকন্দ গাছ জন্মে থাকে।

বীজ আহরণ : সারা বছর ফুল ফুটলেও ফুলের প্রকৃত সময় ফেব্রুয়ারি-মার্চ এবং ফল সংগ্রহ করতে হয় মে-জুন মাসে। ফলের ভিতর তুলা থাকে এবং তুলার ভিতর হালকা বীজ থাকে।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ১৩৫,০০০ থেকে ১৪০,০০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বীজ থেকে বংশ বিস্তার সম্ভব হলেও সাধারণত এর মোথা এবং সাকার/পুঁকির অংশ থেকেই বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। সংরক্ষণের প্রয়োজন পড়ে না।

ব্যবহার্য অংশ : ফুল, পাতা, শিকড় ও আঠা।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : আকন্দ চুলের রোগ, ব্যথা এবং বিষনাশে বিশেষ কার্যকরী। দাদ ও টাকপড়া নিবারক। আকন্দের কষ তুলায় ভিজিয়ে লাগালে দাঁত ব্যথা দূর করে এবং যোনিতে ধারণ করলে গর্ভপাত ঘটায়। আকন্দ বাত বেদনা নিবারক ও ফোলা অপসারক। আকন্দ পাতা ও হলুদের তৈরি বড়ি শোথ/ ফোলা/পাণ্ডু রোগনাশক এবং রস কৃমিনাশক।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- অম্বল/এসিডিটি দেখা দিলে—০.৬৫ গ্রাম পরিমাণ আকন্দ পোড়া ছাই পানিসহ পান করলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়।
- **পেট কামড়ানি বা পেট জ্বালায়**– আকন্দ পাতার সোজা দিকে সরিষার তেল মাখিয়ে পাতাটি অল্প গরম করে পেটের উপর রাখলে বা ছেঁক দিলে পেট কামড়ানো বা পেট জ্বালা বন্ধ হয়।
- **শুল ব্যথায়**– আকন্দ পাতার সোজা দিকে সরিষার তেল মেখে অল্প গরম করে পেটের উপর ধরলে পেটের শূল ব্যথা ভাল হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৬ থেকে ৮ মাসেই গাছ পরিপক্ব হয়ে থাকে।

অন্যান্য ব্যবহার : আকন্দ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

বিশেষ ব্যবহার : আকন্দের শিকড় দাঁতের মেছওয়াক বিশেষ উপকারী।

আয় : প্রতি একর জমিতে বার্ষিক ৮০,০০০ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

৭. আগর

সংস্কৃত নাম : অগুর
Botanical Name : *Aquillaria malaccensis Lamk.*
Common Name : *Agor*
English Name : *Agarwood*
Family : *Thymeliaceae.*

পরিচিতি : আগর একটি মাঝারি আকৃতির চিরসবুজ বৃক্ষ। উচ্চতায় এটি ৩০-৫০ ফুটের মতো হয়ে থাকে। গাছের ছাল পাতলা ও বহিরাবরণ খসখসে। কাঠ নরম ও সাদা বর্ণের। পাতা সরল ও পাতলা, অগ্রভাগ ক্রমশ সরু। একই পুষ্পদণ্ডে সাদা বর্ণের অনেকগুলো ফুল হয়।

রাসায়নিক উপাদান : কাণ্ডের মূল উপাদান এগারোস্পইরাল সমৃদ্ধ একটি উদ্বায়ী তেল। এতে টার্পিন ও অ্যালকোহল জাতীয় দ্রব্যও বিদ্যমান।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশে বিশেষত সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় এটি বেশি জন্মে।

চাষাবাদ : পাহাড়ি ঢালু অঞ্চল ও কংকরময় মাটিতে আগর ভাল জন্মে। সাধারণত বীজের মাধ্যমে এটির বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। বনাঞ্চলে গাছের নিচে এমনিতেই চারা গজায় যা লাগিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।

লাগানোর দূরত্ব : ২০ থেকে ৩০ ফুট।

উপযোগী মাটি : কংকরময় মাটিতে আগর ভাল জন্মে।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৫-৬ বছরে আগর গাছ পরিপক্ব হয় তবে পূর্ণাঙ্গ পরিপক্ব হতে ১০ বছর সময় প্রয়োজন।

বীজ আহরণ : জুন মাসে ফুল এবং আগস্ট মাসে ফল হয় এবং ফল পাকলে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় তিন হাজার।

ব্যবহার্য অংশ : কাঠ ও তেল।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : আগর গাছে প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিমভাবে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া উৎপন্ন করে যা থেকে গাছে সুগন্ধি তৈরি হয়। আগরের কাঠ রাসায়নিক পদ্ধতিতে নির্যাস করেও সুগন্ধি তৈরি করা সম্ভব। নির্যাস কাঠের পাত্রে সংরক্ষণ করা ভাল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : কাণ্ডের ক্বাথ জ্বরনাশক, পাকস্থলির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিকারক, মূত্রবর্ধক, কামোদ্দীপক, উত্তেজক ঔষধ ও সুগন্ধি ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ, ব্রংকাইটিস, হাঁপানি ও বাত নিরাময়ের ক্ষেত্রেও এটি বেশ কার্যকরী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের দুর্বলতায় ২-৩ গ্রাম আগর কাঠ গুঁড়া দুধসহ প্রতিদিন ১ বা ২ বার খেতে হবে।
- বাত ব্যথায় আগর তেল প্রয়োজনমতো আক্রান্ত স্থানে দৈনিক ২ বার হালকাভাবে মালিশ করতে হবে।

যৌন দুর্বলতায় ও স্নায়ু শক্তি বৃদ্ধির জন্য ৩-৪ গ্রাম আগর কাঠ গুঁড়া ৩-৪ চামচ মধুর সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন দু'বার করে খেতে হবে।

অন্যান্য ব্যবহার : এর কাঠ সুগন্ধিযুক্ত হওয়ায় পারফিউম (সুগন্ধি) তৈরিতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

আয় : এক একরে ১৬০টি গাছ রোপণ করা যায়। আধুনিক উপায়ে নির্যাস তৈরি করলে আন্তর্জাতিক বাজারে এর মূল্য ২০-৩০ লক্ষ টাকা।

৮. আদা

সংস্কৃত নাম : সুন্থি
Botanical Name : *Zingiber officinale Rose, Shuth.*
Common Name : *Ada*
English Name : *Ginger*
Family : *Zingiberaceae*

পরিচিতি : এর দুটো জাত রয়েছে। একটি হচ্ছে আম আদা। দ্বিতীয়টি জিনজিবার অফি। দ্বিতীয়টি আমরা বিভিন্ন তরকারিতে ব্যবহার করি। আমে-আদার ব্যবহার খুবই কম। শুধুমাত্র আচারে ব্যবহার করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আদা জন্মে। দেশের রংপুর, দিনাজপুর ও মধুপুরে আদার প্রচুর চাষ করা হলেও পার্বত্য অঞ্চলের আদা অতি তেজস্কর ও কর্মকরী।

চাষাবাদ : মার্চ এপ্রিল কন্দের *(Rhizom)* মাধ্যমে এর চাষ হয়। চার-পাঁচ মাসের মধ্যে আদা পরিপক্ব হয়। সাধারণত মার্চ এপ্রিল-মাসে আদা সারিবদ্ধভাবে রোপণের উপযুক্ত সময়। রোপণ করার পর খড়কুটা দিয়ে ঢেকে রাখলে ভাল হয়। পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে আদা পচে বা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। রোপণ করার পর প্রায় ৯-১০ মাস পরে অর্থাৎ ডিসেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি মাসে পাতা শুকিয়ে গেলে পাতা কেটে দিয়ে ১৫ দিন অপেক্ষা করার পর আদা উত্তোলন করা উত্তম।

লাগানোর দূরত্ব : সাধারণত ৬ ৮ ইঞ্চি দূরত্বে লাগাতে হয়।

উপযোগী মাটি : আদার জন্য ছায়াযুক্ত জায়গা প্রয়োজন। সাধারণত বেলে দো-আঁশ ও কিছুটা অম্লভাবাপন্ন মাটিতে অধিক পরিমাণে আদা জন্মে থাকে।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৯ থেকে ১০ মাসে আদা পরিপক্ব হয়।

বীজ আহরণ : আদার কন্দ বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কন্দ সংগ্রহের সময় ডিসেম্বর থেকে মার্চ।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : কন্দের মাধ্যমে চাষ করা হয়।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : আদা উত্তোলন করে শিকড়, মাটি ইত্যাদি পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে শুকিয়ে ১ বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : সাধারণত কাঁচা অথবা শুষ্ক পাউডার আকারে আদার কন্দ ব্যবহার হয়। আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে আদার শুঁঠের ব্যবহার বেশি।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : আদা পাকস্থলি ও যকৃতের শক্তিবর্ধক, হজম ও রুচিকারক ও বায়ুনাশক। যৌনশক্তি ও স্মরণশক্তি বর্ধক এবং বাতনাশক। নাক, কান, কণ্ঠ ও দাঁতের রোগে উপকারী। শ্বাস, শ্বেতী ও চর্মরোগনাশক। বাত ও পেটের কৃমি দূর করে। আদার রস মধুর সাথে খেলে কফ পরিষ্কার হয়। চোখের ছানি, চোখের ব্যথা এবং বধিরতায় আদা উপকারী। ডিমের কুসুম অর্ধ সিদ্ধসহ আদা খেলে শুক্রবৃদ্ধি পায়। আদার তেল প্রলেপ যে কোন ফোলা, ব্যথা এবং বাত ব্যথায় উপকারী।

কোন অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- খাওয়ায় অরুচি হলে সিকি কাপ পানিতে ২ চামচ আদার রস ও সামান্য লবণ মিশিয়ে ১০/১৫ মিনিট মুখে পুরে কিছুক্ষণ রেখে দিলে খাওয়ার রুচি ফিরে আসে।
- খাওয়ার আগে বিট লবণ দিয়ে একটু আদা চিবিয়ে খেলে পেট ফাঁপা দূর হয়, ক্ষুধা ও হজম শক্তি বাড়ে, মুখের বিরসতা, জিভ ও গলার কফ, জড়তা কেটে যায়।
- সর্দি ও জ্বরে আদার রসে মধু মিশিয়ে খেলে উপকার হয়।
- শরীর চাকা চাকা হয়ে ফুলে উঠলে (যাকে চলতি ভাষায় বলে আমবাত) পুরনো গুড়ের সাথে আদার রস মিশিয়ে খেলে উপশম হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : কাঁচা আদা মশলা হিসেবে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয়। আদা থেকে সুগন্ধি ও তৈল হয়।

আয় : একশতাংশ জমিতে সাধারণত ২০ থেকে ৩০ কেজি আদা উৎপাদন হয় যার বাজার মূল্য ৮০০ ১০০০ টাকা (তারতম্য হতে পারে)। আদা চাষ বাণিজ্যিকভাবে খুব লাভজনক।

৯. আপাং

সংস্কৃত নাম : আপামার্গ
Botanical Name : *Achyranthes aspera Linn*
Common Name : *Apang*
English Name : *Rough Chaff*
Family : *Amaranthaceae*

পরিচিতি : আপাং বর্ষজীবী বীরুৎ। সাধারণত ১ থেকে ২ ফুট উঁচু হয়। এর শাখা-প্রশাখা খাড়াভাবে জন্মে ও অগ্রভাগ মোটা এবং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাতা অল্প ডিম্বাকৃতির ও গোলাকার ১ থেকে ২ ইঞ্চি লম্বা। সবুজের আভাযুক্ত সাদা বর্ণের ফুল হয়। ফল ছোট লম্বাকৃতির, মসৃণ, ধূসর বর্ণের এবং শক্ত ও শমযুক্ত।
প্রাপ্তিস্থান : আপাং বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের সর্বত্র জন্মে।
চাষাবাদ : বাংলাদেশে প্রায় সব জেলাতেই বুনো পরিবেশে জন্মায়।
লাগানোর দূরত্ব : পরস্পর দুটি গাছের দূরত্ব থাকবে ১ ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে আপাং জন্মে থাকে।
পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৬ থেকে ৮ মাসে এই গাছ পরিপক্ব হয়ে থাকে।
বীজ আহরণ : এপ্রিল-মে মাসে ফল পেকে গেলে তা সংগ্রহ করে সে ফল থেকে বীজ আহরণ করা যেতে পারে।
প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ . ২৫০,০০০ থেকে ৩০০,০০০টি .
ব্যবহার্য অংশ : পুরো গাছ, পাতা, বীজ ও মূল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : আপাং রক্ত প্রবাহ বন্ধ করে এবং রক্ত-অর্শে বিশেষ উপকারী। আপাং রক্ত দূষণজনিত চর্মরোগ ও ঋতুস্রাব বন্ধ করে। কণ্ঠস্বর পরিষ্কারক, কাশি ও হাঁপানি প্রশমক, মূত্রকারক এবং প্রদাহনাশক। পাকস্থলির বায়ু ও কফ পরিষ্কারক এবং শারীরিক শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।
কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- আপাং-এর শিকড় বাটা মিছরিসহ খেলে স্বপ্নদোষ দূর হয়। কীটপতঙ্গের কামড়ে আপাং উপকারী।
- শরীরের কোন স্থান কেটে রক্তপাত হলে আপাং পাতার রস ঐ স্থানে প্রলেপ দিলে সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাত বন্ধ হয়।
- চোখ উঠলে আপাংয়ের শিকড় ঘোলসহ একটি তামার পাত্রে চন্দনের মতো ঘষে চোখের উপর ও নিচের পাতায় লাগালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। তবে চোখের ভিতরে যেন আপাং-এর রস না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অন্যান্য ব্যবহার : আপাং গাছ জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।
চাহিদা : প্রতি বছর ঔষধ শিল্পে ১২০,০০০ কেজি আপাং-এর চাহিদা রয়েছে।

১০ আমলকী

সংস্কৃত নাম : আমলকী
Botanical Name : *Phyllanthus emblica Linn.*
Common Name : *Amla, Amloki*
English Name : *Emblic Myrobalan, Indian Gooseberry*
Family : *Euphorbiraceae*

পরিচিতি : আমলকী মাঝারি আকৃতির পত্রঝরা উদ্ভিদ। উচ্চতায় এটি ২০-৩০ ফুটের মতো হয়। পাতা যৌগিক, ছোট চিকন আকৃতির, ফল গোলাকৃতির এবং হালকা সবুজ বর্ণের।
রাসায়নিক উপাদান : এতে রয়েছে ট্যানিন ও কলয়ডাল পদার্থ। ফাইলেমব্লিক এসিড, গ্যালিক এসিড এবং ইমাব্লিকোল থাকে। তাছাড়া ফাইলেমব্লিক ও মিউসিক এসিড থাকে।
প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশ, ভারত, ভিয়েতনাম ও চীনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমলকী জন্মে।

চাষাবাদ : সমতল ভূমির আর্দ্র-গরম ও নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় এবং যেখানে শীত ও বৃষ্টিপাত বেশি সেখানে উন্নতমানের আমলিক জন্মায়, বিশেষত খোলামেলা স্থানে আমলকী গাছ বেশী দেখা যায়। মার্চ-এপ্রিল বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। বপনের পূর্বে বীজ ৫-৬ ঘন্টা হালকা গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখে পরবর্তীতে বপন করতে হবে। বীজের অঙ্কুরোদগম হতে কমপক্ষে ২-৩ সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন। দেড় থেকে দুই বছরের চারা রোপণ করার জন্য উত্তম। বংশ বিস্তারের জন্য এ গাছের ডালের কাটিং এবং গুটি কলম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ছোট অবস্থায় চারা গাছ খুব নরম থাকে বিধায় একটি সোজা কাঠির সাথে বেঁধে দিতে হবে।

লাগানোর দূরত্ব : পরস্পর দুটি গাছের দূরত্ব থাকবে ১৫ থেকে ২০ ফুট।

বীজ সংগ্রহের সময় : ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ফল পাকতে শুরু করে তখন ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে আমলকী গাছ হয়ে থাকে, তবে বেলে- দোআঁশ মাটিতে অধিক পরিমাণে আমলকী গাছ জন্মে।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৪-৫ বছরে পরিপক্ব হয়।

বীজ আহরণ : ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে পরিপক্ব ফল সংগ্রহ করে তা ৬-৭ দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখলে ফলের রসালো অংশ পচে যায়। এর পর হাত দিয়ে চটকিয়ে পচা অংশ ফেলে রৌদ্রে শুকিয়ে আঁটি থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ৪৫,০০০০-৫০,০০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সাধারণত ফল পাকতে শুরু করলে ঈষৎ হলদে রঙ ধারণ করে, তখনই একে সংগ্রহ করতে হয়। ফল যাতে মাটিতে পড়ে থেঁতো না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অতঃপর ভালভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। শুকানোর সময় যেন কোন ধুলাবালি না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া মৃদুতাপে পানিতে সামান্য জ্বাল দিয়ে নিয়ে পরবর্তীতে রৌদ্রে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। বেশিরভাগ সময় দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আমলকী সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। সংরক্ষণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কোন রকম ছত্রাক ও কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়।

ব্যবহার্য অংশ : ফল (ঔষধ হিসাবে), কাঠ, ছাল ও পাতা।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : আমলকী হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও যকৃত, পেশি ও স্নায়ুমণ্ডলের শক্তিবর্ধক। রক্ত পরিষ্কারক, চর্মের লাবণ্যতা ফিরিয়ে আনে এবং যৌনশক্তি, স্মরণশক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে ও পিপাসা নিবারণ করে। আমলকীর তেল ব্যবহারে চুল কালো হয়, চুলের গোড়া শক্ত হয় এবং ভাল ঘুম হয়। আমলকীর রস এবং গুঁড়া বাদাম তেলে মিশিয়ে চিনিসহ খালি পেটে ২৫ গ্রাম পরিমাণ খেলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সবরকম চোখের রোগে উপকারী। সুরমা আকারে ব্যবহারেও উপকার পাওয়া যায়। এছাড়াও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং অর্শরোগে উপকারী। ১ কেজি কমলার রসে যে পরিমাণ ভিটামিন-সি আছে, ৫০ গ্রাম আমলকীতে তারচেয়ে বেশি ভিটামিন-সি আছে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- পাকা আমলকীর বীজগুঁড়া অল্প মিছরিসহ বারবার চেটে খেলে শ্বেতপ্রদর রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।
- আমলকীর কাঁচা ফল প্রতিদিন একটি করে খেলে মেহ রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।
- লজ্জা স্থানে ব্যথা আমলকীর রস ৩০ গ্রাম, হিঞ্চে বা গাঁদা পাতার রস ২০ গ্রাম, মিছরি দুই তোলা একত্রে মিশিয়ে খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

অন্যান্য ব্যবহার : আমলকীর কাঠ দিয়ে গরুর গাড়ি চাকা, নৌকা, নৌকার দাঁড় ইত্যাদি বানানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। ছালের সাহায্যে ভালো চামড়া ট্যান করলে তা নরম ও টেকসই হয়। অর্জুনের পাতার মতোই আমলকীর পাতা তসর জাতীয় রেশম পোকার খাদ্য।
আয় : একটি প্রাপ্তবয়স্ক গাছে ৬০ থেকে ৮০ কেজি ফল পাওয়া যায় যার বাজার মূল্য তিন থেকে চার হাজার টাকার বেশি।

১১. উলটকম্বল

সংস্কৃত নাম : যোষিণী
Botanical Name : *Abroma augusta Linn.*
Common Name : *Ulatkambal*
English Name : *Devil's Cotton*
Family : *Sterculiaceae.*

পরিচিতি : উলটকম্বল চিরহরিৎ ছোট ঝোপ জাতীয় গাছ। সাধারণত ৯ থেকে ১২ ফুট লম্বা হয়। পাতার গোড়া হৃৎপিণ্ডের মতো, অগ্রভাগ ডিম্বাকৃতির ও ক্রমশ সরু। ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি লম্বা হয়। উলটকম্বল বনে জঙ্গলে জন্মে অথবা রোপণ করা হয়। গাছ বেশি মোটা হয় না। কাঠ নরম ও ধূসর বর্ণের। গাছের ছালে রেশমের মতো আঁশ হয়।

রাসায়নিক উপাদান : পাতায় ও শাখার ছালে স্টেরল ও অন্যান্য গ্লাইকোসাইড এবং মূলের ছালে অ্যালকালয়েড স্টেরল, গদ ও ম্যাগনেশিয়াম লবণ বিদ্যমান।

প্রাপ্তিস্থান : মতান্তরে উলটকম্বলের আদি নিবাস মালয়েশিয়া। বাংলাদেশসহ এশিয়ার উষ্ণ প্রধান অঞ্চলে উলটকম্বল জন্মে থাকে। এশিয়া মহাদেশে-এর দুটি প্রজাতি দেখা যায়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ গাছ জন্মে।

চাষাবাদ : কমবেশি সব ধরনের মাটিতে উলটকম্বল জন্মে তবে চাষের জন্য বেলে-দোআঁশ মাটি উত্তম। জুলাই-আগস্ট মাসে বীজ সংগ্রহ করে কিছু দিন রোদে শুকিয়ে এক হতে দু'মাসের মধ্যে বীজতলায় লাগাতে হয়। বীজ সিড বেডে বপন করলে ৪ দিন থেকে ১০ দিনে চারা গজায়, অংকুরোদগম হার শতকরা ৫০-৬০ ভাগ। ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে বপন করলে এ হার শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত হয়। কাণ্ড ও শিকড়ের কাটিং থেকেও গাছটি উৎপাদন সম্ভব। বীজতলার জন্য মাটি, গোবর ও ভিজা কাঠের ভূষি (২ঃ১ঃ১) মেশানো হয়।
লাগানোর দূরত্ব : ৩ থেকে ৫ ফুট।

উপযোগী মাটি : বেলে-দোঁআশ।

বীজ আহরণ : ফাঁপা পাঁচ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ফলের ভিতর কালজিরার মত ছোট ছোট কালো বীজ পঙ্‌ক্তি করে সাজানো থাকে। প্রতি ফলে ১০০-১৫০টি বীজ থাকে। ফল থেকে বীজ আলাদা করে শুকিয়ে ২/৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ১৪৫,০০০-১৫০,০০০টি।

বীজ সংগ্রহের সময় : ডিসেম্বর-জানুয়ারি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : ফল থেকে বীজ আলাদা করে শুকিয়ে ২/৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা, ডাল, গাছের ছাল মূলের ছাল এক কথায় গাছের পুরো অংশ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : উলটকম্বলের প্রধান ব্যবহার স্ত্রী রোগে। স্ত্রী রোগের মধ্যে প্রধান হলো বেদনা। প্রকৃতপক্ষে রজঃ নিঃসরণের স্বল্পতা, অধিক স্রাব, অনিয়মিত স্রাব, শ্বেত স্রাব প্রভৃতি কারণে গর্ভের উৎপত্তি না হওয়া, আর এই কষ্টগুলোর সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গ থাকলে তাদের যে কোন একটিকে বাধক বলা হয়। এসব ক্ষেত্রে ২-৩ গ্রাম উলটকম্বলের মূল চূর্ণের সাথে ৬/৭টি গোলমরিচের একত্রে মিশিয়ে ১ কাপ পানিতে জ্বাল করে আধা কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে চিনি মিশিয়ে খেতে হবে। প্রতিদিন এটি খেলে কারও কারও শরীরে এলার্জি দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে উল্লিখিত পরিমাণের অর্ধেক খেতে হবে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোমরে অসহনীয় যন্ত্রণা, এমনকি স্তনে ব্যথা হচ্ছে, কিন্তু ঋতুস্রাব হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে ২৫০ মি.গ্রা. উলটকম্বলের মূলের ছাল চূর্ণের সাথে ৫-৬টি গোলমরিচের গুঁড়া মিশিয়ে প্রতিদিন একবার পানিসহ খেতে হবে। এতে ঋতুস্রাব হয়ে যাবে।
- অনেক সময় ঋতুস্রাব হয় বটে, তবে খুবই অল্প এবং তলপেটে ও কোমরে খুব যন্ত্রণা। যেটুকু হয় রক্তের রঙ কালো এবং চাকা চাকা। এরূপ হলে ২৫০ মি.গ্রা. মূলের ছাল চূর্ণের সাথে ৫-৬টি গোলমরিচ মিশিয়ে ৪-৫ দিন আগে থেকে প্রতিদিন একবার খেতে হবে। এভাবে ৩/৪ দিন খেলে এ অসুবিধা দূর হয়।

পরিপক্ব হওয়ার বয়স : ৮ থেকে ৯ মাসে পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : গাছের কাঠ নরম ও সরু, তাই কাঠ হিসেবে তেমন ব্যবহৃত হয় না। তবে গাছের ছাল থেকে এক ধরনের আঁশ পাওয়া যায় যা দিয়ে দড়ি তৈরি করা হয়। ছালের অংশ পানিতে ভিজালে নষ্ট হয় না। পৃথিবীর অনেক দেশে এই আঁশ দিয়ে পরচুলা বানানো হয়।

চাহিদা : পশ্চিমা বিশ্বে সম্প্রতি এর ওপর ব্যাপক গবেষণা চালু রয়েছে। অচিরেই বিশ্ববাজারে এর ব্যাপক চাহিদা তৈরি হবে। বাংলাদেশে এর চাহিদা ২৫০ মেট্রিক টন।

আয় : প্রতি একর জমিতে উলটকম্বল চাষে বার্ষিক ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

১২. উলটচন্ডাল

সংস্কৃত নাম : লাঙ্গলি
Botanical Name : *Gloriosa superba Linn.*
Common Name : *Ulat Chandal*
English Name : *Malabar Glory lily, Superb lily*
Family : *liliaceae*

পরিচিতি : উলটচন্ডাল বর্ষজীবী লতানো উদ্ভিদ। ভূ-নিম্নস্থ কন্দ থেকে প্রতি বছর মে-জুন মাসে বায়বীয় কাণ্ড বের হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাতা সরল ও পাতার শিরা বিন্যাস সমান্তরাল। জুলাই-আগস্ট মাসে ফুল হয়। ফুল একক, ছয় পাপড়ি, ছয় পুংকেশর ও তিন গর্ভকেশর বিশিষ্ট। পাপড়ি প্রথমে হালকা সবুজ, পরে পীত ও রক্তবর্ণ হয়। ফুটন্ত ফুলের পাপড়ি উর্ধ্বমুখী। অক্টোর-নভেম্বর মাসে ফল পাকে। ফলে অনেক বীজ থাকে। বীজ গোলাকার, কমলা বা লাল বর্ণের। নভেম্বর মাসে বায়বীয় কাণ্ড মরে যায়।

প্রাপ্তিস্থান : ঢাকা, বরিশাল ও চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।

চাষাবাদ : কন্দ এপ্রিল মাসে উঁচু ভূমিতে লাগাতে হয়। আবার ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করে মার্চ-এপ্রিল মাসে বীজ বুনতে হয়। ২০-২৫ দিনের মধ্যেই বীজ থেকে চারা গজায়। বীজ থেকে জন্মানো লতায় তিন বছর পরে ফুল ধরে। তবে কন্দ লাগিয়ে চাষ করাই উত্তম। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে উলটচন্ডাল ভাল জন্মায়।

লাগানোর দূরত্ব : এক থেকে দেড় ফুট।

উপযোগী মাটি : বেলে বা দো-আঁশ মাটিতে ভালো হয়।

বীজ আহরণ : ভূ-নিম্নস্থ কন্দ থেকে প্রতি বছর মে-জুন মাসে বায়বীয় কাণ্ড বের হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ১০ থেকে ১২ হাজার।

বীজ সংগ্রহের সময় : অক্টোবর-নভেম্বর।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : উলটচন্ডাল কফ-বাত, কৃমি, ফুলা ও ব্রণ নাশক। রুচিকারক, বমনকারক ও বলকারক। উকুন নাশে, বাতের ব্যথায় ও গর্ভপাতে বিশেষভাবে কার্যকরী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- মাথার উকুন নাশে- পাতার রস ও সমপরিমাণ নারকেল তেল মাথায় মাখতে হবে।
- বাতের ব্যথায়-তিন ভাগ কন্দ এবং এক ভাগ গোলমরিচ বেটে মণ্ড করতে হবে। ঐ মণ্ড সামান্য গরম করে ব্যথাযুক্ত স্থানে প্রলেপ দিতে হবে।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : বীজ থেকে জন্মানো লতায় তিন বছর পরে ফুল ধরে। কন্দ থেকে জন্মানো চারায় একই বছরে ফুল ফোটে। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : উলটচন্ডালের শিকড় পেটের পীড়ায় এবং পাতার রস ত্বক মসৃণ করার কাজে উপকারী।

আয় : প্রতি একর জমিতে বার্ষিক আয় ২৫,০০০ টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকা।

১৩. একাংগি

Botanical Name : *Kaempferia galanga Linn.*
Common Name : *Ekangi.*
English Name : *Black Thorn*
Family : *Zingiberaceae*

পরিচিতি : একাংগি বা চন্দ্রমূলা বর্ষজীবী গাছ। মূল হলুদের মতো। পাতা বেশ বড়, লম্বাটে এবং মাটির চারিদিকে বিস্তৃত থাকে। ফুল সুগন্ধযুক্ত ও শ্বেতবর্ণ, আস্তে আস্তে প্রস্ফুটিত হয়। বর্ষায় ফুল হয়, ফুল ফোটা শেষ হলে নতুন পাতা গজায়। সকালের দিকে ফুল ফোটে আবার সন্ধ্যার দিকে শুকিয়ে যায়। এ গাছ থেকে সুগন্ধযুক্ত তেল প্রস্তুত করা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এর আদি বাসস্থান।

প্রাপ্তিস্থান : দেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে একাংগি বেশি হতে দেখা যায়।

চাষাবাদ : অঙ্গজ বংশবিস্তার অর্থাৎ রাইজোমের *(Rhizome)* মাধ্যমে চাষাবাদ করা হয়ে থাকে।

লাগানোর দূরত্ব : এক থেকে দেড় ফুট।

উপযোগী মাটি : বেলে বা দো-আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে।

বংশবিস্তার : কন্দের সাহায্যে বংশবিস্তার করে থাকে। আহরণের প্রশ্ন নেই।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা, কন্দ।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : একাংগি টুকরো টুকরো করে কেটে আদার মতো সংরক্ষণ করা যায়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : একাংগি উত্তেজক, সর্দিতে উপকারী, মাথার খুশকি দূর করে, বাতজ্বর নাশক ও চর্মরোগে উপকারী। পাতা শ্লেষ্মানাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি স্নায়ুর অবসাদক। বীজ স্নিগ্ধকারক, মূত্রকারক ও বলকারক।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- একাংগির পাতা শ্লেষ্মানাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- সর্দিতে একাংগি বিশেষ উপকারী।
- একাংগি বেটে ব্যবহার করলে চর্মরোগে উপকারী।
- সুগন্ধীর কারণে একাংগি মাছ শিকারে ব্যবহার করা হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : এক বছর।

অন্যান্য ব্যবহার : ফুল থেকে রঙ তৈরি করা হয়। কাঁচা ফল মোরগ-মুরগির খাদ্য এবং বীজের পিঠা গৃহপালিত পশু-পাখিকে খাওয়ানো হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

১৪. কদবেল

সংস্কৃত নাম : কপিত্থ
Botanical Name : *Feronia limonia (Linn.) Sw.*
Common Name : *Kadbel*
English Name : *Elephant Apple, Monkey Fruit*
Family : *Rutaceae*

পরিচিতি : কদবেল গাছ ১২-১৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। বেশ শক্ত ধরনের পত্রঝরা বৃক্ষ। পাতা দেখতে অনেকটা কামিনী ফুলের পাতার মতো। পত্রদণ্ডের দুদিকে ৫/৬টি করে পাতা থাকে। গাছে ছোট, সোজা ও শক্ত কাঁটা থাকে। ফিকে লাল বা সাদা ফুলের ব্যাস প্রায় ১.২৭ সে. মি.। প্রতি ফুলে ৫/৬টি লোমযুক্ত পাপড়ি তাকে। ফল ছোট বেলের মতো, ক্রিকেট বলের চেয়ে বড়, ব্যাস ৬.২৫ সে.মি., উপরিভাগ সাদা, ফল পাকলে কালচে বর্ণের হয়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলংকায় দেখা যায়। বাংলাদেশের সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে এর বিস্তৃতি রয়েছে।

চাষাবাদ : মে-জুন মাসে বীজতলায় বীজ বপন করতে হয়। ৭-১৫ দিনের মধ্যে বীজ থেকে চারা গজায় এবং অঙ্গজ বংশবিস্তার অর্থাৎ গ্রাফটিংয়ের মাধ্যমেও এর বংশবিস্তার করা যায়। অংকুরোদগমের হার শতকরা ৬০ ভাগ।

লাগানোর দূরত্ব : ২০ থেকে ৩০ ফুট।

উপযোগী মাটি : বেলে বা দো-আঁশ মাটিতে কদবেল গাছ ভালো জন্মে।

বীজ আহরণ : পাকা ফল খাওয়ার পর অথবা ভেঙ্গে পানিতে ধুয়ে বীজ সংগ্রহ করা হয়। শুকিয়ে ছয় মাস পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ প্রায় ৫ হাজার।

বীজ সংগ্রহের সময় : অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এর বীজ সংগ্রহ করা হয়।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : পাকা ফল খাওয়ার পর অথবা ভেঙ্গে পানিতে ধুয়ে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। শুকিয়ে এ বীজ ছয় মাস পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : কদবেলের ফল, পাতা, ছাল ও শাঁস ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : ফলের বীজ হৃদরোগে কার্যকরী। রক্ত আমাশয়ে কদবেলের আঠা মধুসহ খেলে বিশেষ উপকার হয়। পাকা ফল দাঁতের মাড়ি ও গলার ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। পাতা-পেট ফাঁপা, অজীর্ণ ও পেটের অন্য কোন দোষ হলে ব্যবহৃত হয়। ফলের শাঁস কাশি, হাঁপানি ও যক্ষা রোগে উপকারী এবং কদবেল উদ্দীপক, মূত্রবর্ধক, বলকারক ও যৌনশক্তি বর্ধক গুণ রয়েছে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- পিত্তে পাথর হলে কদবেলের কচি পাতার রস এক চা চামচ করে সকাল বিকাল রোজ খেলে অসুবিধা সেরে যায়।
- কাঁচা কদবেলের রস পিপুল চূর্ণ ও মধুসহ পান করালে হিক্কা ওঠা সেরে যায়। এতে বমিও বন্ধ হয়।

কদবেলের পাতা ও বাঁশ পাতা সমান পরিমাণ একত্রে বেটে মধুসহ খেলে তীব্র প্রদরের পক্ষে খুবই উপকার হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৪-৫ বছরে কদবেল গাছ পরিপক্ব হয় তবে পূর্ণাঙ্গ পরিপক্ব হতে ১০ বছর সময় প্রয়োজন।

অন্যান্য ব্যবহার : ফল মধুর অম্লরস যুক্ত। কাঠ শক্ত। চেরাই করা যায়। কৃষি যন্ত্রপাতি ও ঘরবাড়ি নির্মাণে ব্যবহার করা হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ১,০০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

১৫. কনকচাঁপা

Botanical Name : *Pterospermum acerifolium Willd.*
Common Name : *Kanokchapa*
English Name : *Unknown*
Family : *Sterculiaceae*

পরিচিতি : কনকচাঁপা দীর্ঘাকৃতি চিরহরিৎ বৃক্ষ, ৪০ থেকে ৫০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে দেখা যায়। শাখাগুলো চারিদিকে বিস্তৃত, ছাল মসৃণ, কাঠ লাল বর্ণ, গুঁড়ি গোলাকার। গোলাকৃতি পাতার এক পিঠ উজ্জ্বল, সবুজ ও মসৃণ কিন্তু অন্য পিঠ রুক্ষ ও সাদাটে-ধূসর। ফুলের কলি দীর্ঘ, গোলাকৃতি ও বাদামি-হলুদ। ফুল আকারে বেশ বড়, শ্বেতবর্ণ বা হরিদ্রাভ। একস্থানে কখনও কখনও ২-৩টি ফুল হতে দেখা যায়। ফুলের বহিঃচ্ছেদ ৪-৫টি ও লম্বা। পাপড়ি আরও লম্বা। বীজ পশমযুক্ত ও সংখ্যায় অনেক।

প্রাপ্তিস্থান : পৃথিবীর সব অঞ্চলে এ ফুল দেখতে পাওয়া যায়।

চাষাবাদ : বীজ থেকে চারা তৈরি করে লাগানো যায়। তেমন কোন যত্নের প্রয়োজন হয় না। এর বীজ সহজেই অঙ্কুরিত হয় কিন্তু বৃদ্ধি মন্থর।

লাগানোর দূরত্ব : ২৫ থেকে ৩০ ফুট।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে জন্মে থাকে তবে বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে দেখা যায় না।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ১,০০০ থেকে ১,২০০টি।

বীজ সংগ্রহের সময় : ফেব্রুয়ারি-মার্চ।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বীজ সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে ১ থেকে দেড় মাস সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা ও ফুল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : কনকচাঁপার পাতা রক্তস্রাব বন্ধ করতে সহায়তা করে। পাতা বসন্ত রোগের ওষুধ।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- রক্তস্রাবে পাতার রস ২/৩ চা চামচ খেতে হয়।
- পাতার কাথ সামান্য কাঁচা হলুদ বাটাসহ গায়ে মাখলে বসন্ত রোগে উপকার পাওয়া যায়।

১০ গ্রাম ফুলের রস ৫০০ গ্রাম পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করলে ভাইরাস ও পতঙ্গ বিতাড়িত হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৭-১০ বছরে পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : নাতিদীর্ঘ ও মসৃণ কাণ্ড, ছায়ানিবিড় পাতা ও বড় ফুলের জন্য কনকচাঁপা বাগানে বা গৃহের প্রাঙ্গণে একটি অনন্য নির্বাচন। এর কাঠ দৃঢ় লাল বা বাদামি, কাঠ দিয়ে দিয়াশলাই ও দিয়াশলাইয়ের বাক্স বানানো যায়। পাতার প্যাকেটে গ্রামাঞ্চলে তামাক, গুড় ও লবণ বিক্রি করা হয়। এর ফুল জীবাণু ও পতঙ্গনাশক।

আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ৭০,০০০ টাকা থেকে ১০০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

১৬. করবী

সংস্কৃত নাম : করভীর
Botanical Name : *Nerium indicum Mill.*
Common Name : *Karobi, Rakto Karobi*
English Name : *Oleander*
Family : *Apocynaceae*

পরিচিতি : করবী চিরহরিৎ প্রায় ৭/৮ ফুট উচ্চ ঝোপ জাতীয় গাছ। মাটি থেকে সরাসরি উঠে আসা কয়েকটি সরলাকৃতি শাখায় পাতা ও ফুল দেখা দেয়। এ ফুল সুদৃশ্য ও সুগন্ধযুক্ত। প্রধানত লাল অথবা সাদা করবী দেখা যায়। ফলে বীজ থাকে অনেক, চ্যাপ্টা উজ্জ্বল ও ধূসর বর্ণের এবং লোমে আবৃত। মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফুল থাকে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফল পাকে।

প্রাপ্তিস্থান : সারা বাংলাদেশে শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়।

চাষাবাদ : শাখা কলম ও দাবা কলমের সাহায্যে চারা জন্মে।

লাগানোর দূরত্ব : ৫ থেকে ৬ ফুট।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে জন্মে থাকে।

বীজ আহরণ : বীজ থেকে চারা হয়। বীজ বিষাক্ত।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ৬০,০০০-৭০,০০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বীজ সংগ্রহ করে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে প্যাকেটজাত করে সংরক্ষণ করা যায়। ডিসেম্বর-জানুয়ারি পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা এবং মূলের ছাল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : করবীর পাতার রস কুষ্ঠ রোগ ও চর্ম রোগে ঔষধ হিসেবে কার্যকরী। করবীর মূল গর্ভপাতে সহায়ক। কচি পাতার টাটকা রস চোখে দিলে চোখ উঠায় আরাম হয়। এছাড়াও এ রস খোস-পাঁচড়ায় বিশেষ কাজ করে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- কুষ্ঠরোগ : শ্বেত করবীর মূল পিষে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।
- শিরঃরোগে : লাল করবীর মূল পিষে প্রলেপ দিলে শিরঃরোগ নিবারিত হয়।
- মাথা ধরায়, বাত ও কফরোগে করবী বিশেষ উপকারী।
- ব্রণে : করবীর মূলের ছাল পিষে প্রলেপ দিলে ব্রণ ভাল হয়।
- অর্শ হলে : করবীর মূল পিষে আক্রান্ত স্থানে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : এক বছর।

অন্যান্য ব্যবহার : করবী কাঠ মজবুত বিধায় এর শৈল্পিক উপযোগিতা আছে।

আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ৪০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

১৭. কর্পূর

সংস্কৃত নাম : কর্পূর
Botanical Name : *Cinnamomum camphora L.*
Common Name : *Karpur*
English Name : *Camphor*
Family : *Scrophulariaceae*

পরিচিতি : কর্পূর মসৃণ লোমযুক্ত উদ্ভিদ। কাণ্ড মোটা, নরম ও সরল। পাতা কাণ্ডের বিপরীত দিকে যুগ্মভাবে হয়, কখনও তিনটি পাতা দেখা যায়। পাতার কিনার করাতের মতো দাঁতযুক্ত, অগ্রভাগ সরু ও অবনত। পাতার সংযোগস্থল থেকে সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণের এক একটি ফুল হয়। ফুলে বেগুনী দাগ আছে। পুষ্পদণ্ড ৩০ সে.মি. লম্বা। গাছ ১৫-২০ মিটার উঁচু, কাণ্ড নরম ও মোটা, কাণ্ডের দিকে একটির পর একটি পাতা হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল ধরে। বাংলাদেশ, ভারত ও ইন্দোনেশিয়া এর আদি বাসস্থান।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের উত্তর অংশের উঁচু ভূমিতে ও সিলেট অঞ্চলে এমনকি কখনও কখনও বাস্তুভিটায় কর্পূর গাছ দেখা যায়।

চাষাবাদ : বীজ হতে চারা তৈরি করে কর্পূর গাছ লাগানো হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গাছে ফুল ফোটে এবং জুন-আগস্ট মাসে ফল পাকে। তখন বীজ সংগ্রহ করতে হয়। বীজ সংগ্রহের ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে ব্যাগে বীজ বপন করতে হয়। বীজ বপনের পূর্বে ফল হতে বীজ বের করে নিতে হয়। বপনে দেরি হলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়। এক বছরের চারা রোপণ করতে হয়। পরিপক্ব ফল থেকে বীজকে আলাদা করার জন্য ৩-৪ দিন ছায়াযুক্ত পরিবেশে স্তূপাকারে রাখতে হয় ও ফলকে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে হাত দিয়ে চটকিয়ে বীজ সংগ্রহ করা হয়। এরপর বীজ রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা উত্তম।

লাগানোর দূরত্ব : ১০ থেকে ১৫ ফুট।

উপযোগী মাটি : উঁচু পাহাড়ি মাটিতে ভাল জন্মে।

বীজ আহরণ : জুন-আগস্ট মাসে ফল পাকলে রোদে শুকিয়ে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ২৫,০০০-৩০,০০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : কর্পূর পাউডার আকারে গাছের মধ্যে হয়। এই পাউডার সংগ্রহ করে কাচের পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ : গাছের মূল, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখার নির্যাস।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : কর্পূর হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং মনে প্রফুল্লতা আনে। জ্বর, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা ও ফুসফুসের ক্ষতনাশক। উদরাময়, পিত্তজনিত পাতলা পায়খানা, যকৃত রোগে এবং পিপাসা দূর করে। আমাশয়ে এ গাছ ব্যবহার হয়।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- মূত্রাশয় ও প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া নিবারণ করে; কর্পূর গোলাপ পানি ও চন্দনের সাথে ঘষে ব্যবহারে গরমজনিত মাথাব্যথা উপশম হয়।
- কর্পূর গোলানো পানি ধনের পানির সাথে কপালে লাগালে এবং নাকে টানলে নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।
- কর্পূরের মাজন দ্বারা দাঁত মাজলে বা কুলি করলে দাঁতের পোকা দূর হয়।
- পাতার রস কফ নিবারক, গাছের রস জ্বরে স্নিগ্ধকর হিসেবে চিহ্নিত।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ১০-১৫ বছর।

অন্যান্য ব্যবহার : কর্পূর কাঠ জ্বালানি, গ্রামীণ আসবাবপত্র নির্মাণ এবং গৃহ নির্মাণ কাজে ব্যবহার হয়।

সাবধানতা : অতিরিক্ত মাত্রায় কর্পূর সেবনে শীতল প্রকৃতির ও দুর্বল লোকের জন্য ক্ষতিকর এবং যৌনশক্তি হ্রাস করে ও সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট করে।

আয় : একটি গাছ থেকে ৪/৫ কেজি কর্পূর পাওয়া যায় যার বাজার মূল্য ১০০০-১২০০ টাকা।

১৮. কামিনী

Botanical Name : *Murraya paniculata (L.) Jacq.*
Common Name : *Kamini*
English Name : *Huney bush*
Family : *Rutaceae*

পরিচিতি : কামিনী ছোট আকৃতির ঝোপভাবাপন্ন চিরসবুজ বৃক্ষ। ৮/১০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। গাছটি ছেঁটে রাখলে অতি সুন্দর দেখা যায়। পাতা ছোট, লম্বা ও প্রায় ডিম্বাকৃতির, ঘাঢ় সবুজ। ফুল চমৎকার সুগন্ধযুক্ত, বহির্বাস ৫টি, পরস্পর বিভক্ত, অগ্রভাগ সরু, পাপড়ি মাথার দিকে বিস্তৃত। ফল গোলাকার ও রক্তিম। কামিনীর আদি নিবাস মালয়েশিয়া ও চীন। সাদা বর্ণের ফুল গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ফুটতে দেখা যায়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়।

চাষাবাদ : বীজ, শাখা ও দাবা কলম থেকে চারা পাওয়া যেতে পারে। কামিনী দ্রুত বাড়ে।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে কামিনী জন্মে।

লাগানোর দূরত্ব : ৫ থেকে ৭ ফুট।

বীজ সংগ্রহের সময় : বর্ষার শেষে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ১০০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বীজ সংগ্রহ করে ভাল করে রোদে শুকিয়ে বেশ কিছুদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়। পাতা, মূল ও ছাল মৃদু রোদে শুকিয়ে এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা, মূল, ছাল।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- আমাশয় রোগে—কামিনী গাছের মূলের ছাল ৪/৫ গ্রাম অথবা ডাল ৭ গ্রাম ২ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে সেই পানি ৩/৪ বার খেতে হবে। দুই-এক দিনের মধ্যেই আমাশয় কমে যাবে।
- কাটা-ছেঁড়ায়—কামিনী পাতার গুঁড়ো টিপে দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। এতে ব্যথা হয় না আবার রক্ত পড়াও বন্ধ হয়।
- সর্দিতে—কামিনী পাতার মিথি গুঁড়োর নস্যি নিলে হাঁচি হয়ে সর্দি বেরিয়ে যাবে।
- পরিশ্রমজনিত ব্যথায়—কামিনী গাছের পাতা বাঁটা দিয়ে মিনারেল তেল জ্বাল করে সেই তেল ব্যথার জায়গায় মালিশ করলে ব্যথা সেরে যাবে।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ২ থেকে ৩ বছরে কামিনী গাছে ফুল আসে।

অন্যান্য ব্যবহার : ফুলের তোড়া সাজাতে কামিনীর ডাল ব্যবহার করা হয়। ইকেবানা পদ্ধতির ফুল সাজানোতেও কামিনীর ডালের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ৪০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা আয় করা যায়।

১৯. কারান্‌জা

সংস্কৃত নাম : করনজা

Botanical Name : *Pangamia pinnaa L. Pierre. (Syn P. glabra Vent)*
Common Name : *Karanja*
English Name : *Indian Beech*
Family : *Leguminosae*

পরিচিতি : কারান্‌জা পত্রবহুল মাঝারি গাছ। প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে দেখা যায়। নদী ও জঙ্গলের ধারে হয়ে থাকে। সুশ্রী ও চিরহরিৎ পত্রবহুল গাছ এবং বেগুনী রঙের সুশোভিত ফুলের জন্য রাস্তার ধারেও রোপণের উপযোগী। বাকল নরম ও ধূসর

বর্ণের। পাতা উজ্জ্বল লোমযুক্ত, মসৃণ, পাকুড় পাতার ন্যায় সবুজ বর্ণ। পাতা ৫-৭ পত্রদন্ডের উভয় দিকে থাকে। পুষ্পদণ্ড পত্রদণ্ডের সমান, শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট, এক একটি দণ্ডে অসংখ্য ফুল থাকে। ফুল লালচে বেগুনি অথবা সাদা, শক্ত, চিকন ও লোমযুক্ত। ফলের পশ্চাৎ দিক নাকের মতো দেখায়। ফল সবুজ রঙের। ফলের কঠিন আবরণের মধ্যে তেলগর্ভ একটি বীজ থাকে। বীজে শতকরা ৩০ ভাগ তেল থাকে। তেলের রঙ বাদামি ও বিশেষ ধরনের গন্ধযুক্ত। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়। এই গণে একটি মাত্র প্রজাতি রয়েছে। ভারত, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা এর আদি বাসস্থান।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এ গাছ বেশি দেখা যায়।

চাষাবাদ : বীজের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি হয়। জুলাই মাসে ফল পাকলে রোদে শুকিয়ে আবরণ ফেলে বীজতলায় বপন করতে হয়। চারা অল্প বড় হলে তা ব্যাগে স্থানান্তর করতে হয়। রোপণের জন্য দু'বছরের বেশি বয়সের চারা উত্তম।

লাগানোর দূরত্ব : ২০ থেকে ৩০ ফুট।

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ মাটি কারান্জা চাষের জন্য উত্তম।

বীজ আহরণ : জুলাই মাসে ফল পাকলে রোদে শুকিয়ে আবরণ ফেলে বীজ সংরক্ষণ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ১৫০ থেকে ২০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বীজ সংগ্রহ করে পরিষ্কার করে ছায়াযুক্ত রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। বীজের আর্দ্রতা কমে কিছুটা গাঢ় বর্ণ ধারণ করলে প্যাকেটজাত করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : ফল ও মূল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : এর ব্যবহারে ত্বকে কোন প্রদাহ যেমন হয় না, তেমনি কোনরূপ দাগ ধরে না। বীজ ও তেল লেবুর রসের সাথে মিশিয়ে চর্মরোগের চিকিৎসা করা হয়। মূলের ছালের রস গনোরিয়া, আমবাত ও দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত শোধন ও পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। তেল কাশি ও কফ কমাতে সাহায্য করে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- কারান্জার তেল ব্যবহারে কুষ্ঠ ক্ষত ভাল হয়।
- কারান্জা তেল প্রলেপে ব্রণ দূর হয়।
- কারান্জা তেল চুলকানির জায়গায় মালিশ করলে চুলকানি ভাল হয়।
- কারান্জা তেল মালিশ করলে বাত বেদনা দূর হয়।
- চোখের বাইরে কারান্জা তেল ব্যবহার করলে চোখ ব্যথা দূর হয়।
- কৃমি হলে ২ ফোঁটা কারান্জা তেল মধুসহ খেলে উপকার পাওয়া যায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৬-৮ বছরে কারান্জা গাছ পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : কারান্জার বীজ ও তেল উত্তেজক ও কীটনাশক। তেল সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারান্জা তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো চলে। খৈল খুব উন্নতমানের জৈব সার।

আয় : একটি পরিপূর্ণ কারান্জা গাছ থেকে বছরে প্রায় ২০০ কেজি বীজ পাওয়া যায়। যার বাজার মূল্য প্রায় ২,০০০ টাকা।

২০. কালকাসুন্দা

সংস্কৃত নাম : কাসমার্দা
Botanical Name : *Cassia occidentalis Linn.*
Common Name : *Kalkasunda, Kasundi*
English Name : *Western Senna, Negro Coffee*
Family : *Leguminosae*

পরিচিতি : ঝোপ জাতীয় গাছ হলেও খুব ছোট নয়। যদিও বর্ষজীবী গাছ, তবুও পুরানো গাছ ২/৪টি দেখা যায়। পাতা লম্বাটে, চটকালে তীব্র কটু গন্ধ বের হয়, একটা লম্বা বোঁটায় ২ থেকে ৬ জোড়া পাতা থাকে। পুষ্প-বৃন্ত ছোট, একসাথে কয়েকটি ফুল হয়। ফুল হলদে লাল। শুঁটি চ্যাপ্টা, ৪/৫টি একসাথে জন্মে সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। জুন-জুলাই মাসে ফুল হয় ও ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফল হয়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই পতিত জমিতে দেখতে পাওয়া যায়।

চাষাবাদ : প্রত্যেক বীজে ২৫/৩০টি বীজ থাকে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফল হয়। মার্চের দিকে বীজ পেকে মাটিতে পড়ে। বর্ষার প্রারম্ভে বীজ থেকে গাছ বের হয়।

লাগানোর দূরত্ব : ১ ফুট অন্তর অন্তর।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে কালকাসুন্দা জন্মে। তবে বেলে-দো-আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে।

বীজ আহরণ মার্চ মাসে গাছ থেকে পরিপক্ব ফল সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে ফল থেকে বীজ আলাদা করে সংরক্ষণ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৫ হাজার।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সাধারণত কাঁচা কিংবা শুকনা অবস্থায় কালকাসুন্দার পাতা ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা ও গাছ।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- পিত্ত দোষ হলে : এক চা চামচ পরিমাণ কালকাসুন্দার পাতার রস মধুসহ খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- কোষ্ঠকাঠিন্য হলে : এক চা চামচ পরিমাণ কালকেসুন্দার পাতার রস গরম পানিসহ নিয়মিত খেলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে থাকে।
- দেহে বিষক্রিয়া হলে : ২ চা চামচ পরিমাণ কালসুন্দার পাতা রস নিয়মিত ঠাণ্ডা পানিসহ খেলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে থাকে।
- কাশি হলে : এক চা চামচ পরিমাণ কালসুন্দার পাতার রস ৫০ মি.লি. পানিসহ সিদ্ধ করে ২৫ মি.লি. থাকতে নামিয়ে নিতে হবে এবং এরপর তা ছেকে নিয়ে খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।
- রক্ত দূষিত হলে : এক চা চামচ পরিমাণ কালকাসুন্দার পাতার রস মিছরিসহ খেলে রক্তদোষ ভালো হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : এক বছরে কালকাসুন্দা পরিপক্ব হয়।
অন্যান্য ব্যবহার : পশুখাদ্য হিসেবে এর প্রচলন রয়েছে।
আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ৩০,০০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

২১. কালোজিরা

সংস্কৃত নাম : কৃষ্ণজিরকা
Botanical Name : *Nigella sativa Linn*
Common Name : *Kalojira*
English Name : *Black Cummin*
Family : *Ranunculacae*

পরিচিতি : কালোজিরা ছোট নরম বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। এর আদি জন্মস্থান দক্ষিণ ইউরোপে। বর্তমানে দেশের কোন কোন অঞ্চলে এর চাষ হয়। গাছ উচ্চতায় ২৫-৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে দেখা যায়। পাতার বর্ণ সবুজ এবং গঠন ও আকার অনেকটা ধনে পাতার মতো। পত্রদণ্ডের উভয় দিকে যুগ্ম পত্র হয়। পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগ থেকে সাদা, নীল, ঈষৎ পীত বর্ণের ফুল হয়। ফুলের পাপড়ি ৫টি, পুংকেশর অনেক, গর্ভকেশর লম্বা। ফল গোলাকার ও ফলগাত্রের বীজকোষে ৫-৬টি লম্বালম্বি খাঁজের দাগ আছে। বীজ কালো বর্ণের। শীতকাল ফুল ও ফলের সময়। এই গণে প্রজাতির সংখ্যা ২০।

প্রাপ্তিস্থান : সারাদেশে পাওয়া যায়।

চাষাবাদ : ডিসেম্বর পর্যন্ত জমিতে কলোজিরা বীজ ছড়ানো হয়।

লাগানোর দূরত্ব : ঘন করে ছিটিয়ে দিতে হয়।

উপযোগী মাটি : বেলে দো-আঁশ মাটি।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ১৮,০০০-২৩,০০০টি।

বীজ আহরণ ও সংগ্রহের সময় : চৈত্র মাসে বীজ পাকলে গাছ মরে যায়। তখনই বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : গাছ থেকে ফল পৃথক করে শুকিয়ে নিয়ে চটের বস্তায় ভরে সংরক্ষণ করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ : ফল এবং ফল থেকে আহরিত তেল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : কালোজিরা বহুবিধ রোগে, বিশেষ করে মাথাব্যথা, কাশি, সর্দি ও চর্মরোগে উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- সর্দি হয়ে মাথায় যন্ত্রণা হলে কালোজিরা পুঁটলি করে শুকাতে হবে। এই গন্ধে মাথার যন্ত্রণা ও সর্দি তরল হয়ে ঝরে পড়বে।
- গলা ফোলায় ও বিছার কামড়ে কালোজিরা বাঁটা বেশ কাজ করে।

- ইউনানী চিকিৎসকরা আর্ত-বিকার রোগে ও প্রসূতির স্তন দুগ্ধ বাড়ানোর জন্য কালোজিরা ব্যবহার করার নির্দেশ করেছেন।
- অতিরিক্ত কালোজিরা ব্যবহার করলে গর্ভস্রাব হয় বলে উল্লেখ রয়েছে।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : মার্চ মাসে বীজ পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : সব রোগে সবকিছুতেই কালোজিরা উপকারী।

আয় : প্রতি একর জমিতে কালোজিরা চাষ করে বছরে ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

২২. কালোজাম

Botanical Name : *Syzygium cuminin (L.) Skeel.*
Common Name : *Kalojam, Jam*
English Name : *Black Plum*
Family : *Myrtaceae*

পরিচিতি : কালোজাম বাংলাদেশের অন্যতম সুস্বাদু ফল। জাম গাছ চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ। ৬৫ থেকে ৮০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। আমের প্রায় সমকালীন জাম পাকার সময়। গাছের কাণ্ড সরল এবং ছাল ধূসর বর্ণের মসৃণ। পাতা ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সাদা বর্ণের এবং ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ, পাকলে কালো হয়। মে ও জুন মাসে ফুল হয় এবং জুন ও জুলাই মাসে ফল পাকে। জামের ফুল পাতা বীজ ও রস ব্যবহার হয়। এর আদি জন্মস্থান ভারত উপমহাদেশে।

প্রাপ্তিস্থান : জাম বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গায় দেখা যায়।

চাষাবাদ : বীজ থেকে চারা তৈরি করা হয়, তবে চোখ কলম বা জোড়া কলমের সাহায্যে বংশবিস্তার করা যায়। জামের চারার শিকড় বেশ গভীরে যায়, তাই সরাসরি বীজ লাগিয়ে যে চারা পাওয়া যায় তার উপর ১ বছর পর কলম করে দিলে উত্তম গাছ পাওয়া যায়। এপ্রিল-মে মাসে জাম গাছের চারা লাগানো ভাল। জাম গাছে সার প্রয়োগের প্রচলন খুব একটা না থাকলেও প্রতি বছর কিছু কিছু জৈব সার গাছের গোড়ায় ব্যবহার করা উত্তম।

লাগানোর দূরত্ব : ৩০ থেকে ৩৫ ফুট।

উপযোগী মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতেই জাম ফলে। তবে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে এমন দো-আঁশযুক্ত মাটি জাম চাষের জন্য বেশি উপযোগী।

বীজ আহরণ : জুন-জুলাই মাসে ফল পাকলে ফলের আবরণ পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ১ হাজার।

বীজ সংগ্রহের সময় : জুন ও জুলাই মাসে।

ব্যবহার্য অংশ : ফল, বীজ ও ছাল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : জাম পাকস্থলি, প্লীহা, ও লিভারের শক্তি বৃদ্ধি করে। জাম রক্ত পরিষ্কারক, চুলকানি ও পাঁচড়া নিবারক। জামের বীজ পুরাতন পাতলা পায়খানা, ধাতু

দুর্বলতা এবং বহুমূত্র রোগে উপকারী। জামের সির্কা হজমকারক ও প্লীহার রোগ নিবারক। জাম প্রস্রাব বর্ধক এবং ব্রণনাশক। জামের বীজগুঁড়া দাঁতের গোড়া ও মাড়ি শক্ত করে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- জামের বীজগুঁড়া দাঁতের গোড়া ও মাড়ি শক্ত করে।
- জামের বীজ পুরাতন পাতলা পায়খানা, ধাতু দুর্বলতা এবং বহুমূত্র রোগে উপকারী।
- জামের সির্কা হজমকারক ও প্লীহার রোগ নিবারক।
- জাম পাকস্থলি, প্লীহা ও লিভারের শক্তি বৃদ্ধি করে।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৪ থেকে ৫ বছরে ফল দেয় তবে ১০ থেকে ১২ বছরে পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : টাটকা জাম ফল খুবই মুখরোচক। ফলের রস প্রক্রিয়াজাত করে স্কোয়াশ ও মদ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যদিও জাম কাঠ দৃঢ়, দীর্ঘস্থায়ী ও আর্দ্রতাসহিষ্ণু কিন্তু এর পলিশ তেমন উন্নত নয় বিধায় আসবাব হিসেবে এর ব্যবহার সীমিত। অনেক দেশে জামের কচি পাতার চা পান করে থাকে। জাম পাতা তসর জাতীয় পোকার খাদ্য।

আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ৪৫,০০০ টাকা থেকে ৬০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

২৩. কালোমেঘ

সংস্কৃত নাম : মহাতিক্ত
Botanical Name : *Andrographis paniculata (Burm. f.)*
Common Name : *Kalomegh*
English Name : *The Creat*
Family : *Acanthaceae*

পরিচিতি : সরল বর্ষজীবী গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। প্রায় ৩ ফুট উঁচু হয়। গাঢ় সবুজ বর্ণের পাতা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা হয় অগ্রভাগ ও বোঁটার দিকে ক্রমশ সরু। বিপরীতমুখী জোড়া জোড়া পাতার গোড়া ও মূল কাণ্ডের সংযোগস্থল থেকে সাদা বর্ণের ছোট ছোট ফুল হয়। এর সমগ্র গাছ ব্যবহার হয়। বর্ষার শেষ থেকে শীতকাল অবধি ফুল ও ফল হয়।

প্রাপ্তিস্থান : কালোমেঘ বাংলাদেশসহ উপ-মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে জন্মে। বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে অধিক পরিমাণে জন্মে।

চাষাবাদ : বাংলাদেশের সর্বত্র এ গাছ জন্মাতে দেখা যায়। তবে সমতল ভূমির আর্দ্র কিংবা নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় কালোমেঘ গাছ বেশি হতে দেখা যায়। বেলে দো-আঁশ মাটিতে এর ফলন ভাল হয়। গাছের নিচে চাষ করা যায়। যেখানে গাছ লাগাতে হবে সেখানে সামান্য মাটি খুঁড়ে বীজ ছড়ালেই চারা গজায় এবং প্রতি বছরই গাছ থেকে বীজ পড়ে আবার নতুন গাছের জন্ম দেয়। পরিপক্ব ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করে বীজতলায় লাগিয়েও চারা তৈরি করা যায়। এ ক্ষেত্রে চারার বয়স যখন ১-১½ মাস হয় তখন রোপণের

উপযুক্ত হয়। সাধারণত মার্চ-এপ্রিল মাসে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিপক্ব বীজ মাটিতে পড়ে আপনা আপনি কালোমেঘ গাছ জন্মাতে দেখা যায়। যা পাটের মতো বীজ ক্ষেতে বপন করে ব্যাপকভাবে আবাদ করা যায়।

লাগানোর দূরত্ব : ৩ থেকে ৬ ইঞ্চি।

উপযোগী মাটি : বাংলাদেশের সর্বত্রই কমবেশি এ গাছ জন্মে থাকে। সব ধরনের মাটিই কালোমেঘ গাছের জন্য উপযোগী। তবে বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয়।

বীজ আহরণ : ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে পরিপক্ব ফল সংগ্রহ করে তা থেকে বীজ আহরণ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৬ লক্ষটি।

বীজ সংগ্রহের সময় : ডিসেম্বর-জানুয়ারি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সম্পূর্ণ গাছ উঠিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর ছোট ছোট টুকরা করে কেটে পাতাসহ শুকিয়ে নিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। এভাবে সংরক্ষণ করা হলে ১ বছর পর্যন্ত ভাল থাকে এবং এর কার্যকারিতা অটুট থাকে।

ব্যবহার্য অংশ : সম্পূর্ণ গাছ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : কালোমেঘ রক্ত পরিষ্কারক, পাকস্থলি ও যকৃতের শক্তিবর্ধক। জ্বর, যকৃত বিকার, কৃমি ইত্যাদি সমস্যায় উপকারী। কালোমেঘ সেবনে পরিপাক শক্তি বেড়ে শারীরিক বল বৃদ্ধি পায়।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- ০ ৫ থেকে ১০ গ্রাম কালোমেঘ আধা গুঁড়া করে ২ কাপ পানিতে জ্বাল করে ১ কাপ পরিমাণ হলে তা ছেঁকে প্রতিদিন দুই বার করে খেলে জ্বর ও রক্ত আমাশয় ভালো হয়।
- ০ খোস-পাঁচড়া হলে ১০-১৫ মিলি পাতার রস সকাল-বিকাল পানিসহ খালি পেটে খেতে হবে এবং খোস-পাঁচড়ার জায়গায় প্রলেপ দিতে হবে। এভাবে ৭ থেকে ১০ দিন খেলে ও প্রলেপ দিলে খোস-পাঁচড়া ভালো হয়।
- ০ শিশুদের কৃমি হলে ১ চা চামচ কালোমেঘ পাতার রস ও ১ চা চামচ হলুদের রস চিনিসহ ৫ থেকে ৭ দিন খেলে রোগ সেরে যায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৬ থেকে ৮ মাসে কালোমেঘ ব্যবহারের উপযোগী হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চাহিদা : ঔষধ শিল্পে প্রতি বছর ১,০০০ টনের বেশি কালোমেঘের প্রয়োজন হয়। এছাড়া, দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ৪৫,০০০ টাকা থেকে ৬০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

২৪. কুঁচিলা

সংস্কৃত নাম : কুপিলু
Botanical Name : *Strychnos nux-vomica Linn.*
Common Name : *Kuchila*
English Name : *Nux-Vomica, Snake Wood*
Family : *Loganiaceae*

পরিচিতি : কুঁচিলা বহুশাখা বিশিষ্ট ২০ থেকে ৩০ ফুট উঁচু গাছ। পাতা ২ থেকে ৪ ইঞ্চি লম্বা এবং বোঁটা ছোট। ফুল সবুজাভ সাদা বর্ণের সুগন্ধযুক্ত। ফল দেখতে গাবের মতো, গোলাকার সবুজ বর্ণের এবং পাকলে কমলা বর্ণের হয়ে থাকে। ফলের শক্ত খোসার মধ্যে নরম সাদা বর্ণের লিচুর মতো তিতা শ্বাস আছে। প্রত্যেক ফলের মধ্যে আধা ইঞ্চি ব্যাসের ২ থেকে ৫টি বীজ থাকে। বীজগুলো বোতামের মতো উজ্জ্বল, ফিকে ও সাদা ধূসর বর্ণের পশমময় যা সহজে চূর্ণ করা যায় না। কুঁচিলা বীজ কঠিন বিষাক্ত বলে মোদাব্বর বা শোধন করে ব্যবহার করতে হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসে ফুল ও তৎপর ফল শীতকালে পাকে। কুঁচিলার বীজ, পাতা, কাঠ এবং মূল ও গাছের ছাল ব্যবহার হয়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং চীনসহ বিভিন্ন দেশের উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জন্মে।

চাষাবাদ : কুঁচিলা বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। বীজ থেকে চারা উৎপাদনের মাধ্যমে বংশবিস্তার হয়। উদ্ভিদ পরিপক্ব হতে ৭-৮ বছর সময় লাগে।

লাগানোর দূরত্ব : ১০-১৫ ফুট অন্তর অন্তর লাগানো উত্তম।

উপযোগী মাটি : অম্লীয় মাটিতে ভাল জন্মে। তবে বেলে দো-আঁশ মাটিতেও জন্মে থাকে। পানি জমে থাকে না এমন মাটিতে ভাল হয়।

বীজ আহরণ : ফল সংগ্রহ করে শুকিয়ে ভেতর থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ৩০০-৩২৫টি।

বীজ সংগ্রহের সময় : অক্টোবর-নভেম্বর মাস পর্যন্ত।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : ফল থেকে বীজ বের করে ছায়া রোদে ভালমতো শুকিয়ে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করা যায়। পাতা, ছাল, কাঠ ও মূল আহরণ করে হালকা রোদে শুকিয়ে ২৪ ডিগ্রি তাপমাত্রার নিচে সংরক্ষণ করা যায়। কাণ্ড ও পাতা পাউডার করেও রাখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা, ছাল, কাঠ ও মূল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : কুঁচিলা ব্যথায় এবং যৌনশক্তি ও স্নায়ুশক্তি বৃদ্ধিতে বিশেষ কার্যকরী। কুঁচিলা-ব্যথা, বাতব্যথা, ও স্নায়বিক রোগে উপকারী। অন্ত্রের নড়াচড়া, আমাশয়, পাতলা পায়খানা ও অজীর্ণনাশক এবং দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি পূরণ করে। বৃদ্ধাবস্থায় এসতেথারা বা যৌন অঙ্গটিলার কারণে বার বার প্রস্রাব হওয়া রোধ করে এবং আফিম ও ভাঙের নেশা দূর করে। কুঁচিলার তেল ফিস্টুলা ও অর্শ দূর করে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- বীজের তেল মালিশ হিসেবে, পাতা, কাঠ, ছাল এবং মূলের নির্যাস পাউডার হিসেবে আমাশয়, অজীর্ণ ও পেটের সমস্যায় ব্যবহৃত হয়।
- নেশা দমনে পাউডার চা চামচের ১-২ চামচ পানির সঙ্গে খাওয়া যায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ১০ বছর।

অন্যান্য ব্যবহার : পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ৫০,০০০ টাকা থেকে ৬০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

২৫. কুড়চি

সংস্কৃত নাম : কুটাজ
Botanical Name : *Holarrhena antidysenterica Wall*
Common Name : *Kurchi*
English Name : *Tellicherry tree*
Family : *Apocynaceae*

পরিচিতি : এটা ২০/২৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু, পাতা ৬/৭ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। বসন্তকালে গাছের পাতা ঝরে যায়, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে আবার নতুন পাতা গজায়, আষাঢ়ে গাছভরা সাদা ফুল হয়, অল্প গন্ধ আছে।

রাসায়নিক উপাদান : ছালে প্রচুর সংখ্যক স্টেরয়ডীয় অ্যালকালয়েড এবং ট্যানিল, গদরঞ্জন, লুপিয়ল ও বিটা-সাইটোস্টেরল বিদ্যমান।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশসহ উপ মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কুড়চি জন্মে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা-ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে এটি প্রচুর জন্মে।

চাষাবাদ : ফলের ভিতরে তুলার মধ্যে লম্বা আঁশের সারি সারি বীজগুলি সাজানো থাকে। ছালের রঙ ধূসর বর্ণ। বীজের সাহায্যে বংশবিস্তার হয়। বর্ষা মৌসুমে চারা লাগাতে হয়। আবার শিকড় থেকে গজানো চারাও লাগানো যেতে পারে।

লাগানোর দূরত্ব : ১০ থেকে ১৫ ফুট।

উপযোগী মাটি : সাধারণত দো-আঁশ মাটি কুড়চি চাষের জন্য উপযোগী। পাহাড়ের ঢালুতেও চাষ করা যায়।

বীজ সংগ্রহের সময় : ডিসেম্বর-জানুয়ারি।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ১৩ হাজার।

বীজ আহরণ : ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফল পাকলে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করা যায়।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : কুড়চির বীজকে ইন্দ্রযব বলে। শীতকালে ফল পাকলে বীজ শুকালে বাদামি বর্ণের হয়। বীজ অত্যন্ত কটু স্বাদযুক্ত।

ব্যবহার্য অংশ : কাঁচা ছাল এবং বীজ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : আমাশয়, রক্ত আমাশয়, কৃমি ও শ্বাসকষ্ট রোগে উপকারী এবং কলেরার বমিনাশক। পুরনো কাশি, হাঁপানি ও ব্রংকাইটিস নিবারক এবং পার্শ্ব ব্যথা

ও বাত-ব্যথায় উপকারী। রক্তদোষ, চর্মরোগ ও অর্শরোগনাশক এবং নাকে রক্ত পড়া বন্ধ করে। ছালের প্রলেপ ফোলা দূর করে ও চোখের জ্বালায় উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- কুড়র্চির ছালের ক্বাথ এক ছটাক পরিমাণে দিনে দুইবার মধুসহ খেলে ডায়রিয়া নিবারিত হয়।
- রক্ত আমাশয়ে : এক কেজি পরিমাণ কুড়র্চির ছাল দশ কেজি পরিমাণ পানিসহ সিদ্ধ করে দেড় কেজি পানি থাকতে নামিয়ে নিতে হবে। ঠাণ্ডা হবার পর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঐ পানি ছেঁকে নিয়ে গাঢ় হওয়া পর্যন্ত আবার সিদ্ধ করতে হবে। ঐ ক্বাথ এক চা চামচ পরিমাণ মধুসহ চেটে খেলে রক্ত আমাশয় দূর হয়।
- জ্বর হলে : কুড়র্চির ছাল গুঁড়া ও ক্বাথ কুইনাইন অপেক্ষাও বিশেষ কার্যকর।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : কুড়র্চি সাধারণত ৮-১০ বছরে ঔষধি ব্যবহারের জন্য পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : সিলেটের খাসিয়া ও আসামের পাহাড়ি লোকেরা কুড়র্চি কাঠের কবচ ব্যবহার করে শরীর ভাল রাখার মানসে। সর্প দংশন বা বিছার কামড়েও এর বাকলের ব্যবহার আছে।

আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ৪০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

২৬. কুমারীলতা

Botanical Name : *Smilax zeylanica L.*
Common Name : *Kumarilata*
English Name : *Indian Sarsaparilla*
Family : *Liliaceae*

পরিচিতি : কুমারীলতা বড় কন্টকময় লতা জাতীয় উদ্ভিদ। পাতার অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ গোলাকার প্রায় ১৫-৩০ সে.মি. লম্বা। লতা বেশ শক্ত। পাতার উপরিভাগ মসৃণ। পুষ্পদণ্ড ২ থেকে ৬ সে.মি., অনেক শাখা-প্রশাখাযুক্ত। প্রত্যেক ফলে ১-২টি বীজ থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও শীতে ফল হয়।

প্রাপ্তিস্থান : চট্টগ্রাম, রংপুর ও দিনাজপুরে এই গাছ বেশি দেখা যায়।

চাষাবাদ : বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হয় না। তবে বরেন্দ্র ও টিলাযুক্ত মাটিতে ভাল জন্মে। অন্যান্য গাছপালার মাঝে মাঝে বীজ রোপণের মাধ্যমে জন্মানো যায়।

লাগানোর দূরত্ব : ১০-১৫ ফুট দূরে দূরে লাগাতে হবে। কুমারীলতা দ্রুত বাড়ে এবং লতা জাতীয় গাছের স্বভাব অনুযায়ী অন্যান্য গাছকে অবলম্বন করে।

উপযোগী মাটি : কম স্যাঁতসেঁতে এবং মরুময় মাটিতে ভাল জন্মে।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রতি কেজিতে ৩৫০০-৪০০০ পর্যন্ত বীজ হয়।

বীজ সংগ্রহের সময় : মে-জুন মাস।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বীজ আহরণের পর বীজ ছায়াযুক্ত রোদে ভাল করে শুকিয়ে বাঁশের পাত্র বা বায়ুরোধী কোন পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

ব্যবহার্য অংশ : সমগ্র লতা ও শিকড়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : গনোরিয়া ও সিফিলিস রোগে পাহাড়ি অঞ্চলের লোকজন ব্যবহার করে থাকেন।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

০ গনোরিয়া ও সিফিলিস রোগে লতা কেটে ছোট ছোট টুকরা করে তা ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে খালি পেটে খেতে হবে।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ১ বৎসর।

অন্যান্য ব্যবহার : পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ৩৫,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা আয় করা যেতে পারে।

২৭. কুসুম

সংস্কৃত নাম : কুচনাভা
Botanical Name : *Carthamus tinctorius Linn.*
Common Name : *Kusum*
English Name : *Safflower*
Family : *Compositae*

পরিচিতি : কুসুমকে আমরা কুসুম আখ্যায়িত করে থাকি। ফুল ৩ ফুট পর্যন্ত উঁচু বর্ষজীবী গুল্ম জাতীয় রোমশ উদ্ভিদ। মাঠে চাষ হয়। সূক্ষ্ম অথবা শক্ত লোমযুক্ত। পাতা লম্বা ও কণ্টকময়, কিনারা করাতের মতো। গাছ এক বছরের বেশি বাঁচে না। পুষ্পদণ্ডের পত্র ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, গোড়া সবুজ বর্ণ। কাঁটাযুক্ত কিংবা কাঁটা থাকে না। গাছের ডগায় হলদে আভাযুক্ত বা কমলা রঙয়ের ফুল হয়ে থাকে। বীজ ত্রিকোণাকার সাদা, উপরিভাগ মসৃণ। শীতকালে ফুল ও বসন্তকালে ফল হয়। এশিয়ার উষ্ণ অঞ্চলে এর আদি নিবাস।
প্রাপ্তিস্থান : ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে বেশি হতে দেখা যায়।
চাষাবাদ : মাঠে চাষ হয়ে থাকে।
লাগানোর দূরত্ব : ৬ ইঞ্চি থেকে ১ ফুট।
উপযোগী মাটি : বেলে বা দো-আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে।
প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৪ হাজার।
বীজ আহরণ : মার্চ মাসে ফল পাকলে তা থেকে বীজ আলাদা করে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বীজ রোদে শুকিয়ে প্যাকেটজাত করে সংরক্ষণ করা যায়।
ব্যবহার্য অংশ : কুসুম ফুল, বীজ ও বীজের তেল ব্যবহার হয়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : কুসুম ফুল ব্যথাযুক্ত প্রস্রাব ও ঋতুস্রাব নাশক। বুকের শ্লেষ্মা পরিষ্কারক এবং হাঁপানি প্রসমক। অন্ত্রনালির ব্যথা ও বায়ুনাশক এবং কণ্ঠস্বর পরিষ্কারক। শক্রবর্ধক এবং কিডনি ও মূত্রথলির পাথুরীনাশক। কুসুম বীজ ও বাদাম শ্বাস পিষে বেসনে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। মূত্রকারক ও স্নিগ্ধকারক। বীজের তেল পাঁচড়া, পক্ষাঘাত ও বাতরোগের মালিশ হিসাবে এবং জীবজন্তু কামড়ালে বিষ নিবারণে ব্যবহার হয়।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- শুকনো ফুল খেলে কামলা (জন্ডিস) রোগ আরোগ্য হয়।
- বীজের তেল পাঁচড়ায়, পক্ষাঘাত ও বাতে মালিশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৫-৬ মাস।

অন্যান্য ব্যবহার : ফুল থেকে রঙ তৈরি করা হয়। পাতা শ্লেষ্মানাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি স্নায়ুর অবসাদক। বীজ স্নিগ্ধকারক, মূত্রকারক ও বলকারক। কাঁচা ফল মোরগ-মুরগির খাদ্য এবং বীজের পিঠা গৃহপালিত পশু-পাখিতে খাওয়ানো হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে ৩০,০০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকা।

২৮. ক্যালেন্ডুলা

Botanical Name : *Calendula officinalis Linn.*
Common Name : *Calendula*
English Name : *Calendula*
Family : *Compositae*

পরিচিতি : ক্যালেন্ডুলা ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এটি জনপ্রিয় মৌসুমী ফুল। বাংলাদেশে শীত মৌসুমের ফুলের মধ্যে এর স্থান প্রথম সারিতে। গাছ ৩০ থেকে ৬০ সে.মি. লম্বা হয়ে থাকে। পাতা লম্বা, অমসৃণ ও লোমশ, গোড়ার দিকে কাণ্ডকে জড়িয়ে থাকে। ফুলের রঙ কমলা, লাল, হালকা খয়েরি ও হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। ফুল আকারে বড় (প্রায় ১০ সে.মি.) লম্বা কাণ্ড জাতীয় কাঠির মাথায় ফুল ফোটে। ক্যালেন্ডুলা নামকরণ করা হয়েছে ল্যাটিন শব্দ *Calendae* অর্থাৎ মাসের প্রথম দিন থেকে বা অনেক দিন ধরে ফুল গাছে থাকার প্রেক্ষিতে। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় কেটে গেলে রক্ত বন্ধ হওয়া ও ঘা শুকিয়ে যাওয়ার কাজে এর নির্যাস ব্যবহৃত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ক্যালেন্ডুলা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের শীত মৌসুমের ফুলের মধ্যে এটি জনপ্রিয়।

চাষাবাদ : বীজ সাধারণত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বপন করা হয়। ২/৩ মাসের মধ্যেই ফুল হয়। ক্যালেন্ডুলা বাগানে বপন করা ছাড়াও টবে রোপণ করা চলে। ছায়াতে এ গাছ ভাল হয় না, হলেও ফুল ধরে না। গাছের আগা রোপণের এক মাস পর ভেঙ্গে দিলে ভাল ফুল হয়।

লাগানোর দূরত্ব : ১ ফুট অন্তর লাগানো যেতে পারে।

উপযোগী মাটি : বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে।

বীজ আহরণ : মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল থেকে বীজ হয়। বীজ খুব ছোট বিধায় সাদা জাল দিয়ে ঢেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ৮০,০০০-৯০,০০০ পর্যন্ত হয়।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : ক্যাসে ফুলের পাপড়ি ও পাতাসহ সমস্ত গাছই ব্যবহার্য। পাতা ও বীজ শুকিয়ে পাউডার করে অথবা কাঁচা অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : ফুলের পাপড়ি, বীজ ও সমস্ত উদ্ভিদ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : ফুল আহারের উপযোগী এবং রস উত্তেজক হিসেবে কাজ করে বলে কথিত আছে। ফুল শুকিয়ে হজমির কাজে ব্যবহৃত হয় এবং কামলা (জণ্ডিস) রোগে উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- পাতা ও ফুলের পাপড়ির নির্যাস ছোট বাচ্চাদের শরীরে তেল হিসেবে ব্যবহারের প্রাচীন ও বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বহুল প্রচলিত।
- ফুলের রস যৌনশক্তি বৃদ্ধিকারক ও উত্তেজক।
- শুকনো ফুলের পাউডার হজমিতে ব্যবহার হয়।
- শুকনো ফুলের পাপড়ি পরিমাণমতো মধুসহ খেলে কামলা (জণ্ডিস) ভাল হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৫-৬ মাস।

অন্যান্য ব্যবহার : সম্পূর্ণ গাছ অথবা কাঠসহ ফুল বিশেষ প্রক্রিয়ায় ইকেবানা তৈরিতে ব্যবহার হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে বার্ষিক ১,০০,০০০ টাকা থেকে ১,২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

২৯. খয়ের

সংস্কৃত নাম : খরিদ, রক্তসার
Botanical Name : *Acacia catechu Willd.*
Common Name : *Khoyer*
English Name : *Catechu*
Family : *Mimosaceae*

পরিচিতি : মাঝারি আয়তনের কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ। বসন্তকালে পাতা সম্পূর্ণ ঝরে যায়। সাধারণত এটি ৪০-৬০ উঁচু হতে পারে। ছাল অমসৃণ, লম্বালম্বি ডোরাকাটা। কাঠের বাইরের অসার অংশ ফ্যাকাশে হলুদ এবং সার অংশ গাঢ় মেটে রঙ। ফুল ফিকে হলুদ রঙের, ফুল (গুটি) ৫.০৮ সে. মি. হতে ৮.৮৯ সে. মি. লম্বা, চেপ্টা পাতলা, গাঢ় বাদামি বর্ণের, এতে ৫-৬টি বীজ থাকে। বীজ গোলাকার। বর্ষাকালে ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

প্রাপ্তিস্থান : খয়েরের আদি নিবাস ভারতে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়ানো অবস্থায় কিছু কিছু খয়ের গাছ দেখা গেলেও এই গাছ দেশের উত্তরাঞ্চল ও সিলেটে বেশি দেখা যায়।

চাষাবাদ : বীজ হতে খয়েরের বংশবিস্তার করা যায়। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত বীজ সংগ্রহ করা যায়। বীজ সংগ্রহের পর দু-তিন দিন রোদে শুকানো হয়। বীজ সংগ্রহের এক মাসের মধ্যে বীজতলায় বপন করলে অংকুরোদগম ভালো হয়। মাটিতে বেশি গোবর মিশ্রিত বীজতলায় বীজ পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বীজ লাগানোর ৭-১৫ দিনের মধ্যে অংকুরোদগম শুরু হয় এবং এক মাস পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলে। স্বাভাবিকভাবে অংকুরোদগমের হার ৩০-৩৫%। চারা গজানোর ১৫-২০ দিনের মধ্যে মাটি ও গোবর (৩ ঃ ১) ভর্তি পটে চারা উঠিয়ে রাখতে হয়। ৩-৪ মাস বয়সের চারা মাঠে লাগানো যায়। অপেক্ষাকৃত শুকনা মাটিতে এর চাষ ভাল হয়। পুষ্ট চারা থেকে স্ট্যাম্প অর্থাৎ মূল এবং বিটপ কাটিংয়ের মাধ্যমে অঙ্গজ বংশবিস্তার করা হয়ে তাকে।

লাগানোর দূরত্ব : ১০ থেকে ১৫ ফুট।

উপযোগী মাটি : দেলে দো-আঁশ মাটিতে খয়ের ভালো জন্মে।

বীজ আহরণ : জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বীজ সংগ্রহ করা যায়। বীজ সংগ্রহের পর দু-তিন দিন রোদে শুকিয়ে নিতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৪ হাজার।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বীজ সংগ্রহকাল। বীজ দু-তিনদিন রোদে শুকিয়ে ১-১$\frac{১}{২}$ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : কাঠের সার অংশ ছাল ও বীজ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : খয়ের উদরাময় ও আমাশয় রোগে উপকারী। দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করে ও জ্বর ভালো করে। পুরাতন ক্ষত, সিফিলিসের নতুন ক্ষত, গনোরিয়া এবং অধিক রজঃস্রাব ও শ্বেতস্রাবে উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- ১০/১৫ গ্রাম খয়ের কাঠ পানিসহ ভালো করে সিদ্ধ করে সকাল-বিকাল খেলে মেদ কমে যায়।
- খয়ের কাঠ পানিতে সিদ্ধ করে পানি খেলে কিছুদিনের মধ্যে ফোঁড়ার উপকার পাওয়া যায়।
- খয়ের কাঠ সিদ্ধ পানি দুধে মিশিয়ে বেশ কিছু দিন খেলে শ্বেতী দাগ চলে যায়।
- খয়ের কাঠ এবং কাঠের ক্বাথ পানিতে সিদ্ধ করে যথাক্রমে নব প্রসূতির জ্বর, কাশি, শোথ, ফুলা রোগে উপকার পাওয়া যায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : খয়ের গাছ সাধারণত ৪-৫ বছরে পরিপক্ব হয় তবে পূর্ণাঙ্গ পরিপক্ব হতে ১০ বছর সময় প্রয়োজন।

অন্যান্য ব্যবহার : খয়ের কাঠ ঘরের খুঁটি, গরুর গাড়ির চাকা, লাঙ্গল ও ঢেঁকি বানানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। খয়ের কাঠ ভালো জ্বালানি। খয়ের গাছের আঠা কাগজ জোড়া লাগানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও পানের সাথে খয়ের খাওয়া হয়।

আয় : একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছ এককালীন ১৫,০০০-২০,০০০ হাজার টাকায় পর্যন্ত বিক্রয় করা সম্ভব।

৩০. গন্ধবাদালি

Botanical Name : *Paederia foetida Linn.*
Common Name : *Gondhabadali*
English Name : *Chindese Moon-creeper/Kings Tonic*
Family : *Rubiaceae*

পরিচিতি : গন্ধবাদালি লতানো উদ্ভিদ। এ গাছ চেনার বিশেষ উপায় হলো এর লতা-পাতায় উৎকট গন্ধ থাকে। এজন্য এর অপর একটি নাম পুতিগন্ধ। সাধারণত অন্য গাছ অথবা বাগানের বেড়ায় দেখা যায়। পাতা-লতার সাথে বিপরীতমুখী হয়ে গজায়, আকারে ছোট পান পাতার মতো। বর্ষাকালে এর লতা ও পাতা বেশি বাড়ে। চরক ও সুশ্রুত সংহিসতায় গন্ধবাদালি বা গন্ধালের নাম প্রসারণী। এটি সংকুচিত পথকে প্রসারিত ও তার অবরোধ নিবারণ করে। যার ফলে বায়ুর স্বচ্ছন্দচারী স্বভাবে বাধা এলে তাকে সরল করে। এজন্য এর নাম প্রসারণী।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি বনাঞ্চলে প্রচুর জন্মে। বিক্ষিপ্তভাবে দেশের অন্যত্রও জন্মে।

চাষাবাদ : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফুল হয় এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফল পাকে। বীজ বা লতার কাটিং-এর সাহায্যে এর বংশবিস্তার সম্ভব হলেও শিকড়সহ লতার অংশবিশেষ তুলে লাগালেও চারা হয়। বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না।

লাগানোর দূরত্ব : ৫ থেকে ৭ ফুট।

উপযোগী মাটি : বেলে দো-আঁশ মাটিতে গন্ধবাদালি ভালো হয়।

বীজ আহরণ : নভেম্বর-ডিসেম্বর। কাটিং থেকেও বংশ বৃদ্ধি হয়। কাটিংয়ের উত্তম সময় এপ্রিল-মে।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ৮০,০০০-১,০০,০০০।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সাধারণত কাঁচা অবস্থায় গন্ধবাদালির মূল, পাতা ও লতা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ব্যবহার্য অংশ : মূল, পাতা ও লতা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : গন্ধবাদালির প্রধান ব্যবহার আমাশয় বা পেটের অসুখে। দাঁতের ব্যথায় এর ফল খুব উপকারী। পাতার জলীয় নির্যাস পাথর গলিয়ে দেয় ও মূত্রবর্ধক হিসাবে কাজ করে। পেটের গ্যাস কমায়, মূল বমনকারক।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- গন্ধবাদালি পাতার রস মধুসহ খেলে সর্দি-কাশিতে উপকার পাওয়া যায়।
- গন্ধবাদালি পাতার রস এক সপ্তাহ নিয়মিতভাবে প্রতিদিন সকালে খেলে আমাশয়ে উপকার পাওয়া যায়।
- অজীর্ণ হলে গন্ধবাদালি পাতার ঝোল ভাতের সংগে খেলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অজীর্ণ দূর হয়।
- গন্ধবাদালি অত্যন্ত রুচিকারক।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ১ বছরে গন্ধবাদালি ব্যবহার উপযোগী হয়।
অন্যান্য ব্যবহার : পাতার রস মৌমাছিসহ অন্যান্য কীট-পতঙ্গ বিতাড়ন করে।
আয় : প্রতি একর জমিতে বার্ষিক আয় আনুমানিক ৩০,০০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকা।

৩১. গিলা

Botanical Name : *Entada phaseoloides (L.) Merr.*
Common Name : *Gila*
English Name : *Mackay Bean*
Family : *Leguminosae*

পরিচিতি : গিলা কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত লতা। চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাসমূহে দেখা যায়। মধুপুরের জঙ্গলেও পাওয়া যায়। এর কান্ড মোচড়ানো ও বক্রাকৃতি, ধূসরবর্ণ ও খসখসে, শুকালে গাঢ় ধূসর বর্ণ হয়। পত্রদণ্ড লম্বা, অগ্রভাগ আঁকশিতে পরিণত হয়। পাতা লম্বা, ডিম্বাকৃতি। ফুল ছোট, পাপড়ি ৫টি পুংকেশর ১০টি। ফল পুরানো পাতাহীন শাখা থেকে হয়। ফল শক্ত পুরানো পাতাহীন চ্যাপ্টা। উজ্জ্বল ও শক্ত। এপ্রিল মাসে ফুল মে মাসে ফল হয়।

প্রাপ্তিস্থান : চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাসমূহে প্রচুর দেখা যায়। মধুপুর জঙ্গলেও দেখা যায়।
চাষাবাদ : আমাদের দেশে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের কোন তথ্য নেই। তবে পাহাড়ি অঞ্চলে চাষাবাদ করা যেতে পারে।
লাগানোর দূরত্ব : ২৫ থেকে ৩০ ফুট। গাছের সাথে অথবা মাচানে।
উপযোগী মাটি : পাহাড়ি লাল ও কংকরযুক্ত মাটিতে ভালো জন্মে।
বীজ আহরণ : ফল দেখতে অনেকটা সিমের মতো কিন্তু বেশ বড়, লম্বায় প্রায় ২ থেকে ৩ ফুটের মতো হয়ে থাকে। ফলের ভিতরে বীজও দেখতে সিম বীজের মতো। মার্চ মাসে ফল পরিপক্ব হলে গাছ থেকে সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে বীজ আলাদা করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ৪০ থেকে ৫০টি।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : ফল থেকে বীজ বের করে ছায়াযুক্ত রোদে শুকিয়ে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করা যায়।
ব্যবহার্য অংশ : বীজের শাঁস।
উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : বীজ সিদ্ধ করে খাওয়া হয়। বীজ রোগ আক্রমণের প্রতিষেধক এবং কৃমিনাশক। বীজের শাঁস পাহাড়ি লোকেরা জ্বরে ব্যবহার করে।
কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- বীজের শাঁস রোগ প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- বীজের শাঁসের পাউডার সামান্য পরিমাণে সকালে খালি পেটে খেলে কৃমি থাকে না।
- বীজের শাঁস ৪০০ মি. গ্রাম পর্যন্ত খেলে জ্বর সারাতে কুইনানের মতো কাজ করে।
- এটি জীবাণুনাশক হিসেবেও কার্যকরী।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : এপ্রিল মাসে ফুল ও মে মাসে ফল হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : গায়ের রঙ ফর্সা ও চামড়া মসৃণ করার জন্য মুখের উপটান ও ক্রিম তৈরিতে ব্যবহার হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে ৪০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা।

৩২. গোলমরিচ

সংস্কৃত নাম : মরিচা
Botanical Name : *Piper nigum Linn.*
Common Name : *Gol marich*
English Name : *Plack pepper*
Family : *Piperaceae*

পরিচিতি : গোলমরিচ লতানো আংশিক পরজীবী গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। এর শাখার গাঁটে শিকড় হয়। পাতার উপরের অংশ ঘন সবুজ। শাখার কোনটিতে পুরুষ এবং কোনটিতে স্ত্রী ফুল থাকে। ফল গোলাকার। কাঁচা অবস্থায় সবুজ, পাকলে লাল রঙের হয় এবং শুকালে কালো রঙ ধারণ করে। স্বাদ তীব্র ঝালযুক্ত এবং ঈষৎ তিতা। মে-জুন ফুল ও জুলাই-আগস্ট মাসে ফল হয়।

প্রাপ্তিস্থান : চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলার পার্বত্য অঞ্চল, টাংগাইল, ঢাকা এবং বিভিন্ন উদ্যানে চাষ করা হয়। তবে দেশে অন্যান্য অঞ্চলে চাষ করা সম্ভব।

চাষাবাদ : বীজ থেকে এবং অঙ্গজভাবে গোলমরিচের বংশ বিস্তার ঘটে। তবে এর অঙ্গজ বংশবিস্তার সহজ।

লাগানোর দূরত্ব : ১ থেকে ২ ফুট।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতেই এটি জন্মে থাকে।

বীজ আহরণ : আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকলে, ফলের উপরের নরম আবরণ ফেলে দিয়ে রোদে শুকিয়ে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৯ হাজার।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : গোলমরিচ অবিরাম জ্বর, সর্দি, গনোরিয়া ও পেট ফাঁপায় বিশেষ উপকারী। গোলমরিচ ও পেয়াজ বেঁটে মাথায় দিলে চুল লম্বা হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে গোলমরিচ ব্যবহার করলে পুনরায় ম্যালেরিয়া হয় না। এছাড়াও অর্শ, কৃমি, বদহজম প্রভৃতি উপসর্গে গোলমরিচ উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- ছোট ছেলেমেয়েদের পেটে কৃমির ফলে পেটের উপরের অংশ ব্যথা হলে ৫০ মি.গ্রা. গোলমরিচ গুঁড়া সামান্য দুধ মিশিয়ে সকালে-বিকেলে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

- রক্ত চন্দন ঘষা সংগে গোলমরিচ গুঁড়া মিশিয়ে ফোঁড়ার উপর লাগানো একদিনেই তা ফেটে যাবে।
- বেল পাতার সংগে গোলমরিচ গুঁড়া মিশিয়ে ফোঁড়ার উপর লাগালে ফোড়া বসে যাবে।
- ঠাণ্ডা লেগে গলায় ব্যথা হলে এক চামচ গোলমরিচ গুঁড়ার সংগে অল্প লবণ মিশিয়ে চেটে খেলে গলা ব্যথা কমে যায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৬ থেকে ৮ মাসে এ গাছ ফল দেয়।

অন্যান্য ব্যবহার : মসলা হিসেবে গোলমরিচ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে ১,৫০,০০০ টাকা থেকে ২,০০,০০০ টাকা।

৩৩. গোলাপ

Botanical Name : *Rosa damascena Mill.*
Common Name : *Rose*
English Name : *Golap*
Family : *Rosaceae*

পরিচিতি : গোলাপের পরিচিতি মূলত এর ফুলের সৌন্দর্য আর সুগন্ধের কারণে। গোলাপ গাছ ঘন শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বহুবর্ষজীবী ঝোপ জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা অনেকটা গোলাকার, কিনারা করাতের মতো কাঁটা। কচি কাণ্ডর অগ্রভাগে ঘন পাপড়ি বিশিষ্ট ফুল হয়। বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু ও মাটির গুণাগুণের কারণে ফুলের গন্ধ ও আকারের তারতম্য হয়। গোলাপ বিভিন্ন বর্ণের হয়। বীজ এবং কলম দু'ভাবেই গাছ হয়। তবে কলমের গাছে ফুল ভাল হয়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গোলাপ ফুল জন্মে এবং চাষ করা হয়।

চাষাবাদ : অক্টোবর হতে জানুয়ারি মাস গোলাপ চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। গোলাপের জন্য মাটির পিএইচ ৫.৫ হতে ৭.৫ সবচেয়ে ভাল। কম হলে চুন এবং বেশি হলে এমোনিয়াম সালফেট মিশিয়ে মাটিকে সঠিক পিএইচএ আনা যেতে পারে। এঁটেল মাটিতে চুন প্রয়োগ উপকারী। গোলাপ জোড়া কলম, চোখ কলম, শাখা কলম ও দাবা কলমের সাহায্যে বিস্তার লাভ করে। চাষাবাদের ক্ষেত্রে রোপণের জন্য গর্ত ২′ × ২′ × ২.৫′ ফুট গভীর হওয়া উচিত। নিচের অর্ধেক মাটির সাথে প্রায় ৫ কেজি পচা গোবর সার, ০.৫ সের ছাই ও ০.২৫ সের হাড়ের গুঁড়া ভালোভাবে মিশিয়ে নেয়া যেতে পারে। উপরের অর্ধেক মাটির সাথে কম্পোস্ট সার ইত্যাদি মেশানো ভাল। গোলাপের অন্যান্য সারের মধ্যে খৈল, পোড়া মাটি, মাছের গুঁড়া ইত্যাদি ব্যবহার্য।

লাগানোর দূরত্ব : ভিন্ন ভিন্ন জাতের গোলাপ গাছ রোপণের জন্য বিভিন্ন দূরত্ব প্রয়োজন। এ দূরত্ব ১.৫-৮ ফুট পর্যন্ত। এটা নির্ভর করে কি জাতের গোলাপ লাগানো হচ্ছে সাধারণত কত বড় এবং কতটুকু ঝোপ আকৃতির হবে।

উপযোগী মাটি : গোলাপের জন্য মাটি pH ৫.৫-৭.৫ সবচেয়ে উত্তম। এঁটেল ও দো-আঁশ মাটি যেখানে পানি জমে থাকে না এবং পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পায় সেখানে ভাল জন্মে।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : বীজ হয় না।

বীজ আহরণ : বীজ হয় না। কলমের সাহায্যে বিস্তার লাভ করে।

বীজ সংগ্রহের সময় : অক্টোবর-জানুয়ারি চারা লাগানোর উত্তম সময়।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : গোলাপের পাপড়ি সংগ্রহ করে প্রথমে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। রোদে শুকানোর সময় পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে ধুলাবালি না পড়ে। শতকরা ৯ ভাগ আর্দ্রতা থাকা অবস্থায় এদের প্যাকেট করে নিতে হবে। গোলাপের ক্ষেত্রে হাইব্রিড জাত ছাড়া দেশী গোলাপের চাহিদা বেশি। কারণ দেশী গোলাপ সুগন্ধি। সংরক্ষণের সময় শুকানো পাপড়ি ভেঙ্গে যাওয়ার মতো মচমচে হওয়ার পূর্বেই প্যাকেজিং করতে হবে। তবে আর্দ্রতা বেশি থাকলে তা পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

ব্যবহার্য অংশ : ফুলের পাপড়ি

উপকারীতা : গোলাপ ফুল শক্তি বৃদ্ধি করে, বলকারক, পিত্তের সমস্যায় উপকারী, রুচি বৃদ্ধি করে। হৃৎপিণ্ডের শক্তি বাড়ায়। গুলকন্দ গোলাপ বলকারক এবং শরীরের পুষ্টিকারক। ইউনানি চিকিৎসার মতে গোলাপ ফুল যক্ষ্মা রোগে যুবতী মহিলাদের জন্য উপকারী। অর্শ, ফোড়া, পেট ব্যথা, যকৃত ও প্লীহার জ্বালা এবং গলা ও মুখের ঘায়ের পুলটিশ হিসাবে গোলাপ ফুল ব্যবহার করা যেতে পারে।

পরিপক্ক হওয়ার সময়কাল : গোলাপ গাছে সাধারণত বাড কলম করার কারণে ২-৫ মাসের মধ্যে ফুল ধরে ১-৪ বছর পর্যন্ত ভাল ফুল দেয়।

কোন অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- গোলাপের পাপড়ি গোলাপ পানি ও আতর তৈরিতে ব্যবহার হয়।
- ফুলের বৃত্ত হৃদযন্ত্রের সমস্যায় টনিক হিসাবে কাজ করে।
- গোলাপের পাপড়ি থেকে প্রস্তুতকৃত গুলকন্দ ল্যাক্সেটিভ হিসাবে এবং টনসিল উপশমে ব্যবহার হয়।
- গোলাপ পানি বিভিন্ন ঔষধে ব্যবহার হয়।
- গোলাপের পাপড়ি হতে নির্যাসিত ও নিষ্কাশিত তেল সুগন্ধি ও ঔষধ তৈরিতে ব্যবহার হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : গোলাপের পাপড়ি সাধারণত গোলাপ পানি এবং আতর তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। গোলাপের পাপড়ি হতে গুলকন্দ বানানো হয়, ল্যাক্সেটিভ হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং এ গুলকন্দ টনসিল উপশমে ব্যবহার করা হয়। গোলাপ পানি বিভিন্ন প্রকার ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গোলাপের পাপড়ি হতে নির্যাসিত এবং নিষ্কাশিত তেল সুগন্ধি ও ঔষধ তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ফুলের বৃত্ত হৃদযন্ত্রের সমস্যায় টনিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

আয় : আবহাওয়া ও মাটির গুণাগুণ সঠিক থাকলে একটি রোগমুক্ত গোলাপ গাছ থেকে বছরে-১০০-৪০০ টাকার ফুল পাওয়া যায়।

৩৪. গুলঞ্চ

সংস্কৃত নাম : গুলঞ্চি
Botanical Name : *Tinospoar cordifolia (Willd.) Miers.*
Common Name : *Tinospora*
English Name : *Gulancha*
Family : *Menispermaceae*

পরিচিতি : গুলঞ্চ একটি লতানো গাছ যার সরু সুতার মতো শিকড়গুলো মাটির দিকে ঝুলে থাকে। ছাল ধূসর বর্ণ, কাঠ শ্বেতবর্ণ এবং নরম ও ছিদ্রযুক্ত। পাতা ২ থেকে ৩ ইঞ্চি লম্বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি পাতলা এবং অগ্রভাগ সরু পানের মতো। ফুল গুচ্ছবদ্ধ নরম ডালে নীচের দিকে থাকে। বীজ মটরের মতো, লাল বর্ণের বক্রাকৃতি গোলাকার। ফল পীতা বর্ণের। আগস্ট মাসে ফুল হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফল ধরে।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল ছাড়া সব এলাকাতেই গুলঞ্চ জন্মে।

চাষাবাদ : মার্চ-এপ্রিল মাসে বীজ থেকে চারা জন্মায়। চারা লাগিয়ে চাষ করা যায়। আবার মে-জুন মাসে ডালের কাটিং থেকেও নতুন গাছ জন্মানো যায়।

লাগানোর দূরত্ব : ৪ থেকে ৬ ফুট। তবে কোন বড় গাছের সাথে পানের মতোও লাগানো যায়।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে গুলঞ্চ জন্মে থাকে।

বীজ আহরণ : সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকলে গাছ থেকে পেড়ে রোদে শুকিয়ে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৫ হাজার।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সাধারণত কাঁচা অবস্থায় গুলঞ্চের পাতা ও ছাল ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ : পুরো গাছ বা লতা।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : গুলঞ্চ সকল প্রকার জ্বরে উপকারী এবং শীতল ঠাণ্ডাজনিত কফ ও কাশনাশক। হৃৎপিণ্ড, যকৃত ও পাকস্থলির জ্বালা, বমন, মূর্ছা ও কামলা/জণ্ডিস রোগে উপকারী। ক্ষুধা ও রতিশক্তি বর্ধক এবং বীর্য উৎপাদক ও গাঢ়কারক। গুলঞ্চ পুরাতন প্রমেহ, শুক্রমেহ ও অর্শরোগে উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- সকল প্রকার চর্মরোগে—কাঁচা কাণ্ড থেঁতো করে ১ কাপ পানিতে ভিজিয়ে রেখে পরবর্তীতে কচলিয়ে ছেঁকে নিয়ে প্রতিদিন ২-৩ বার পানিটুকু খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- পুরাতন জ্বরে– পাতা বা কাণ্ড থেঁতো করে ১ কাপ গরম পানিতে ৩/৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পরবর্তীতে কচলিয়ে ছেঁকে নিয়ে প্রতিদিন ২-৩ বার পানিটুকু খেলে জ্বর সেরে যায়।

- কৃমি বিনাশে কাণ্ডের রস ২-৩ চা চামচ প্রতিদিন ২-৩ বার চিনিসহ ৫-৭ দিন খেতে হবে।
- গুলঞ্চ গুঁড়া ১ চা চামচ, সমপরিমাণ আখের গুড়সহ খালি পেটে খেলে ডায়াবেটিস রোগে উপকার পাওয়া যায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : এক থেকে দু'বছরে গুলঞ্চ পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : সকল প্রকার চর্মরোগে ব্যবহার হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে বার্ষিক ৬০,০০০ টাকা থেকে ৯০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

৩৫. গাঁদা

Botanical Name : *Tagetes erecta Linn*
Common Name : *Genda*
English Name : *Marigold*
Family : *Compositae*

পরিচিতি : গাঁদা গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। এটি ১.০ সে.মি. পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা বহু খণ্ডে বিভক্ত এবং পত্রকের ধার করাতের মতো খাঁজ কাটা। গাছে ও পাতায় সূক্ষ্ম লোম ও একটি ঝাঁঝালো গন্ধ আছে। সাধারণতঃ অঞ্চলভেদে সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত হলুদ থেকে কমলা রঙের ফুল হয়।

প্রাপ্তিস্থান : উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে গাঁদা ফুলের আদি নিবাস মেক্সিকোর গোডামেরিতে। সারা পৃথিবীতে গাঁদার ২০টি প্রজাতি দেখা যায়।

চাষাবাদ : শীতকালে ফুল হয় এবং শীতের শেষে ফুলের বীজ পাকে, এটি সংরক্ষণ করে জুন-জুলাই মাসে বীজ দিয়ে নতুন চারা উৎপাদন সম্ভব। তবে ভালো ও বড় ফুল গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। এছাড়া গাছের কাণ্ডের মাধ্যমে বংশবিস্তার হয়। এক্ষেত্রে মোটা ডাল থেকে ছোট ছোট শিকড় বের হয়। এসব ডাল কেটে মাটিতে পুঁতলে নতুন গাছ হয়ে যায়। কাটিং নেওয়ার সময় দেখতে হবে তাতে ফুল যেনো ভালো হয়।

লাগানোর দূরত্ব : দেড় থেকে দু'ফুট দূরত্বে চারা কিংবা কাটিং লাগাতে হয়।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে গাঁদা জন্মে থাকে।

বীজ আহরণ : সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ফুল ফোটে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৩০ হাজার।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : গাঁদা সাধারণত কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা ফুলের পাপড়ি।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : কোথাও কেটে গেলে রক্ত বন্ধ করতে, সুতাকৃমি ও পেটের সমস্যায় গাঁদা ফুল উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- রক্ত আমাশয়, রক্তার্শে, চোখ লাল হলে, কান ব্যথায়, ফোড়া পাকাতে এবং শরীরে পাঁচড়া হলে গাঁদা ফুলের এবং পাতার রস বিশেষভাবে উপকারী।
- কানের ব্যথায় : গাঁদা পাতার রস কানে দিলে ব্যথা দূর হয়।
- কোথাও কেটে গেলে : সঙ্গে সঙ্গে গাঁদা পাতার রস লাগালে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।
- কোথাও ঘা হলে : গাঁদা পাতার রস ক্ষতস্থানে লাগালে ঘা সেরে যায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৫ থেকে ৬ মাসেই গাঁদা গাছে ফুল আসে।

অন্যান্য ব্যবহার : সাধারণত ব্যগানের শোভা বৃদ্ধির জন্য গাঁদা লাগানো হয়ে থাকে। আমাদের দেশে গাঁদা ফুলের বিশেষ ব্যবহার দেখা যায় বিয়ের সময়। গায়ে হলুদে ঘর সাজানো থেকে শুরু করে কনে সাজানো পর্যন্ত গাঁদা ফুলের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এছাড়া, গাছ পশু খাদ্য ও শুকনো গাছ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সম্পূর্ণ গাছ পানিতে থেঁতলিয়ে ফসলের কীট বিতারক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

আয় : প্রতি একর জমিতে ফুল বিক্রি করে বছরে ৪০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৩৬. ঘোড়া নিম/বকাইন

সংস্কৃত নাম : মহানিম্ব
Botanical Name : *Melia sempervirens (Linn.) All.*
Common Name : *Bead Tree*
English Name : *Ghora Neem, Moha Nim*
Family : *Meliaceae*

পরিচিতি : ঘোড়া নিম ৪০ থেকে ৫০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। পাতা ১ থেকে $১\frac{১}{৩}$ ইঞ্চি লম্বা করাতের ন্যায় কিনারাযুক্ত পাতা। ফুল মধু গন্ধ বিশিষ্ট। পাতা বসন্তকালে ঝরে যায়। কাঠ অতিশয় শক্ত এবং লাল-বর্ণ। ফল সবুজ বর্ণের এবং পাকলে পীত বর্ণের। ফলে একটি বীজ হয়। আগস্ট হতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফুল হয় এবং সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে ফল হয়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘোড়া নিম গাছ জন্মে। হিমালয় প্রদেশের দু'হাজার থেকে তিন হাজার ফুট উচ্চ স্থানে ঘোড়া নিম গাছ দেখা যায়।

চাষাবাদ : প্রতিটি ফলে ১টি করে বীজ থাকে। ফলের ত্বক ছাড়িয়ে ছায়ায় শুকিয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে মাটিতে বপন করতে হবে। বীজ বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে চারা গজায়। বীজ অংকুরোদগমের হার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ।

লাগানোর দূরত্ব : ১৫ থেকে ২০ ফুট।

উপযোগী মাটি : সাধারণত সব ধরনের মাটিতে ঘোড়া নিম গাছ জন্মে থাকে। তবে বেলে-দোআঁশ মাটিতে বেশি ভালো হয়।

বীজ আহরণ : নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে গাছ থেকে অথবা গাছের নিচ থেকে সরাসরি বীজ আহরণ করা যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রতি কেজিতে ৪০০ হতে ৫০০টি।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা, ছাল, ফুল ও ফল ব্যবহার হয়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : ঘোড়া নিম যকৃত ও প্লীহার প্রতিবন্ধকতা দূর করে এবং কফ নিঃসারক ও বমিকারক। এর প্রলেপ ফোলা ও অর্শরোগনাশক। সির্কার সাথে ঘোড়া নিমের রস সেবনে প্লীহা রোগনাশক। সর্দি ব্যথা ও খিচুনিতে এবং শুকনা খুঁজলী-পাঁচড়ায় উপকারী। ঘোড়া নিম বীজের তেল মস্তিষ্কের বলকারক ও ফোড়া পাকায়। ঘোড়া নিম পাতা ও ফুল প্রস্রাব ও ঋতুকারক এবং স্নায়ুবাত ও শোথনাশক।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- ঘোড়া নিম ও ফুল প্রস্রাব ও ঋতুকারক ও স্নায়ুবাত ও শোথনাশক।
- ঘোড়া নিম যকৃত ও প্লীহার প্রতিবন্ধকতা দূল করে এবং কফ নিঃসারক ও বমিকারক।
- সির্কার সাথে ঘোড়া নিমের রস সেবনে প্লীহা রোগনাশক।
- ঘোড়া নিম বীজের তেল মস্তিষ্কের বলকারক ও ফোড়া পাকায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৪-৫ বছরে পরিপক্ব হয় তবে পূর্ণাঙ্গ পরিপক্ব হতে ১০ বছর সময় প্রয়োজন।

অন্যান্য ব্যবহার : ঘোড়া নিম জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং কাঠ আসবাবপত্র ও ঘরবাড়ি তৈরিতে প্রচুর ব্যবহার হয়।

আয় : একটি প্রাপ্তবয়স্ক গাছে ৪০-৫০ কেজি ফল পাওয়া যায়, যার বাজার মূল্য প্রায় ৫০০ টাকা। এছাড়াও একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছ এককালীন ৫,০০০-১০,০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রয় করা সম্ভব।

৩৭. ঘৃতকুমারী

সংস্কৃত নাম : ঘৃতকুমারী, কন্যাকুমারী
Botanical Name : *Aloe indica Linn.*
Common Name : *Ghritokumari*
English Name : *Indian Aloe*
Family : *Liliaceae*

পরিচিতি : ঘৃতকুমারী বহুবর্ষজীবী বীরুৎ প্রকৃতির উদ্ভিদ। উচ্চতায় এটি ২-৩ ফুট পর্যন্ত থাকে। পাতা দীর্ঘ, মোটা ও রসালো, কিনারা কন্টক সদৃশ। পাতার অভ্যন্তরে থক্‌থকে মাংসল পিচ্ছিল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে যা স্বাদে তিক্ত।

রাসায়নিক উপাদান : পাতার রসের প্রধান উপাদান বার্ব্যালোয়েন, ইসোডিন, ক্রাইসোফ্যানিক এসিডসহ বিভিন্ন এন্থ্রাকুইনোন গ্লাইকোসাইড।

প্রাপ্তিস্থান : সারা বাগানে লাগানো হয় এবং কোথাও কোথাও চাষ করা হয়। গৃহ প্রাঙ্গণে এবং টবে চাষ করা হয়। বর্তমানে বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগে এর ব্যাপক চাষাবাদ দেখা যায়।

চাষাবাদ : অঙ্গজ প্রজনন পদ্ধতিতে এর বংশবিস্তার হয়ে থাকে। শিকড় থেকে গজানো কুড়ি বড় হয়ে এর বংশবিস্তার ঘটে। ছোট চারা এনে লাগালেই ঘৃতকুমারী গাছ হয়। ফলে বীজ সংরক্ষণের প্রয়োজন পড়ে না। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অযত্নে এই গাছটি জন্মে থাকে। কোন কোন স্থানে বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে এর চাষ হয়ে থাকে। আবার অনেকে বাগান সাজানো বা বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য টবে এ গাছ লাগিয়ে থাকেন।

লাগানোর দূরত্ব : ১ থেকে ২ ফুট।

উপযোগী মাটি : বাংলাদেশের আবহাওয়ায় সব ধরনের মাটিতে ঘৃতকুমারী জন্মে থাকে। বন-জঙ্গল কিংবা বাড়ির আশপাশে জন্মে। তবে বেলে-দো-আঁশ মাটিতে উন্নতমানের ঘৃতকুমারী হয়ে থাকে। বরেন্দ্রভূমিতে ভাল জন্মে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : ঘৃতকুমারীর পাতা সংগ্রহ করে পরিষ্কার করে নিতে হয়। ধারালো ছুরি দিয়ে পাতার অভ্যন্তরীণ পিচ্ছিল মজ্জা পৃথক করা হয়। অনেকগুলো পাতার মজ্জা একত্রে পাত্রে নিয়ে মৃদু তাপে জ্বাল দেয়ার পর যখন কিছুটা ঘনীভূত হয়ে আসে, তখন চুলা হতে নামাতে হবে। এ ঘনীভূত নির্যাস রেক্সিনে ছড়িয়ে রৌদ্রে শুকাতে হবে। জলীয় অংশটুকু শুকিয়ে শক্ত আকার ধারণ করলে বায়ুরোধী পরিষ্কার পাত্রে সংরক্ষণ করতে হয়। এছাড়াও ঘৃতকুমারীর পিচ্ছিল মজ্জা চটকে আমসত্ত্বের মতো শুকিয়েও সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : পাতার ভিতরের মজ্জা বা রসালো পিচ্ছিল পদার্থ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : ভেষজ উদ্ভিদের জগতে ঘৃতকুমারীর অবস্থান অনেকটা রাজকুমারীর মতোই। রূপকুমারীদের অতি প্রিয় ভেষজ উদ্ভিদ এটা। এর পাতার ভিতরের মাংসল ও পিচ্ছিল অংশ, ডাঁটা এবং মূল ও শুষ্ক রস (মুসব্বর) ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ঘৃতকুমারী পাকস্থলি, মস্তিষ্ক ও সন্ধিসমূহের সমস্যা দূর করে। মেধা ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি যেমন বদহজম, ক্ষুধামন্দা, বাড়তি মেধ দূর করা, প্লীহা, যকৃত, কৃমি ও বাতসহ বহু রোগে ধনন্তরী হিসেবে কাজ করে। নিদ্রাকারক, শূল ও হাঁপানিনাশক এবং চোখের জ্যোতিবর্ধক। কোষ্ঠকাঠিন্যনাশক ও কৃমিনাশক। হাড়ভাঙ্গা, মচকানো ও ফোলা অপসারক এবং বেদনানাশক।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- পুড়ে গেলে : ঘৃতকুমারীর শাঁস প্রলেপ দিলে জ্বালা উপশম হয় এবং বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।
- চর্মরোগ : এক তোলা পরিমাণ প্রলেপ দিলে চর্মরোগ ভাল হয়।
- প্লীহা হলে : এক তোলা পরিমাণ ঘৃতকুমারীর রস হলুদ গুঁড়াসহ নিয়মিত সেবন করলে প্রভূত উপকার হয়।
- মাথা ঠাণ্ডা রাখতে : ঘৃতকুমারীর পাতার নির্যাস মাথায় ব্যান্ডেজ করলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে

প্রস্রাবের সময় কোঁথ দিলে শুক্রমেহ হলে ঘৃতকুমারী ৫ গ্রাম শীসের সাথে একটু চিনি মিশিয়ে শরবত করে সকালে বা বিকেলে ৬/৭ দিন খেলে ঐ ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণতঃ ৭ থেকে ৯ মাসে পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : প্রসাধনী দ্রব্য তৈরিতে ঘৃতকুমারীর পিচ্ছিল মজ্জা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আয় : ঘৃতকুমারীর চাষ বাণিজ্যিকভাবে **খুবই লাভজনক**। একটি প্রাপ্তবয়স্ক গাছ থেকে ৪০ থেকে ৫০ টাকা আয় করা সম্ভব। এভাবে একরে ২-৩ লক্ষ টাকা আয় হতে দেখা যায়।

৩৮. চই

সংস্কৃত নাম : চতিকা
Botanical Name : *Piper chaba Hunter.*
Common Name : *Choi*
English Name : *Cubeba*
Family : *Piperaceae*

পরিচিতি : এটি লতানো আংশিক পরজীবী গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। পাতার উপরের অংশ ঘন সবুজ। শাখার কোনটিতে পুরুষ এবং কোনটিতে স্ত্রী ফুল থাকে। ফল গোলাকার কাঁচা অবস্থায় সবুজ, পাকলে লাল রঙের হয় এবং শুকালে কালো রঙ ধারণ করে। স্বাদ তীব্র ঝালযুক্ত এবং ঈষৎ তিক্ত। সেপ্টেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফুল ও জুলাই-আগস্ট মাসে ফল হয়।

প্রাপ্তিস্থান : চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলার পার্বত্যাঞ্চল, টাংগাইল, বাগেরহাট, ঢাকা এবং বিভিন্ন উদ্যানে চাষ করা হয়। তবে দেশে অন্যান্য অঞ্চলে চাষ করা সম্ভব।

চাষাবাদ : বীজ থেকে এবং অঙ্গজভাবে বংশবিস্তার ঘটে। তবে অঙ্গজ বংশবিস্তার সহজ।

লাগানোর দূরত্ব : ৩ থেকে ৫ ফুট।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতেই এটি জন্মে থাকে।

বীজ আহরণ : ফেব্রুয়ারি মাসে ফল পাকলে, ফলের উপরের নরম আবরণ ফেলে দিয়ে রোদে শুকিয়ে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৮ হাজার।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : ফল পাকলে তার উপরের নরম আবরণ ফেলে দিয়ে রোদে শুকিয়ে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। এভাবে দীর্ঘদিন চই সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : ফল, বীজ এবং লতা।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : চই জ্বর, সর্দি, গনোরিয়া ও পেট ফাঁপায় বিশেষ উপকারী। চই মূত্রকর, ম্যালেরিয়া জ্বরে চই ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়াও অর্শ, কৃমি, বদহজম, প্রভৃতি উপসর্গে উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- চই ম্যালেরিয়া জ্বরে কার্যকরী।
- কৃমি, বদহজম প্রভৃতি উপসর্গেও চই বিশেষ উপকারী।
- খুলনা অঞ্চলে পানি অতিরিক্ত লবণাক্ত থাকায়, মরিচের পরিবর্তে চই ঝাল ব্যবহার করা হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৬ থেকে ৮ মাসে এই গাছ ফল দেয়।

অন্যান্য ব্যবহার : খাদ্রব্যের স্বাধ বৃদ্ধির জন্য চই ব্যবহারের ইতিহাস প্রাচীন।

আয় : বাজারে ঔষধি ও শিল্পক্ষেত্রে চইয়ের ভাল চাহিদা রয়েছে। প্রতি একর জমিতে বার্ষিক ৭৫,০০০ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

৩৯. চালতা

Botanical Name : *Dillenia indica Linn*
Common Name : *Chalta*
English Name : *Dillenia*
Family : *Dilleniaceae*

পরিচিতি : চালতা মাঝারি আকারের ১৪-১৫ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন চিরহরিৎ বৃক্ষ। বাকল লাল ও মসৃণ। পাতা ঘন, ২৫-৩০ সে.মি. লম্বা, কিনারা করাতের ন্যায় কাঁটা কাঁটা এবং উঁচু। সাদা রঙের সুগন্ধযুক্ত ফুল ১৫-১৮ সে.মি. লম্বা, পাপড়ি ১৫-২০টি।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের সর্বত্রই পাওয়া যায়। তবে দক্ষিণাঞ্চলে বেশি হয়।

চাষাবাদ : বীজ থেকে মার্চ-জুলাই মাসে চারা উৎপন্ন করা যায়, আবার শাখা কলম থেকেও চারা জন্মাতে পারে। মাটি উর্বর থাকলে জৈব সার এবং সামান্য যত্নে ভালো গাছ জন্মাতে পারে।

লাগানোর দূরত্ব : বাগানে ৩০ ফুট দূরে দূরে বর্গপ্রণালীতে চারা রোপণ করতে হবে।

উপযোগী মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতেই জন্মে।

বীজ আহরণ : পাকা ফলের মধ্যে ২০টির মতো প্রকোষ্ঠ থাকে আর প্রতিটি প্রকোষ্ঠে ৪টি বীজ থাকে। বীজ স্বচ্ছ আঠাযুক্ত হালকা হলুদ বর্ণের। ফল থেকে বীজ ছাড়িয়ে ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে গুদামজাত করা যায়। বীজ বেশি দিন গুদামজাত রাখা যায় না।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ৩০০-৫০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : পাকা অবস্থায় গাছ থেকে ফল পেড়ে বোতলে বা ক্যানে করে সংরক্ষণ করা হয়। কাঁচা ফল চাক চাক করে কেটে রোদে শুকিয়ে টিনের ক্যানে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা, মূলের ছাল ও ফল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : কচি চালতার রস জ্বর ও কাশিতে উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- পাকা চালতা থেঁতো করে ২০ মিলিলিটার রসে এক চা চামচ চিনি মিশিয়ে দিনে একবার খেলে শুল রোগ দূর হয়।
- ৩০ গ্রাম কচি চালতা বেঁটে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানিতে মিশিয়ে খেলে বাতের উপকার পাওয়া যায়।
- ছোট আকারের কচি চালতা ছোট ছোট টুকরো করে ১২০ মিলিলিটার পানিতে সিদ্ধ করে আধা কাপ করে তা ঠাণ্ডা অবস্থায় দিনে একবার খেলে পিত্ত বৃদ্ধি কমে যায়।
- ফল থেকে সুস্বাদু আচার তৈরি করা যায়।
- চালতা অত্যন্ত রুচিকারক।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৬-৭ বছরে ফুল ও ফল আসে।

অন্যান্য ব্যবহার : কাঠ ভারি এবং পানিতে টেকসই বলে নৌকার তলদেশ ও যন্ত্রপাতির হাতল তৈরিতে ব্যবহার হয়। কাঠে উন্নতমানের কয়লা হয়, বাকল ট্যানিন হিসেবে এবং ফলের আঠালো অংশ চুল পরিষ্কারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাকলের আঁশ থেকে দড়ি প্রস্তুত হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে ৫০,০০০ টাকা থেকে ৬০,০০০ টাকা।

৪০. ছাতিম

সংস্কৃত নাম : সপ্তপর্ণী
Botanical Name : *Alstonia scholoaris R.Br.*
Common Name : *Chatim, Satim*
English Name : *Devil's Tree*
Family : *Apocynaceae*

পরিচিতি : ছাতিম বড় ধরনের চিরসবুজ, ঘন পাতাযুক্ত গাছ। সাধারণত ৫০-৭০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। কাণ্ডের চারিদিক শাখা এবং শাখার চারিদিকে ৪-৭টি পাতা ছত্রাকারে ছড়ানো থাকে। আবার প্রায় সব শাখার আগায় ছত্রাকারে ৭টি পাতা সাজানো থাকে। পাতা ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা হয়। গাছের বাকল পুরু, উপরিভাগ খসখসে, অমসৃণ ও গাঢ় ধূসর বর্ণের এবং ভিতরটা সাদা ও দানাযুক্ত। গাছের সকল অংশে তিক্ত স্বাদের, সাদা দুধের মতো আঠা থাকে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে সবুজের আভাযুক্ত সাদা থোকা থোকা ফুল ফোটে। ফুল তীব্র সুগন্ধযুক্ত। বরবটির মতো সরু ফল ৮-৯ ইঞ্চি লম্বা হয়।

রাসায়নিক উপাদান : ফলের প্রধান উপাদান ট্যানিন, বিভিন্ন জৈব এসিড, ফ্ল্যাভোনয়েড দ্রব্য, লুপিয়ল ও সাইটোস্টেরল।

প্রাপ্তিস্থান : ছাতিমের আদি নিবাস চীন হলেও বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকাসহ এশিয়ার প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। তবে সমভূমিতে এ গাছ দ্রুত বাড়ে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে রাস্তার আশপাশে ছাতিম গাছ দেখা যায়।

চাষাবাদ : বীজ অত্যন্ত হালকা হওয়ায় কাঠের গুঁড়া অথবা বালির সাথে মিশিয়ে মার্চ মাসে বপন করতে হয়। বীজ অংকুরোদগম হার শতকরা ৫০-৬০ ভাগ। কাটিংয়ের চেয়ে বীজ থেকে চারা তৈরি সহজ ও উত্তম। চারা গাছ বাংলাদেশের সর্বত্রই লাগানো যায়। তবে রাস্তার পাশে লাগানো ভাল।

বীজ আহরণ : জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ফল পেকে বাদামি রঙ ধারণ করলে তা সংগ্রহ করে ২-৩ দিন কাপড় দিয়ে ঢেকে শুকিয়ে নিতে হয়। পরে মাড়াই করে বীজ আলাদা করে নিতে হয়।

লাগানোর দূরত্ব : সাধারণত ২০-৩০ ফুট দূরত্বে গাছ লাগানো উত্তম।

উপযোগী মাটি : সাধারণত দো-আঁশ মাটি ছাতিম চাষের জন্য উপযোগী।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ২৫০,০০০ থেকে ৩০০,০০০টি বীজ থাকে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বাদামি রঙের ফল সংগ্রহ করে ২/৩ দিন কাপড় দিয়ে ঢেকে শুকিয়ে নিতে হয়। পরে মাড়াই করে বীজ আলাদা করে নিতে হয়। বীজ ১/২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : গাছের ছাল ও আঠা ব্যবহার হয়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : ছাতিম ছালের প্রধান ও প্রচলিত ব্যবহার কুষ্ঠ রোগে। এছাড়াও কফের আধিক্যসহ হিক্কা শ্বাসে, সর্দিবিহীন হাঁপানিতে, ঠাণ্ডা লেগে বুকে সর্দি বা শ্লেষ্মা বসে গেলে, মায়ের বুকের দুধ কমে গেলে, জ্বর, খাদ্যে অরুচি এমনকি উচ্চরক্তচাপ ও ক্যান্সারের ওষুধ হিসাবে ছাতিমের ছাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ছাতিমের আঠা পাইওরিয়া, ব্রণের ক্ষত, দাঁতের যন্ত্রণায় উপকারী। টিউমার, ডায়রিয়া ও আমাশয় রোগেও বাকলের নির্যাস আঠা ও মূল ব্যবহৃত হয়।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- ছাতিম ছালের প্রধান ও প্রচলিত ব্যবহার কুষ্ঠ রোগে। কুষ্ঠ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় :

  (ক) ছাতিম ছালচূর্ণ এক গ্রাম, এক চামচ গুলঞ্চের রস মিশিয়ে খেতে হবে।

  (খ) ১০/১২ গ্রাম ছাল তিন কাপ পানিতে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে ঐ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। অথবা

  (গ) ৪০/৪৫ গ্রাম ছালকে থেঁতো করে ৫০০ মি.লি. পানিতে খানিকক্ষণ সিদ্ধ করে ছেঁকে সেই পানি গোসলের পানির সাথে মিশিয়ে গোসল করলে রোগ নিরাময় হয়।
- কফের আধিক্যসহ হিক্কা শ্বাসে ছাতিম ছালের আধা চা চামচ রসের চার ভাগের এক ভাগ এক কাপ দুধের সাথে মিশিয়ে খেলে উপশম হয়।
- সর্দিবিহীন হাঁপানিতে এক থেকে দেড় গ্রাম ছাতিম ছালের গুঁড়া ২৫০ মি.গ্রা. পিপুল চূর্ণ দয়ের সাথে মিশিয়ে খেতে হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৪-৫ বছরে পরিপক্ব হয় তবে পূর্ণাঙ্গ পরিপক্ব হতে ১০ বছর সময় প্রয়োজন।

অন্যান্য ব্যবহার : ছাতিম কাঠ সাদা বর্ণের নরম, হালকা ও সুন্দর। পেন্সিল, দিয়াশলাই কাঠি, চায়ের বাক্স ইত্যাদি তৈরিতে এ কাঠ ব্যবহৃত হয়। স্কুলগামী বাচ্চাদের লেখার জন্য কাঠের স্লেটও এ কাঠ দিয়ে তৈরি করা হতো। এছাড়া ছোরা বা তরবারির খাপ তৈরিতেও এ কাঠ ব্যবহার করা হয়।

আয় : একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছ এককালীন ৫,০০০-১০,০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রয় করা সম্ভব।

৪১. জবা

Botanical Name : *Hibiscus rosa-sinensis Linn.*
Common Name : *Jaba.*
English Name : *China rose.*
Family : *Malvaceae.*

পরিচিতি : এটি একটি ক্ষুপ বা গুল্ম, বড় জোড় ৪ মিটার উঁচু হতে দেখা যায়। গাছ বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। কাণ্ড খসখসে, পাত মসৃণ ও চকচকে। ফুল ১০-১৫ সে.মি. চওড়া। ফুলের মধ্যে বর্ণ বৈচিত্র্য প্রচুর। এর সাদা, পাটল, লাল, গোলাপি, হলুদ ফুলের জাত রয়েছে। ফুল একক অথবা যুগ্ম হতে পারে। পাতাও দেখতে সুন্দর। পাতার দুই ধার করাতের মতো দাঁত কাঁটা। জবা গাছ কষ্টসহিষ্ণু অল্প যত্নে জন্মে।

প্রাপ্তিস্থান : আদি নিবাস চীন দেশ। উপমহাদেশসহ বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।

চাষাবাদ : বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ হয় না।

লাগানোর দূরত্ব : ৩ থেকে ৪ ফুট।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতেই এটি জন্মে থাকে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : কাঁচা অবস্থায় জবার ফুল ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার্য অংশ : ফুল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : জবা ফুল স্নিগ্ধ, শীতল ও পিচ্ছিল। ফুলের পাপড়ি ক্বাথ স্নিগ্ধ বলে জ্বর, কাশ ও বস্তিপ্রদাহে ব্যবহৃত হয়। জবা ফুলের পাপড়ির রস বা সিরাপ মূত্র কৃচ্ছ ও মূত্রযন্ত্রের প্রদাহনাশক এবং ঋতুস্রাব ও ঋতু দুর্বলতানাশক। এছাড়াও ও শিমূল মূলের সঙ্গে জবাফুল সেবনে বেশি ফল পাওয়া যায়।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

১. টাকপড়া রোগে জবা ফুল বেটে লাগিয়ে দিলে পুনরায় ওখান থেকে চুল বেরুবে।
২. চোখ উঠলে জবা ফুল বেটে চোখের উপর ও নিচের পাতায় গোল করে লাগিয়ে দিলে চোখ ওঠা সেরে যায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ১ থেকে ২ বৎসরেই জবা গাছে ফুল ফোটে।

অন্যান্য ব্যবহার : সৌন্দর্য বর্ধক গাছ হিসেবেও জবা গাছ লাগানো হয়ে থাকে। এছাড়া হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পূজায় জবা ফুল ব্যবহৃত হয়।

আয় : প্রতি একর জমি থেকে বার্ষিক ২৫,০০০-৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

৪২. জৈন/যোয়ান

সংস্কৃত নাম : যমানী
Botanical Name : *Carum copticum Benth.*
Common Name : *Jowan*
English Name : *Bishop's Weed*
Family : *Umbelliferae*

পরিচিতি : যোয়ান এক প্রকার গুল্ম জাতীয় বর্ষজীবী উদ্ভিদ। দেখতে অনেকটা ধনিয়া গাছের মতো শাখা ও পাতাযুক্ত। ১$\frac{১}{২}$ থেকে ২ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতা কোমল লোমযুক্ত। সাদা রঙের ছোট ফুল হয়। ফল ছোট গোলাকার তীব্র গন্ধ ও ঝাঁঝালো স্বাদযুক্ত। যোয়ান খেলে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় বলে নানাখাহ বলা হয়। প্রাচীনকালে ইরানবাসীরা তন্দুরি রুটির উপর যোয়ান ছিটিয়ে দিত।

প্রাপ্তিস্থান : বৃহত্তর ময়মনসিংহে চাষ হয়। দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতেও সীমিত চাষ হয়। সমতল ভূমিতে ভাল জন্মে।

চাষাবাদ : সাধারণত অক্টোবর-নভেম্বর মাসে যোয়ান ক্ষেতে বপন করতে হয়। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসের দিকে ফুল হয় ও পরবর্তীতে ফল হয়। ফল বা বীজ মার্চ-এপ্রিল মাসে পাকে।

লাগানোর দূরত্ব : ১ থেকে ২ ফুট। অন্যান্য রবি শস্যের মতো ক্ষেতে ছিটিয়ে চাষ করা যায়।

উপযোগী মাটি : সমতল ভূমিতে বীজ বপন করতে হয়। বিশেষতঃ বেলে-দো-আঁশ মাটিতে উৎকৃষ্টমানের যোয়ান উৎপন্ন হয়।

বীজ আহরণ : ফল বা বীজ মার্চ-এপ্রিল মাসে পাকলে ক্ষেত থেকে উঠিয়ে ভালভাবে রৌদ্রে শুকানোর পরে মাড়াই করে বা গাছ থকে ঝেড়ে সংগ্রহ করতে হয়। সুনিষ্কাশিত উঁচু জমিতে উৎপাদন ভাল হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৮০ হাজার।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : যোয়ান পুরোপুরিভাবে পাকলে জমি থেকে উঠিয়ে ভালভাবে রৌদ্রে শুকানোর পরে মাড়াই করে বা ঝেড়ে সংগ্রহ করতে হয়। পরিষ্কার করে শুষ্ক জায়গায় রাখা হলে ১ বছর পর্যন্ত যোয়ান সংরক্ষণ করা যায় এবং এর কার্যকারিতা অটুট থাকে।

ব্যবহার্য অংশ : বীজ ও তেল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : যোয়ান যকৃত ও পাকস্থলির শক্তি বাড়ায়। ক্ষুধা ও হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, পাকস্থলির ব্যথা কমায় ও বায়ুনাশক। কামোদ্দীপক, প্রস্রাব, ঋতুস্রাব ও স্তন্যদুগ্ধ বাড়ায়। এছাড়াও পেট ফাঁপা ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- যোয়ানের জোসান্দা চোখ পরিষ্কার করে।
- যোয়ান মধুসহ প্রলেপ অণ্ডকোষের ফোলা, সর্বশরীরের ফোলা ও ব্যথা ভালো হয়।

- যোয়ান ১ ভাগ, ১০ ভাগ লেবুর রস ভিজিয়ে শুকিয়ে (এভাবে ৭ বার) মাত্রা মতো সেবনে কামশক্তি বৃদ্ধি করে।
- ১/২ গ্রাম পরিমাণ যোয়ান গুঁড়ার সাথে সামান্য পরিমাণ বিট লবণ মিশিয়ে খাবারের পর ২ বার খেলে হজম শক্তি বেড়ে ও পেট ফাঁপা ভালো হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণতঃ ৪ থেকে ৫ মাসে যোয়ান পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : কোন কোন জায়গায় দৈনন্দিন রান্নার কাজে যোয়ান ব্যবহার করা হয়। বিশেষত খাবার সুস্বাদু ও মুখরোচক করার জন্যে যোয়ান ব্যবহৃত হয়।

চাহিদা : শিল্পে এর বার্ষিক চাহিদা ৪৮০,০০০ কেজি এবং ঔষধ শিল্পে বার্ষিক ৬০,০০,০০০ কেজি।

আয় : প্রতি একর জমিতে বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা থেকে ৭০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৪৩. ডালিম

সংস্কৃত নাম : ডাদিমা
Botanical Name : *Punica granatum Linn.*
Common Name : *Dalim*
English Name : *Pomegranate*
Family : *Punicaceae*

পরিচিতি : ডালিম একটি পাতাঝরা চিরহরিৎ বৃক্ষ। গাছ ১০ থেকে ১৫ ফুট লম্বা হয় এবং কাঠ ফিকে পীত বর্ণের অল্প কালো দাগযুক্ত যার ভিতরে শক্ত। শাখা প্রশাখাগুলো গোলাকার। পাতা সাধারণত ২ থেকে ৩ ইঞ্চি লম্বা এবং উভয় দিক্ সরু এবং উপরিভাগ চকচকে মসৃণ। ডালিমের উৎপত্তিস্থান ইরান। গ্রীষ্মকালে শুকনো ও শীতকালে নিম্ন তাপমাত্রা ডালিম চাষের পক্ষে অনুকূল। এখানকার জলবায়ু এর জন্য আদর্শ না হলেও বাংলাদেশের সর্বত্র ডালিম জন্মে।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলাতে ডালিম পাওয়া যায়। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান ও আফ্রিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ডালিম জন্মে।

চাষাবাদ : সাধারণত গুটি কলমের মাধ্যমে এর চারা তৈরি করা হয়। বীজ থেকে তৈরি চারার গুণগত মান ঠিক থাকে না। এক বছর বয়সী কচি ডালে সাধারণত কলম করা হয়। কলমের গাছে ১-২ বছরের মধ্যে ফল ধরে এবং বীজের গাছ ফল ধরতে ৪-৫ বছর সময় লাগে।

লাগানোর দূরত্ব : ১২ থেকে ১৫ ফুট দূরত্বে ডালিম চারা রোপণ করতে হয়।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে ডালিম জন্মে। তবে বেলে, দো-আঁশ ও পলি মাটিতে ভালো হয়।

বীজ আহরণ : আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকলে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করা যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৪-৬ হাজার।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বীজ থেকে চারা তৈরি হয়। গুটি কলম ও শক্ত ডালের কাটিং পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করলে মাতৃগুণ অক্ষুণ্ন থাকে। ফল ছিদ্রকারী পোকার হাত থেকে বাঁচতে পাতলা কাপড় দিয়ে কচি ফল ঢেকে দিতে হয়।

ব্যবহার্য অংশ : ডালিমের ফুল, ফল, রস, বীজ, ফলের ও গাছের ছাল এবং পাতা ব্যবহার হয়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : ডালিম রক্ত উৎপন্ন করে এবং হৃৎপিণ্ড ও লিভারের শক্তি বৃদ্ধিতে বিশেষ কার্যকরী। ডালিম ক্ষুধাবর্ধক, হৃদকম্প নিবারক, স্বর পরিষ্কারক, মূত্র প্রবাহক, পিপাসানাশক, শক্তিবর্ধক, আমাশয় নিবারক ও পুষ্টিকারক। মিষ্টি ডালিম হতে টক ডালিমে মূত্র প্রবাহক শক্তি বেশি।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- মিষ্টি ডালিমের রস নিয়মিত কিছুদিন খেলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শারীরিক দুর্বলতায় উপকারী।
- ডালিম গাছের শিকড়, ছাল ও ফলের খোসা আমাশয় ও পেটের অসুখ নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়।
- কুষ্ঠরোগ উপশমে এ ফলের রস ব্যবহার করা হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৪-৫ বছরে পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : কাপড় রঙ করার জন্য ডালিমের ছাল ব্যবহার করা হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে বার্ষিক ৬০,০০০ টাকা থেকে ৭০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৪৪. তেজপাতা

সংস্কৃত নাম : তমালপত্র
Botanical Name : *Cinnamomum tamala Nees.*
Common Name : *Nagdani, Tejpata*
English Name : *Bay leaf, Indian Cinnamon*
Family : *Lauraceae*

পরিচিতি : মসলা হিসেবে তেজপাতা অতি পরিচিত। মাঝারি উচ্চতার উগ্র সুগন্ধিযুক্ত গাছ। পাতা ৫ থেকে ৭ ইঞ্চি লম্বা এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও তিনটি শিরাবিশিষ্ট। ডালের দু'দিকে একটির পর একটি পাতা হয়। পাতা প্রথম অবস্থায় কালো, পরিণত হলে সবুজ ও শুকালে খয়েরি রঙ ধারণ করে। বাকল পাতলা, গাঢ় খয়েরি, কোঁকড়ানো ও সুগন্ধযুক্ত।

রাসায়নিক উপাদান : পাতার ইউজেনল, আইসো-ইউজেনল, ফিলাডন ও সিনাম্যালডিহাইড সমৃদ্ধ উদ্বায়ী তেল বিদ্যমান।

প্রাপ্তিস্থান : তেজপাতা বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত ইন্দোচীনে জন্মে। এর আদি জন্মস্থান হিমালয়। আমাদের দেশে সিলেটের বনাঞ্চলে জুলাই-আগস্ট মাসে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো প্রচুর চারা পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন জেলাতে তেজপাতা চাষ হচ্ছে।

চাষাবাদ : মার্চ-এপ্রিল মাসে গাছের তলা পরিষ্কার করে গাছ ঝাঁকি দিয়ে গাছের তলা থেকে ফল সংগ্রহ করতে হয়। গোটা ফলই বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বীজ সংগ্রহের ১-৩ দিনের মধ্যেই তা বপন করতে হয়। বীজ থেকে চারা গজানোর পর এক বছর বয়সের চারা রোপণ করা ভাল। তবে জোড় কলম এবং গুটি কলমের মাধ্যমেও এর বংশবিস্তার হয়। পাহাড়ি এলাকায় ঢালুতে এ গাছ ভালো জন্মে। ৩ বছর বয়সের গাছ থেকে পাতা সংগ্রহ করা যায়। তেজপাতা গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই উঁচু জমিতে এ গাছ রোপণ করা উচিত।

লাগানোর দূরত্ব : ১০ থেকে ১২ ফুট।

উপযোগী মাটি : বেলে দো-আঁশ মাটি তেজপাতা চাষের জন্য উত্তম।

বীজ আহরণ : মার্চ-এপ্রিল মাসে বীজ পাওয়া যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ৩,৫০০-৪,৫০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সাধারণত গাছের পাতা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গাছ থেকে পাতা সংগ্রহের পর রোদের আলোতে ছায়াযুক্ত জায়গায় তা শুকাতে হয়।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা ও গাছের ডাল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : তেজপাতা দেহের প্রধান অঙ্গসমূহের এবং যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে ও পুষ্টিকারক। মনে প্রফুল্লতা আনে এবং রক্তরক্ষক। মস্তিষ্ক, যকৃত, প্লীহা, অন্ত্র ও পাকস্থলির ব্যথা ও অন্যান্য বায়ুজনিত ব্যথায় উপকারী। দাস্তরোধক এবং দুধ, ঘর্ম ও প্রস্রাব প্রবাহক, জরায়ুর বিভিন্ন রোগনাশক। ঋতু প্রবাহক এবং গর্ভফুল নিষ্কাশন। সুরমার সাথে তেজপাতা গুঁড়া জিহ্বার নিচে ব্যবহার করলে তোতলামি দূর হয়। বাত, আমবাত ও মাড়ির ক্ষতে উপকারী। তেজপাতা কাপড়ে রাখলে পোকায় ধরে না।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- তেজপাতা গাছের ছাল ও পাতা বেঁটে রস খেলে অজীর্ণ এবং পেটের সমস্যা দূর হয়। যাদের গুরুপাক খাদ্য হজমে অসুবিধা হয়, তারা তেজপাতার ছালের রস খেলে উপকার পাবেন।
- তেজপাতার রস কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া হৃদরোগের ক্ষেত্রে তেজপাতা ওষুধ হিসাবে ব্যবহার হয়। এর রস হৃদযন্ত্রের পেশিগুলোর কার্যক্ষমতা বাড়ায়।
- হাম, ডায়রিয়া ও দীর্ঘস্থায়ী জ্বর থেকে সেরে উঠলে তেজপাতা সিদ্ধ পানি ব্যবহার করা ভাল।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৩ বছরে গাছ থেকে পাতা সংগ্রহ করা যায়।

অন্যান্য ব্যবহার : পূর্বেই বলা হয়েছে, তেজপাতা রান্নার মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গাছের বাকল থেকে তেল পাওয়া যায় যা সাবান প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বাকল ও পাতা ট্যানিন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আয় : তেজপাতা চাষ বাণিজ্যিকভাবে খুবই লাভজনক। একটি প্রাপ্তবয়স্ক গাছে ১০-১৫ কেজি পাতা পাওয়া যায় যার বাজার মূল্য প্রায় ১০০০ টাকা।

৪৫. তেজবল

Botanical Name : *Zanthoxylum rhetsa (Roxb).*
Common Name : *Tejbol*
English Name : *Tezbol*
Family : *Tutaceae*

পরিচিতি : তেজবল একটি ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। এলাকাভেদে তালমূল/ তেজবিন্দু ইত্যাদি নামে পরিচিত। কখনও কখনও বেশ বড় হয়। গাছে ও ডালে কাঁটার ন্যায় ধারালো আঁশ আছে। নিচটা মোটা ছাল কিন্তু হালকা মোলার ছিপি বা কর্কের মতো। ডগা সরু, পাতা একান্তর, সরু কিনারা করাতের মতো দাঁতযুক্ত। শাখার দু'দিকে কাঁটা থাকে। ফুল হলদে রঙের প্রায় একলিঙ্গী, খুবই ছোট, বহির্বাস ৬-৮টি। এটি পাপড়িবিহীন, পুংকেশরের সংখ্যা ৬-৮টি, বীজকোষ ফিকে লাল। ফুল সুগন্ধযুক্ত। দেখতে অনেকটা ধানের মতো। ফলের ভিতরটা প্রায় ফাঁপা থাকে। কখনওবা কোন ফলের ভিতরে কালো বীজ পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান : দেশের প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়।

চাষাবাদ : অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে বংশবিস্তার হয়।

উপযোগী মাটি : সাধারণত বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে থাকে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বীজ থেকে বংশবিস্তার সম্ভব হলেও অঙ্গজ বা কাটিং থেকে নতুন চারা গজানোই উত্তম।

ব্যবহার্য অংশ : কন্দ ও মূলের ছাল ও ফল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : কন্দ ও মূলের ছাল ও ফল জ্বর, অজীর্ণ, অতিসার, বিসূচিকা প্রভৃতিতে বলকারক ঔষধ হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। মূলের ছালের ক্বাথ বা ফোটানো জল ঘা ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। ফল জীবাণু প্রতিরোধক হওয়ায় ব্রণ বা ঘায়ে এর প্রয়োগ হিতকর। ছাল ও ফল দাঁতের মাজন হিসেবে উপকারী। তাছাড়া এর ফল, শাখা ও কাঁটা দাঁতের ব্যথায় বিশেষ ফলপ্রদ। এর তেল জীবাণু প্রতিরোধক, জীবাণুনাশক ও দুর্গন্ধনাশক।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- সর্দি লাগলে তেজবলের ছাল ৫-৬ গ্রাম থেঁতো করে ১ কাপ গরম পানিতে রাত্রে ভিজিয়ে পরের দিন সকালে সেটা ছেঁকে জলটা সকালের দিকে অর্ধেক ও বিকেলের দিকে অর্ধেক খেতে হবে। এতে সর্দি উপশম হবে।
- কাশিতে তেজবলের ছাল চূর্ণ ৫০০ মিলিগ্রাম একটু মধুসহ মেখে মাঝে মাঝে একটু করে চেটে খেতে হয়। সারা দিন ৫-৭ বার চেটে খেলে কাশি উপশম হবে।
- হাঁপানিতে তেজবল চূর্ণ ১০০ মি.গ্রা. চা/গরম দুধ/জলের সঙ্গে সকালের দিকে একবার খেলে কিছুটা উপশম হবে, তবে প্রয়োজনবোধে বিকেলের দিকেও একবার খাওয়া যায়।

- মুখের ক্ষতে তেজবলের ক্বাথ দিয়ে ২/৩ দিন কুলকুচা করলে এটা উপশম হয় (ছাল নিতে হবে ৫ গ্রাম, জল ২ কাপ, শেষ আধ কাপ ছেঁকে নিয়ে কুলকুচা করতে হবে)।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৩ ৪ মাসে পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আয় : প্রতি একর জমিতে ৬০,০০০ টাকা থেকে ৭৫,০০০ টাকা।

৪৬. তেঁতুল

সংস্কৃত নাম : তিন্দিতিক
Botanical Name : *Tamarindus Indica Linn.*
Common Name : *Tetul.*
English Name : *Tamarind*
Family : *Caesalpiniaceae*

পরিচিতি : তেঁতুল একটি বহুল পরিচিত বিরাট আকৃতির বৃক্ষ। গাছ প্রায় ৭০ থেকে ৮০ ফুট উঁচু হয় এবং বেশ মোটা হয়। পাতা ১ ইঞ্চি লম্বা দণ্ডে বাবলা পাতার মতো ছোট ছোট পাতা হয়, তবে একটু মোটা এবং ক্ষুদ্র ও সরু শাখার উভয় পাশে সারিবদ্ধ সাজান। ফুল গুচ্ছবদ্ধ হয় এবং পাপড়ি নৌকার ন্যায় ফলটিকে ঘিরে থাকে। নিচের পাপড়ি আধা ইঞ্চি লম্বা ও নরম থাকে। বীজ চারকোণা বিশিষ্ট ১০ থেকে ১২টি হয়। বীজের শাঁস থেকে টারটারিক এসিড হয়। ৪০ কেজি ফলে ২৫ কেজি শাঁস হয়। জুলাই-আগস্ট মাসে ফুল এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফল হয়। তেঁতুল পাতা, ছাল, ফল এবং বীজ ব্যবহার হয়।
প্রাপ্তিস্থান : তেঁতুল বাংলাদেশের সর্বত্র জন্মে। এছাড়া ভারত, থাইল্যান্ড ও পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জন্মে।
চাষাবাদ : তেঁতুল একটি কষ্টসহিষ্ণু উদ্ভিদ, যে কোন রকমের সুনিষ্কাশিত মাটিতে এর চাষ করা যায়। সাধারণত বীজ দিয়ে চারা উৎপাদন করা হয়, তবে শাখা কলম এবং কুঁড়ি সংযোজন করেও এর চারা তৈরি করা যায়। ভাল ফলন পেতে তেঁতুল গাছে জৈব সার প্রয়োগ করা উচিত। বীজের গাছের ফল আসতে ৭-৮ বছর সময় লাগে।
লাগানোর দূরত্ব : বাগান আকারে চাষ করতে হলে ৪০ থেকে ৫০ ফুট দূরে দূরে চারা রোপণ করা উচিত।
উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে তেঁতুল জন্মে থাকে।
বীজ আহরণ : ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফল পাকলে ফলের উপরের শক্ত খোসা ফেলে পানিতে ভিজিয়ে অথবা খাদ্য অংশ তুলে নিয়ে পরবর্তীতে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।
প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রতি কেজিতে ৫০০-৮০০টি বীজ হয়।
বীজ সংগ্রহের সময় : ডিসেম্বর-জানুয়ারি।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফল পাকে। গাঢ় খয়েরি রঙের মোটা খোসাযুক্ত ফল সংগ্রহ করার পরপরই বীজতলায় বপন করতে হয়। সংরক্ষণের প্রয়োজন পড়ে না।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা, ফল, বাকল ও ছাল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : তেঁতুল হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলির শক্তিবর্ধক এবং হৃদকম্প রোগে উপকারী। রক্তের কলস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করে। রক্তের প্রকোপতা দমন করে অর্থাৎ মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন করে বমিভাব, পিত্তজনিত জ্বর, পিপাসা, দাহ, মূর্ছা ও বিভিন্ন প্রকার চুলকানিতে উপকারী। বিষাক্ত ও ম্যালেরিয়ার দূষিত বায়ু বিশুদ্ধ করে। তেঁতুলের পানি দ্বারা গড়গড়া মুখের ঘায়ে উপকারী। বীজ যৌনশক্তি বৃদ্ধিতে বিশেষ কার্যকরী। গাছের ছালের চূর্ণ ক্ষত শুষ্ককারক, শ্লিষ্ককারক এবং অর্শরোগের রক্ত বন্ধকারক। পুরাতন তেঁতুল প্রস্রাবের ফসফেট দূর করে। তেঁতুল গাছের ছাল জ্বরনাশক। তেঁতুল ছালের ক্ষার মূত্রের কটুত্ব এবং গনোরিয়া রোগে উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- কচি তেঁতুল পাতার ক্বাথ গড়গড়া করায় মুখের ঘা, জিহ্বার ঘা, ডিপথেরিয়া ও কণ্ঠরোগে উপকারী।
- তেঁতুল পাতার ক্বাথ সেবনে আমাশয়, অর্শ, পিত্তজ্বর ও প্রমেহ রোগে উপকারী।
- বিষাক্ত ক্ষতে তেঁতুল পাতা গোলমরিচের সঙ্গে প্রলেপ দিলে উপকারী।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : তেঁতুল গাছ পরিপূর্ণভাবে পরিপক্ব হতে ১০ বছরের এ মতো সময় প্রয়োজন।

অন্যান্য ব্যবহার : কৃষি কাজের যন্ত্রপাতি, নৌকা ইত্যাদি তৈরিতে তেঁতুল কাঠ ব্যবহৃত হয়। তেঁতুল কাঠ জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তেঁতুল বীজ বার্নিশ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। জুটমিলের মেশিনে তেঁতুল বীজ ব্যবহার হয়।

আয় : একটি পরিপক্ব তেঁতুল গাছে প্রায় ২০০ কেজি তেঁতুল হয় যার বাজার মূল্য ৮,০০০ টাকা। এককালীন একটি তেঁতুল গাছ বিক্রি করে ১৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়।

৪৭. তেলাকুচা

সংস্কৃত নাম : বিম্বী, তুম্বী
Botanical Name : *Coccinia cordifolia (L) J. O. Voigt.*
Common Name : *Telakucha*
English Name : *Ivy Gourd*
Family : *Cucurbitaceae*

পরিচিতি : অযত্নসম্ভূত লতাগাছ, বাগানের বেড়ায় অথবা কোন গাছকে আশ্রয় করে প্রকৃতিগতভাবে জন্মে থাকে। পাতার আকার পাঁচকোণা, ব্যাস ৪/৫ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে দেখা যায় এবং তার কিনারা করাতের ছোট দাঁতের মতো কাটা; প্রায় বারো মাসই এই লতাগাছে ফুল হয়, তবে শীতকালে বিশেষ হতে দেখা যায় না, ফল লম্বায় ১.৫/২ ইঞ্চি হয়, উপরটা মসৃণ, কাঁচা সবুজ রঙ, গায়ে সাদা ডোরা দাগ, পাকলে লাল হয়। স্বাদে তিতা। কন্দ ও বীজের সাহায্যে বংশবিস্তার করে।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলের জেলাগুলোতে প্রচুর তেলাকুচা দেখা যায়। সাধারণত জংলা জায়গায় অযত্নে-অবহেলায় এরা বেড়ে ওঠে।

চাষাবাদ : শিকড়সহ লতা এনে রোপণ করলে অতি সহজেই তেলাকুচা গাছ জন্মে। এর বীজ থেকেও চারা তৈরি করা যায়।

লাগানোর দূরত্ব : দু 'থেকে আড়াই ফুট দূরত্বে বাণিজ্যিক চাষাবাদ করা যায়।

উপযোগী মাটি : বেলে বা দোআঁশ মাটিতে ভালো হয়।

বীজ আহরণ : শীতকাল ব্যতীত বছরের প্রায় সকল ঋতুতে ফুল ও ফল হয়। ফলের ভিতর অনেক বীজ রয়েছে। ফল পেকে লাল হলে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ১০ হাজার।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সাধারণত কাঁচা অবস্থায় তেলাকুচার ফল, পাতা, লতা ও মূল ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার্য অংশ : ফল, পাতা, লতা ও মূল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : আমাশয়ে ও রক্ত আমাশয়ে, খোস-পাঁচড়া, ছুলি ইত্যাদি চর্মরোগে, জিহ্বা ক্ষতে, সর্দি, মাথাব্যথা ও ডায়াবেটিস রোগে উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- আমাশয়ে : এক চা চামচ তেলাকুচা পাতার রস চিনি মিশিয়ে খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।
- খোস-পাঁচড়া, ছুলি ইত্যাদি চর্মরোগে তেলাকুচা পাতার রস খেলে ও সমস্যার জায়গায় মাখলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।
- রক্ত আমাশয়ে : এক চা চামচ পরিমাণ তেলাকুচার পাতার রস লোহার পাত্রে গরম করে এবং আধা চামচ আখের গুড় মিশিয়ে খেলে রক্ত আমাশয় ভাল হয়।
- অত্যধিক গরমের ফলে মাথা ঘোরালে তেলাকুচা পাতার রস কপালে ও মাথায় মাখলে উপকার পাওয়া যায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৬ থেকে ৮ মাসে তেলাকুচা গাছ পূর্ণতা পায়।

অন্যান্য ব্যবহার : কোন কোন এলাকায় তেলাকুচার ডাঁটা ও পাতা শাক হিসেবে রান্না করে খাওয়া হয়। এছাড়াও তেলাকুচা পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

চাহিদা : ঔষধি শিল্পে এর বর্তমান চাহিদা বার্ষিক ১০০,০০০ কেজি।

আয় : প্রতি একর জমিতে বার্ষিক ৩৫,০০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৪৮. তোকমা

Botanical Name : *Hyptis suaveolens (L.) Poit.*
Common Name : *Tokma*
English Name : *Salvia Seeds*
Family : *Labiatae*

পরিচিতি : তোকমা তুলসী জাতীয় একপ্রকার বর্ষজীবী উদ্ভিদ। কাণ্ড হতে বহু শাখা-প্রশাখা বের হয়। পাতার বৃন্ত দেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতির। পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে গুচ্ছবদ্ধ বহু ফুল হয়। ছোট ছোট ফল সরু, লম্বা ও মসৃণ। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ফুল ও ফল হয়। এই বর্ষজীবী সরল উদ্ভিদটি ভারত ও পাকিস্তানে প্রচুর চাষ হয়। বাংলাদেশেও জন্মাতে দেখা

যায়। কাণ্ড থেকে বহু শাখা-প্রশাখা বের হয়। পাতা ১.৫-২.৫ সে.মি. লম্বা ও বৃত্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। ফুলের বোঁটা ক্ষুদ্র। ফল সরু, লম্বা ও মসৃণ। ইরান, পাকিস্তান ও ভারত এর আদি বাসস্থান।

প্রাপ্তিস্থান : তোকমা উপমহাদেশের পশ্চিমভাগে অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তানে প্রচুর জন্মে ও চাষ হয়।

চাষাবাদ : এপ্রিল মাসে পর্যন্ত জমিতে বীজ ছড়ানো হয়।

লাগানোর দূরত্ব : দেড় থেকে দু'ফুট জমিতে ছিটিয়েও চাষ করা যায়।

মাটির গুণাগুণ : বেলে মাটিতে ভালো হয়।

বীজ আহরণ : ডিসেম্বর মাসে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : লক্ষাধিক।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : এপ্রিল মাসে গাছ থেকে ফল পৃথক করে শুকিয়ে নিয়ে বস্তায় ভরে সংরক্ষণ করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ : বীজ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : তোকমা শীতলকারক ও প্রশান্তিদায়ক এবং প্রস্রাবের জ্বালা-পোড়া কমায় ও প্রস্রাবের প্রতিবন্ধকতা অপসারক। বুক ধড়ফড় ও হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতানাশক। পিপাসা নিবারক এবং পেটের ব্যথা ও বায়ুনাশক। তোকমা বীজ ভাজা চূর্ণ বীর্যস্তম্ভক ও উষ্ণজনিত শুক্রক্ষরণে উপকারী।

অন্যান্য ব্যবহার :

- তোকমা পানিতে ভিজিয়ে পট্টি দিলে ফোড়া বসে যায় ও ফেটে যায়।
- বীজ শান্তিকর, প্রস্রাবের জ্বালা, আটকে প্রস্রাব হওয়া রোগে তোকমা ভেজা পানি ব্যবহারে বেশ উপকার হয়।
- তোমকার বীজ পানিতে ভিজিয়ে খেলে পেটের বায়ু অনেকাংশে কমে যায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৯-১০ মাস।

অন্যান্য ব্যবহার : পশুখাদ্য হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে। পানির সাথে মিশালে হরহরে ও আঠার মতো হয় বলে এটি অনেক ধরনের পানীয় দ্রব্যে ও ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে ৪০,০০০ টাকা থেকে ৬০,০০০ টাকা।

৪৯. তুলসী

সংস্কৃত নাম : তুলসী
Botanical Name : *Ocimum basilicum Linn.*
Common Name : *Tulshi, Babuo Tulshi*
English Name : *Common Basil*
Family : *Labiatae*

পরিচিতি : তুলসী একটি চিরহরিৎ ঝোপ জাতীয় উদ্ভিদ। গণ শাখা-প্রশাখাসহ এই গাছ ২/৩ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতার কিনারা অনিয়মিত খাঁজকাটা ও ঢেউ খেলানো। শাখা-প্রশাখার অগ্রভাগ হতে পাঁচটি পুষ্পদণ্ড বের হয়। প্রতিটি পুষ্পদণ্ডের চারিদিকে ছাতার ন্যায় আকৃতি অনুসারে ১০-২০টি স্তরে ফুল থাকে। প্রতিটি স্তরে ৬টি করে ছোট ছোট ফুল

ফোটে। পুরাতন গাছের কাণ্ড কাঠের মতো শক্ত হয়। আমাদের দেশে রাম তুলসী, কৃষ্ণ তুলসী ও বাবুই তুলসী নামে বিভিন্ন প্রকার তুলসী দেখা যায়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশ ও ভারতের প্রায় সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে তুলসী দেখা যায়। বিশেষ করে প্রতি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাড়িতে এটি পাওয়া যায়। ধর্মীয় কারণে তারা গাছটি পবিত্র মনে করে।

চাষাবাদ : খোলামেলা জায়গায় তুলসী গাছ বেশি দেখা যায়। যেমন : ঘরের আঙ্গিনা, রাস্তার আশপাশে, সমতল ভূমির আর্দ্র ও গরম এবং নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায়। অনেক বাড়িতে ঔষধি গাছ হিসেবে লাগানো হয় এবং রাস্তার ধারে পতিত জমিতে এমনিতে জন্মায়। বীজ থেকে চারা উত্তোলন করে এর চাষ করা যায়। পাকা বীজ সংগ্রহের পর পরই বীজতলাতে লাগালে চারা গজায়। চারা গাছ বড় হয়ে উঠলে নির্দিষ্ট জায়গায় লাগাতে হয়। সাধারণত ৩-৪ ফুট অন্তর চারা লাগাতে হবে। আংশিক ছায়াতে এ গাছ জন্মে। প্লাবন মুক্ত জমিতে সহজে চাষ করা যাবে। তুলসীর বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা শতকরা ৫০-৬০ ভাগ।

লাগানোর দূরত্ব : ৩ থেকে ৪ ফুট। ক্ষেতে ধান-পাটের মতো বীজ ছিটিয়েও চাষ করা যায়।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটি তুলসী চাষের জন্য উপযোগী, তবে বেলে- দোআঁশ মাটিতে অধিক পরিমাণে তুলসী গাছ জন্মে। ভাছাড়া তুলসী টবেও লাগানো যায়।

বীজ আহরণ : মার্চ মাসে ফল পাকলে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৩ লক্ষ।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : তুলসী পাতা কাঁচা ব্যবহার করাই ভালো। তুলসী গাছ পাতাসহ উঠিয়ে ভালভাবে ধুয়ে ছোট ছোট করে কেটে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর তা শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। এভাবে এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : বীজ, পাতা, শিকড় ও রস।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : বিশেষ করে সর্দি কাশিতে তুলসীর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। চর্মরোগ, শিশুর পেট ব্যথা, কাশ ও শ্বাসকষ্টে উপকারী। তুলসির পাতার রস পানিসহ চিনি মিশিয়ে খেলে প্রস্রাবজনিত সমস্যায় খুব উপকার হয়।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- প্রতিদিন এক চামচ পরিমাণ তুলসী পাতার রস সকালে খেলে ম্যালেরিয়া আক্রমণে বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারে না।
- হাম বা বসন্তের গুটি দ্রুত বের না হলে তুলসী পাতা ও আদার রস একটি ঝিনুকে একসংগে মিশিয়ে রোগীকে খাওয়ালে বসন্তের গুটি দ্রুত বের হয়ে পড়ে।
- শিশুদের সর্দিকাশি হলে এক-দুই চামচ তুলসী পাতার রস দশ ফোঁটা মধু মিশিয়ে খাওয়ালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।
- কান কটকট করলে তুলসীর পাতার ড্রপারের সাহায্যে কানে ফোঁটা ফোঁটা দিলে যন্ত্রণা ভাল হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৬ থেকে ৮ মাসেই তুলসী গাছ পরিপক্ব হয়ে থাকে।

অন্যান্য ব্যবহার : তুলসীর পরিপক্ব শক্ত কাঠ দিয়ে মালা তৈরি হয়ে থাকে।
আয় : দেশে ও বিদেশে তুলসীর চাহিদা রয়েছে। তাই এটি চাষ করা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হবে। এক একর জমিতে ভালভাবে চাষ করলে ৫০,০০০-৭০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৫০. থানকুনি

সংস্কৃত নাম : ত্বাষ্টী, মন্ডুকপর্নী
Botanical Name : *Centella asiatica (L.) Urban.*
Common Name : *Thankuni*
English Name : *Indian Pennywort*
Family : *Umbelliferae*

পরিচিতি : থানকুনি একটি ছোট লতানো বীরুৎ প্রকৃতির উদ্ভিদ যা সাধারণত স্যাঁতসেঁতে ও আংশিক ছায়াময় পরিবেশে ভাল জন্মায়। পাতা বৃত্তাকার এবং কিনারা খাঁজ কাটা। ফুল ক্ষুদ্র এবং ঈষৎ লাল আভাযুক্ত।
রাসায়নিক উপাদান : এতে ট্রাইটার্পিন, গ্লাইকোসাইড, বিভিন্ন জৈব এসিড, উদ্বায়ী তেল ও স্টেরল বিদ্যমান।
প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খালের ধারে, পুকুরের কিনারায়, ক্ষেতের আইলের গায়ে এবং আর্দ্র বা স্যাঁতসেঁতে মাটিতে থানকুনি জন্মে।
চাষাবাদ : বীজের মাধ্যমে ও অঙ্গজ জনন উভয়ভাবেই থানকুনির বংশবিস্তার হয়। প্রতিটি গিঁট থেকে শিকড় বের হয় এবং শিকড়সহ লতা এনে আর্দ্র জমিতে রোপণ করলেই থানকুনি জন্মে। বর্ষা ঋতু এটির বংশবিস্তারের জন্য উপযুক্ত সময়। মার্চ-এপ্রিল ফুল ধরে এবং জুন-জুলাই মাসে ফল পাকে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, এটি আর্দ্র মাটি পছন্দ করলেও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে থানকুনি কমবেশি সর্বত্র পাওয়া যায়।
লাগানোর দূরত্ব : ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি দূরত্বে লাগানো ভালো।
উপযোগী মাটি : আর্দ্র বা স্যাঁতসেঁতে মাটিতে এ গাছ ভালো জন্মে।
বীজ আহরণ : জুন-জুলাই মাসে ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।
প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় এক লক্ষ।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সাধারণত কাঁচা থানকুনি পাতা ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে বর্তমান উন্নত বিশ্বে থানকুনি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্যাপসুল, ট্যাবলেট আকারেও ব্যবহার হচ্ছে।
ব্যবহার্য অংশ : পাতা/পুরো গাছ।
উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : পেটের সমস্যায় বিশেষ করে পেটের ব্যথা, পাকস্থলির রোগ, আমাশয় এবং রক্ত আমাশয়ে থানকুনি পাতা বা পাতার রস বিশেষ কার্যকরী। থানকুনি রক্ত পরিষ্কারক, সিফিলিস, কুষ্ঠ ও মুখের ঘায়ে উপকারী। শরীর মোটাকারক ও

অন্যান্য ব্যবহার : তুলসীর পরিপক্ব শক্ত কাঠ দিয়ে মালা তৈরি হয়ে থাকে।
আয় : দেশে ও বিদেশে তুলসীর চাহিদা রয়েছে। তাই এটি চাষ করা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হবে। এক একর জমিতে ভালভাবে চাষ করলে ৫০,০০০-৭০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৫০. থানকুনি

সংস্কৃত নাম : ত্বাষ্টী, মন্ডুকপর্নী
Botanical Name : *Centella asiatica (L.) Urban.*
Common Name : *Thankuni*
English Name : *Indian Pennywort*
Family : *Umbelliferae*

পরিচিতি : থানকুনি একটি ছোট লতানো বীরুৎ প্রকৃতির উদ্ভিদ যা সাধারণত স্যাঁতসেঁতে ও আংশিক ছায়াময় পরিবেশে ভাল জন্মায়। পাতা বৃত্তাকার এবং কিনারা খাঁজ কাটা। ফুল ক্ষুদ্র এবং ঈষৎ লাল আভাযুক্ত।

রাসায়নিক উপাদান : এতে ট্রাইটার্পিন, গ্লাইকোসাইড, বিভিন্ন জৈব এসিড, উদ্বায়ী তেল ও স্টেরল বিদ্যমান।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খালের ধারে, পুকুরের কিনারায়, ক্ষেতের আইলের গায়ে এবং আর্দ্র বা স্যাঁতসেঁতে মাটিতে থানকুনি জন্মে।

চাষাবাদ : বীজের মাধ্যমে ও অঙ্গজ জনন উভয়ভাবেই থানকুনির বংশবিস্তার হয়। প্রতিটি গিঁট থেকে শিকড় বের হয় এবং শিকড়সহ লতা এনে আর্দ্র জমিতে রোপণ করলেই থানকুনি জন্মে। বর্ষা ঋতু এটির বংশবিস্তারের জন্য উপযুক্ত সময়। মার্চ-এপ্রিল ফুল ধরে এবং জুন-জুলাই মাসে ফল পাকে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, এটি আর্দ্র মাটি পছন্দ করলেও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে থানকুনি কমবেশি সর্বত্র পাওয়া যায়।

লাগানোর দূরত্ব : ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি দূরত্বে লাগানো ভালো।

উপযোগী মাটি : আর্দ্র বা স্যাঁতসেঁতে মাটিতে এ গাছ ভালো জন্মে।

বীজ আহরণ : জুন-জুলাই মাসে ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় এক লক্ষ।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সাধারণত কাঁচা থানকুনি পাতা ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে বর্তমান উন্নত বিশ্বে থানকুনি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্যাপসুল, ট্যাবলেট আকারেও ব্যবহার হচ্ছে।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা/পুরো গাছ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : পেটের সমস্যায় বিশেষ করে পেটের ব্যথা, পাকস্থলির রোগ, আমাশয় এবং রক্ত আমাশয়ে থানকুনি পাতা বা পাতার রস বিশেষ কার্যকরী। থানকুনি রক্ত পরিষ্কারক, সিফিলিস, কুষ্ঠ ও মুখের ঘায়ে উপকারী। শরীর মোটাকারক ও

বলবর্ধক। মাথাব্যথা ও চুল পড়া বন্ধ করে। বাত, ফোড়া ও গলগণ্ড রোগনাশক এবং স্মরণশক্তি বাড়ায়।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- রক্তদোষে থানকুনি পাতা পানিসহ সিদ্ধ করে ক্বাথ বের করতে হবে। এরপর এ ক্বাথ (৫ তোলা পরিমাণ) মধু অথবা চিনিসহ খেলে প্রভূত উপকার পাওয়া যায় ও রক্তদোষ ভাল হয়।
- আমাশয়ে প্রতিদিন ২ তোলা পরিমাণ রস খেলে দু'সপ্তাহের মধ্যে আমাশয় ভাল হয়।
- জ্বর হলে থানকুনি পাতার রস এক তোলা ও শিউলি পাতার রস এক তোলা একত্রে মিশিয়ে সকালে খেলে কয়েক দিনের মধ্যে রোগী ভাল হয়ে যায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৪-৫ মাসেই পাতা উত্তোলন করা যায়।

অন্যান্য ব্যবহার : দেহের ক্লান্তি দূরীকরণ ও লাবণ্য রক্ষায় বিশেষ উপকারী।

আয় : প্রতি একর জমিতে ৪০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা।

৫১. দারুচিনি

সংস্কৃত নাম : গন্ধকক্ক
Botanical Name : *Cinnamomum verum Presl.*
Common Name : *Darchini*
English Name : *Cinnamon*
Family : *Lauraceae*

পরিচিতি : দারুচিনি ঝোপঝাড় বিশিষ্ট মাঝারি ধরনের গাছ। অনেকটা গোলাপ জামের গাছের মতো। গাছের ছাল ধূসর বর্ণের এবং কাঠ ফিকে লাল বর্ণের এবং বেশি শক্ত নয়। পাতা প্রায় তেজপাতার মতো যা ডালের বিপরীত দিকে হয়। দারুচিনি পূর্বে জাভা, সুমাত্রা, চীন প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আসত বলেই এর নাম দেয়া হয়েছে দারুচিনি। সম্ভবত শ্রীলঙ্কা এর আদি আবাসভূমি। পাতা চর্মবৎ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, উপরিভাগ উজ্জ্বল এবং ৩ থেকে ৫টি শিরাবিশিষ্ট। কচি পাতা গোলাপি-লাল রঙ বিশিষ্ট। মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল ও ফল হয়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে এ গাছ দেখতে পাওয়া যায়। তবে ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিক চাষ হয় না।

চাষাবাদ : মার্চ-এপ্রিল মাসে গাছের তলা পরিষ্কার করে গাছ ঝাঁকি দিয়ে গাছের তলা থেকে ফল সংগ্রহ করতে হয়। গোটা বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বীজ সংগ্রহের ২-৩ দিনের মধ্যে তা বপন করতে হয়। বীজ থেকে চারা গজানোর পর এক বছর বয়সের চারা রোপণ করা ভাল। তবে জোড় কলম এবং গুটি কলমের মাধ্যমেও এর বংশবিস্তার হয়। পাহাড়ি এলাকায় ঢালুতে এ গাছ ভালো জন্মে। ৩ বছর বয়সের গাছ থেকে পাতা সংগ্রহ করা যায়। দারুচিনি গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না তাই উঁচু জমিতে এ গাছ রোপণ করা হয়।

লাগানোর দূরত্ব : ১০-১৫ ফুট।

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ। তবে পাহাড়ি লাল এবং কালচে মাটিতেও ভাল হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৩-৪ বছর।

বীজ আহরণ : মার্চ-এপ্রিল মাসে বীজ সংগ্রহ করা যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ৬০,০০০ থেকে ৭০,০০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : ছাল-বাকল সংগ্রহ করে ভালভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে চটের বস্তায় সংরক্ষণ করা বাঞ্ছনীয়। আর্দ্র স্থানে রাখলে এতে ফাঙ্গাস ধরে যেতে পারে। এ ছাল খেজুর পাতার মাদুরে প্যাকিং উত্তম।

ব্যবহার্য অংশ : গাছের বাকল/ছাল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : দারুচিনি পাকস্থলির শক্তিবর্ধক, ক্ষুধাবর্ধক, বায়ু নিঃসারক ও কাঠিন্যতা সৃষ্টিকারক, উত্তেজক, বলকারক, মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের শক্তিবর্ধক। মসলা হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। দারুচিনি ভিজানো নির্যাস প্রতিদিন সকালে খেলে দেহের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। দাঁতের যন্ত্রণায় এর চূর্ণ বেশ উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- কণ্ঠস্বরের বিকৃতিতে ১ গ্রাম দারুচিনি চূর্ণ আধকাপ গরম পানিতে রাত্রে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সেটাকে ছেঁকে নিয়ে সেই পানিটা খেতে হবে। এটা কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিক করে দেয়।
- গলার ক্ষত ১ গ্রাম দারুচিনি চূর্ণ এককাপ গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখে, পরের দিন সেটাকে ছেঁকে সকালে ও বিকালে দু'বেলায় অল্প অল্প করে খেতে হবে। এর দ্বারা সাধারণ গলক্ষতের উপশম হয়।
- মাথার যন্ত্রণায় দারুচিনি চূর্ণ সিকি গ্রাম মাত্রায় সকালে ও বিকালের দিকে দু'বার পানিসহ খেতে হবে আর তাকে খুব মিহি চূর্ণ করে ২/১ বার নস্যি নিতে হবে। এর দ্বারা নাসা স্রোতও পরিষ্কার হবে এবং মাথার যন্ত্রণাটাও উপশম হবে।

অন্যান্য ব্যবহার : মশলা হিসেবে খাবারের সংগে ব্যবহার করা হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে ৬০,০০০ টাকা থেকে ৭০,০০০ টাকা পর্যন্ত।

৫২. ধনিয়া

সংস্কৃত নাম : ধন্যাক, ধান্য
Botanical Name : *Coriandrum sativum L.*
Common Name : *Dhaniya*
English Name : *Coriander*
Family : *Umbelliferae*

পরিচিতি : ধনিয়া বহুশাখা বিশিষ্ট বর্ষজীবী বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। প্রায় ২ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। নিচের পাতা ডিম্বাকৃতি ও লম্বা এবং উপরের পাতা সরু ও লম্বা। ফুল আসমানি ও উজ্জ্বল সাদা বা বেগুনি বর্ণের। ফল গোলাকার এবং ভাঙ্গলে দু'ভাগ হয়ে যায়। শীতে ফুল ও শীতের শেষে ফল হয়। আহার্য এবং ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয় পাতা এবং বীজ।

প্রাপ্তিস্থান : ধনিয়া বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র চাষ হয়। এছাড়া উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধনিয়া জন্মে। বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় সারা বছর ধনিয়া চাষ হয়।

চাষাবাদ : ধনিয়া ১.৫/২ ফুটের বেশি উঁচু হয় না। ভাদ্র মাসে মাঠে ধনিয়া ছড়িয়ে দেওয়া হয়, চারাগাছের ধার কাটা অসমান কোণ তবে অনেকটা গোলাকার। গাছ যত লম্বা হয় তার পাতার আকার পরিবর্তিত হয়ে লম্বা হয়। সোজা একটি দণ্ডের চারিদিকে শাখা-প্রশাখা বেরোয়, জানুয়ারি মাসে সাদা ছোট ছোট ছত্রাকার ফুল হয়, তবে পুষ্পদণ্ডে কদাচিত ২/১টা খুব ছোট পাতা দেখা যায়।

লাগানোর দূরত্ব : প্রায় এক ফুট দূরত্বে লাগানো হয়। তবে অন্যান্য শস্যের মতো ক্ষেতে ছিটিয়ে বপন করা যায়।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে ধনিয়া জন্মে।

বীজ আহরণ : ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ধনিয়ার ফল পাকে।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ১৫ হাজার।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : ধনিয়ার পাতা কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ক্ষেত থেকে ফলসহ ধনিয়া গাছ কেটে এনে মাড়াইয়ের মাধ্যমে ধনিয়া আলাদা করে রোদে শুকিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা গাছ, ডাঁটা, ফল, পাতা এবং বীজ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : দেহে জ্বালা, পাতলা পায়খানা, শিশুদের কাশি ও শ্বাসকষ্টে, বাতরক্তে, নবজ্বরের পিপাসায় এবং পেটে বায়ুর জন্য বিশেষভাবে উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

শরীরের ভিতরে বা বাইরে জ্বালা বোধ করলে, ধনিয়া ৫/৬ গ্রাম এক কাপ গরম পানিতে রাত্রে ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে সকালে খালি পেটে খেতে হবে। এর দ্বারা দাহ প্রশমিত হবে। এভাবে মাঝে মাঝে খেয়ে যেতে হবে।

- পাতলা পায়খানা হলে ২৫ গ্রাম ধনিয়া বেঁটে নিয়ে ২৫ গ্রাম গাওয়া ঘি, প্রায় আধাপোয়া পানি একসঙ্গে একটি পাত্রে পাক করে, পানিটা কমে এলে তা নামিয়ে ছেঁকে সকালে ও বিকালে দু'বারে পান করলে এর দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।
- যদি কাশতে কাশতে শিশুর চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে গেল, এ রকম অবস্থায় ২ চা চামচ আতপ চাল ১০/১২ চা চামচ পানিতে ভিজিয়ে সেই পানিতে আধা চা চামচ ধনিয়া বেঁটে সেটাকে ছেঁকে নিয়ে পানি আধা চা চামচ করে ৩/৪ ঘণ্টা পরপর সমস্ত দিন ধরে খাওয়ালে ঐ কাশি বন্ধ হয়ে যাবে।
- বাতরক্তের ক্ষেত্রে ধনিয়া ও সাদা জিরা সমান পরিমাণে নিয়ে পানিসহ বেটে এর দ্বিগুণ পরিমাণ গুড়ের সঙ্গে জ্বাল করে প্রতিদিন ১০/১২ গ্রাম করে পানিসহ খেতে হবে। এতে উপকার পাওয়া যাবে, তবে দীর্ঘদিন এর চিকিৎসা করা প্রয়োজন হবে।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ২-৩ মাসে ধনিয়া পাতা ব্যবহার উপযোগী হয়। ৫/৬ মাসে ফল সংগ্রহ করা যায়।

অন্যান্য ব্যবহার : বিভিন্ন দেশে সমলা হিসেবে ধনিয়ার ব্যবহার রয়েছে। ধনিয়া পাতা তরকারিতে সুগন্ধী ও সুস্বাদু করার জন্য ব্যবহার করতে দেখা যায়।

আয় : প্রতি একর জমিতে ৫০,০০০ টাকা থেকে ৮০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

৫৩. ধাইফুল

সংস্কৃত নাম : ধাতকী
Botanical Name : *Woodfordia fruticosa (L) Kurz.*
Common Name : *Dhaiphul*
English Name : *Fire flame Bush*
Family : *Lythraceae*

পরিচিতি : ধাইফুল একটি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ এবং শাখা বিস্তৃত। ছাল মসৃণ ও বাদামি রঙের, পাতা ৫-৬ সে.মি. লম্বা, বর্শাফলাকৃতি, পাতার বোঁটা নেই বললেই চলে। গোড়ার দিকটা কিছুটা গোলাকার। পাতার উপর-নিচ দু'দিকই সূক্ষ্ম কোমল লোমাবৃত। একটি পুষ্পদণ্ডে ছোট বোঁটায় উজ্জ্বল লাল বর্ণের গুচ্ছবদ্ধ ফুল হয়। ফলে সরিষার আকারের ধূসর বর্ণের অনেক বীজ থাকে। জানুয়ারিতে ফুল হয় ও জুলাই মাসে ফল পাকে।

প্রাপ্তিস্থান : দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে কদাচিৎ ধাইফুল দেখতে পাওয়া যায় তবে ভারত এর আদি নিবাস এবং সেখানে প্রচুর পরিমাণ জন্মে।

চাষাবাদ : জুলাই মাসে ফল পাকলে বীজ ছড়িয়ে গাছ জন্মানো যায়।

লাগানোর দূরত্ব : ৫-৭ ফুট পর পর গাছ লাগাতে হয়।

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ মাটি।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ১০০-১৫০০টি।

বীজ আহরণ ও সংগ্রহের সময় : জুলাই মাসে ফল পাকে তখনই বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : গাছ থেকে ফল পৃথক করে শুকিয়ে নিয়ে চটের বস্তায় ভরে সংরক্ষণ করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ : ফুল, পাতা ও ডাল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : ধাইফুল রক্তদুষ্টি ও পিত্তজনিত রোগে উপকারী ও শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর ও শুক্রতারল্য নাশক। আমাশয়, রক্ত আমাশয় ও অতিসার নাশক এবং যকৃতদোষে উপকারী। বিষনাশক ও মাদকতা আনয়নকারক এবং ব্রণ দোষনাশক। ধাইফুল চূর্ণ ক্ষতস্থানে ছিটিয়ে দিলে ক্ষতস্রাব কমিয়ে দ্রুত ক্ষত পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- ধাইফুল চূর্ণ ক্ষতস্থানে ছিটিয়ে দিলে ক্ষত কমিয়ে দ্রুত ক্ষত পরিপূর্ণ হয়ে সেরে ওঠে।
- ধাইফুল রক্তদুষ্টি ও পিত্তজনিত রোগে উপকারী।
- আমাশয়, রক্ত আমাশয় ও অতিসার নাশক এবং যকৃতদোষে উপকারী।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৪-৫ মাসে পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : ধাইফুল গাছের ফুল, পাতা ও ডাল থেকে রঙ তৈরি করা যায়। এ গাছ থেকে একরকম আঠা পাওয়া যায় এবং কাপড়ের যে অংশে ছাপার সময় রঙ না লাগানোর প্রয়োজন হয় সেখানে এই আঠা লাগানো হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে বার্ষিক ৬০,০০০ থেকে ৮০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৫৪. ধুতুরা

সংস্কৃত নাম : কণ্টফল, ঘণ্টাপুষ্প
Botanical Name : *Datura metal Linn.*
Common Name : *Dhatura*
English Name : *Thorn Apple*
Family : *Solanaceae*

পরিচিতি : ধুতুরা সর্বজন পরিচিত গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। ২ থেকে ৪ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। কোন কোন সময় ৪/৫ বছর বেঁচে থাকে। বর্ষাকালে ঘণ্টার আকারে সাদা ফুল হয়। লাড্ডুর মতো গোলাকার ফলের চারিদিকে ছোট ছোট কাঁটা থাকে। ফল পাকলে ফেটে যায়। কালো ও কিছুটা হলুদ রঙের ধুতুরাও কোথাও কোথাও দেখা যায়।

প্রাপ্তিস্থান : ধুতুরা বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্র পতিত ও জঙ্গলপূর্ণ বাগানে এবং রাস্তার ধারে জন্মে।

চাষাবাদ : ধুতুরা বাংলাদেশের সব জায়গায় আগাছা হিসেবে জন্মে। বীজ থেকে চারা করা যায়। সাধারণত জুন মাসে বীজ সংগ্রহের পর বীজতলায় লাগাতে হয়। বীজ লাগানোর ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে অংকুরিত হওয়া শুরু করে। চারা ওঠার ২০ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে মাটি ও গোবর ভর্তি (৩ ঃ ১) চটের ব্যাগে রাখতে হয়। এ ছাড়া বীজ সরাসরিও ব্যাগে লাগানো যায়। ২-৩ মাস বয়সের চারা মাঠে লাগাতে হয়। সাধারণত সমতল ভূমি, অপেক্ষাকৃত ভিজা ও উন্মুক্ত জায়গা চাষের জন্য উত্তম। তবে ছায়ায় ও জন্মাতে পারে। সুতরাং বড় গাছের নিচে ছায়াযুক্ত স্থানেও লাগানো যায়।

লাগানোর দূরত্ব : ৩ থেকে ৫ ফুট।

উপযোগী মাটি : সমতল ভূমি, অপেক্ষাকৃত ভিজা মাটি।

বীজ আহরণ : গোলাকার ও সবুজ বর্ণের ফল পাকলে ধূসর বর্ণের হয় এবং ফেটে যায়। তখন বীজ সংগ্রহ করতে হয়। ফলের মধ্যে গুচ্ছাকারে বহু বাদামি বীজ হয়। পরিপক্ব বীজ ছাই রঙের হয়। জুন মাসে বীজ আহরণ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রতি কেজিতে ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : ফল পাকলে ফেটে যায়। তখনি ঐ বীজ সংগ্রহ করতে হয়। এ সময় বীজগুলো ছাই রঙের হয়। বীজ থেকে ধুতুরার চারা উত্তোলন করা যায়। তবে সাধারণত গাছের শিকড় বা মূল থেকেই এর বংশবিস্তার ঘটে।

ব্যবহার্য অংশ : সমস্ত অংশই ব্যবহার হয়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : ধুতুরা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনুভূতি হ্রাস করে, বিশেষ করে মস্তিষ্কের অনুভূতি। ধুতুরা ঘুম আনে এবং রক্তচাপজনিত মাথাব্যথা ও ফোলা কমায়। হজমকারক ও বমনকারক এবং পেটের কৃমিনাশক। পাগলা কুকুরের কামড়ে ধুতুরা বেটে সেবন করতে হয়। ধুতুরা বীজ দ্বারা বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি তেল ব্যবহারে সন্ধির ব্যথা, ছোট সন্ধির ব্যথা ও কোমরের ব্যথায় উপকারী। এছাড়া সর্দি, কাশি, হাঁপানি এবং স্পর্শকাতরতানাশক।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- ধুতুরা বীজ সমপরিমাণ গোলমরিচসহ বড়ি করে অন্য ঔষধি উপাদানসহ খেলে শুক্রমেহ ভালো হয়।
- ধুতুরা পাতা ৫ থেকে ১০ রতি মাত্রায় তামাকের ন্যায় ধূমপান করলে শ্বাসকষ্টে উপকার হয়।
- পাতা পুরানো ঘিসহ ব্যবহারে গেঁটে বাত ও ফোলায় উপকারী।
- হাঁপারি টানে ধুতুরা পাতার ধোঁয়া নাকে ও মুখে গ্রহণ করতে হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৬ থেকে ৮ মাসেই ধুতুরা গাছ পরিপক্ব হয়ে থাকে।

অন্যান্য ব্যবহার : গ্রামাঞ্চলে ধুতুরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

আয় : প্রতি একর জমিতে ২০,০০০ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকা।

৫৫. নয়নতারা

সংস্কৃত নাম : সাদাফুল
Botanical Name : *Catharanthus roseus (L.) G. Don.*
Common Name : *Nayantara*
English Name : *Periwinkle*
Family : *Apocynaceae*

পরিচিতি : নয়নতারা একটি গুল্ম জাতীয় বহু শাখা ও ঘন পাতা বিশিষ্ট উদ্ভিদ। এটি ২ থেকে ৩ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। পাতা অনেকটা ডিম্বাকৃতি। বোঁটাসহ ২-৩ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। উপরিভাগ গাঢ় সবুজ থাকলেও নিচের ভাগ হালকা বর্ণের। নয়নতারার শাখা শক্ত ও কাষ্ঠল। সারা বছর ফুল ফোটে এবং ফল ধরে। সাধারণত গোলাপী, হালকা গোলাপি ও সাদা—এ তিন ধরনের নয়নতারা দেখা যায়। পুষ্পদণ্ডে পাঁচ পাপড়ি বিশিষ্ট ফুল ফোটে। পাপড়ি চারিদিকে ছড়ানো থাকে এর নিচের দিকের রঙ হালকা। ফল দেখতে অবিকল সরিষার শুঁটির মতো, লম্বালম্বিভাবে দু'টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত এবং প্রতি ফলে সরিষার আকারের ১৫-৩০টি পর্যন্ত বীজ থাকে। সমগ্র গাছটি তিতা স্বাদের।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের সর্বত্র এটি জন্মায়।

চাষাবাদ : কাটিং বা বীজ থেকে চারা গজায়। গাছের নিচে পাকা বীজ পড়ে এমনিতেও নতুন চারা গজায়। এগুলি সরিয়ে রোপণ করলে নতুন গাছ জন্মায়। তেমন কোন যত্নের প্রয়োজন পড়ে না। গাছের বয়স পাঁচ থেকে ছয় মাস হলেই একে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

লাগানোর দূরত্ব : ২ থেকে ৩ ফুট।

উপযোগী মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতে এর চাষ করা যায়। ছায়াতে ঘেরা বালি এবং কাঁকুড়ে মাটিতেও এরা বেঁচে থাকে।

বীজ আহরণ : সারা বছর নয়নতারা গাছে ফুল ও ফল থাকে। তাই সবসময় এর ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করা যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় এক লক্ষ।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বীজ সংরক্ষণের প্রয়োজন পড়ে না।
ব্যবহার্য অংশ : ভেষজ হিসাবে নয়নতারার পাতা ও মূল ব্যবহৃত হয়।
উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : সমগ্র গাছের রসে প্রায় ৭০টি উপক্ষার পাওয়া যায়। তার মধ্যে ভিন ক্রিস্টিন এবং ভিন ব্লাস্টিন নামক উপক্ষার দুটি লিউকোমিয়া রোগের ঔষধ হিসাবে বিশেষভাবে গণ্য। নয়নতারা নিয়ে দেশে বিদেশে বিজ্ঞানীরা এখনো ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। সমগ্র গাছ ডায়াবেটিস রোগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া গাছটি অবসাদক, স্নায়ু উত্তেজনানাশক ও নিদ্রাকারক।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- **বিষাক্ত ক্ষত ও ঘা :** শরীরে কোন অঙ্গ কেটে কিংবা ঘা যদি বিষাক্ত হয়ে যায়, নয়নতারা গাছের রস প্রয়োগ করলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। রোজ একবার করে কচি ডাল ও পাতা বেটে তার রস দিয়ে ঘা ধুয়ে বেঁধে দিতে হবে। সাত দিন ব্যবহারে বিষদোষ নষ্ট হয়ে যাবে এবং ঘা শুকিয়ে যাবে।
- **রক্তের চাপ বাড়লে :** পাঁচ মিলিলিটার নয়নতারা গাছের মূলের টাটকা রস সকালে খালি পেটে একবার করে খেতে হবে। তিন-চার দিন খেলে উপকার পাওয়া যাবে। তবে চার-পাঁচ দিন পরে অবশ্যই রক্তের চাপ পরীক্ষা করে নিতে হবে।
- **বহুমূত্র রোগে :** প্রতিদিন সাদা নয়নতারা গাছের দুটি পাতা খালি পেটে চিবিয়ে খেলে এ রোগ মোটেই বাড়তে পারে না। যাদের দাঁত নেই তারা পাতাকে সামান্য পানি দিয়ে বেটে এক চামচ পরিমাণ রস খাবেন। নয়নতারা পাতা নিয়মিত খেলে রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৬ থেকে ৮ মাসেই নয়নতারা গাছ পরিপক্ব হয়ে থাকে।
অন্যান্য ব্যবহার : নয়নতারা বাগানের শোভা বৃদ্ধির জন্য রোপণ করা হয়ে থাকে।
চাহিদা : দেশে ও বিদেশে নয়নতারার চাহিদা রয়েছে। তাই এটি চাষ করা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হবে।
আয় : এক একর জমিতে নয়নতারার চাষে ২৫-৩০ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব।

৫৬. নাগেশ্বর

সংস্কৃত নাম : নাগকেশর
Botanical Name : *Mesua nagassarium (Burm. F.) Kost.*
Common Name : *Nageswar*
English Name : *Cobra's Saffron*
Family : *Guttiferae*

পরিচিতি : নাগেশ্বর মাঝারি ধরনের শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গাছ। এর কাঠ খুবই শক্ত। গাছের ছাল লাল আভাযুক্ত বাদামি বর্ণের এবং পুরানো হলে পাতলা ছাল আপনা আপনি খসে পড়ে। বাবলা গাছের মতো এ গাছ থেকে পীত বর্ণের আঠা বের হয়। শাখার

অগ্রভাগের পাতার কক্ষ থেকে সুগন্ধযুক্ত সাদা ফুল হয়। পুংকেশরগুলো পীতাভ সোনালি বর্ণের। এ ফুলের কলিকে নাগকেশর বলা হয়। মিয়ানমার, বাংলাদেশ ও ভারত এর আদি বাসস্থান। নাগেশ্বর ফুল ব্যবহার কম হয়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের বনাঞ্চলে পাওয়া যায়। ঢাকা শহরের সৌন্দর্য বর্ধনেও গাছটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

চাষাবাদ : ফেব্রুয়ারি মাসে এর ফল পাকতে শুরু করে এবং পরিপক্ব ফল সংগ্রহের পর তা রৌদ্রে শুকিয়ে বীজ সংগ্রহ করা হয়। বীজ অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। জুন-জুলাই মাসে বীজ রোপণের উপযুক্ত সময়। বীজের অঙ্কুরোদগম হতে ৩-৪ সপ্তাহ সময় লাগে। চারার বয়স ১-২ বছর হলে তা রোপণের উপযোগী হয়।

লাগানোর দূরত্ব : ১২ থেকে ১৫ ফুট।

উপযোগী মাটি : বেলে বা দোআঁশ মাটিতে ভালো হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ১০-১৫ বছরে নাগেশ্বর গাছ পরিপক্ব হয়।

বীজ আহরণ : ফেব্রুয়ারি মাসে এর ফল পাকতে শুরু করে তখন পরিপক্ব ফল সংগ্রহের পর তা রৌদ্রে শুকিয়ে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ২ শত।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : কাঁচা কিংবা শুষ্ক অবস্থায় নাগেশ্বরের ফুল ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ : ফুল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহায় : নাগেশ্বর প্রধান অঙ্গসমূহের শক্তিবর্ধক। নাগেশ্বর হৃৎপিণ্ড, যকৃত ও পাকস্থলির শক্তিবর্ধক। রক্ত পরিষ্কারক, চুলকানিনাশক এবং কৃমি ও অর্শরোগনাশক। জ্বর, সর্দি ও গেটে বাতে উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- যকৃত ও পাকস্থলির সমস্যায় শুকনো ফুল গুঁড়া ১ চা চামচ সামান্য পরিমাণ যোয়ান গুঁড়া মিশিয়ে পানিসহ খেতে হবে।
- অর্শরোগে নাগেশ্বরের কাঁচা ফুল ২ চা চামচ রাতে গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে কচলিয়ে ছেঁকে নিয়ে পানিটুকু সামান্য মিছরি বা মধুসহ খেতে হবে।
- মূত্রকৃচ্ছতায় এর ২ চা চামচ কাঁচা ফুল ১ গ্লাস পানিতে ৪-৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে জ্বাল করে (বাষ্প হওয়ার সাথে সাথে) ছেঁকে নিয়ে নির্যাসটুকু মিছরি বা মধুসহ খেতে হবে।

অন্যান্য ব্যবহার : ফল শিশুরা খেয়ে থাকে। নাগেশ্বর ফুলের রস, নির্যাস থেকে আতর ও সুগন্ধি তৈরি হয়।

চাহিদা : কেবলমাত্র দেশেই প্রতি বছর ২৩,০০০ কেজি নাগেশ্বরের চাহিদা রয়েছে।

আয় : এক একর জমিতে বাণিজ্যিক বা পরিপক্ব হওয়ার পর ৩০,০০০-৪০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৫৭. নিম

সংস্কৃত নাম : নিম্ব
Botanical Name : *Azadirachta indica A. Juss.*
Common Name : *Neem*
English Name : *Indian Lilac, Neem*
Family : *Meliaceae*

পরিচিতি : নিম মাঝারি ধরনের চিরহরিৎ বৃক্ষ। তবে শুষ্ক জায়গায় পত্রঝরা বৃক্ষের মতো আচরণ করে। গাছ সাধারণত ৪০-৫০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে নিম গাছের পাতা ঝরে গিয়ে নতুন পাতা গজায়। নিম গাছের বাকল গাঢ় ধূসর বর্ণের ও অমসৃণ। পাতা যৌগিক, ৯-১৫টি পত্রক থাকে। ফুল সাদা সুগন্ধিযুক্ত। ফল ডিম্বাকৃতির।

রাসায়নিক উপাদান : পাতা, ছাল, ফুল, ফল ও বিচির তেলে প্রচুর সংখ্যক তিক্ত উপাদান যেমন : নিম্বিন, নিম্বিডিন, নিম্বিনিন ইত্যাদি, টার্পিনয়েড, গ্লাইকোসাইড, অ্যানকালয়েড ও ট্যানিন বিদ্যমান।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিম জন্মে। বাংলাদেশের সর্বত্র জন্মালেও বিশেষত উত্তরাঞ্চলে বেশি জন্মে। এছাড়াও বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলে নিমের বাণিজ্যিক চাষ হচ্ছে।

চাষাবাদ : বাংলাদেশের সর্বত্র নিম গাছ পাওয়া যায়। তবে বেশি চাষ করা হয় দেশের বিস্তীর্ণ উত্তরাঞ্চলে এবং বরেন্দ্র ভূমিতে। বীজ থেকে চারা তৈরি করে নিম গাছ লাগানো হয়। মার্চ-মে মাসে নিম গাছে ফুল ফোটে এবং জুন-আগস্ট মাসে ফল পাকে তখন বীজ সংগ্রহ করতে হয়। বীজ সংগ্রহের ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে ব্যাগে অথবা মাটির পটে বীজ বপন করতে হয়। বীজ বপনের পূর্বে ফল হতে বীজ বের করে নিতে হয়। বপনে দেরি হলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়। এক বছরের চারা মাঠে রোপণ করতে হয়। পরিপক্ব ফল থেকে বীজকে আলাদা করার জন্য ৩-৪ দিন ছায়াযুক্ত পরিবেশে স্তূপাকারে রাখতে হয় ও ফলকে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে হাত দিয়ে কচলিয়ে বীজ সংগ্রহ করা হয়। এরপর বীজ রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা উত্তম।

লাগানোর দূরত্ব : ১৮ থেকে ২৭ ফুট।

উপযোগী মাটি : সাধারণত নিম গাছ খোলামেলা জায়গায় বেশি দেখা যায়। যেমন, রাস্তার ধারে সমতল ভূমিতে ও নাতিশীতোষ্ণ আবহায়ায়। সব ধরনের মাটিতে নিম গাছ জন্মে। তবে বেলে-দোআঁশ মাটিতে অধিক পরিমাণে জন্মে। বরেন্দ্রভূমি নিমের জন্য খুবই উপযোগী।

বীজ আহরণ : বীজ পরিপক্ব হলে সংগ্রহ করতে হবে। তবে মাটিতে না পড়ার জন্য ঘন জ্বাল দিয়ে গাছকে বেঁধে দিলে সবগুলো বীজই প্রায় সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। বীজকে ধুয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ৩৫০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : পাতা সংগ্রহ করে পরিষ্কার করে ছায়াযুক্ত রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। পাতার আর্দ্রতা কমে কিছুটা গাঢ় বর্ণ ধারণ করলে প্যাকেটজাত করতে হবে।

বীজের রসালো অংশ পরিষ্কার করে ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে চটের বস্তায় সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা, ছাল বা বাকল, ফল, বীজ ও নিমের তেল। এক কথায় নিমের সমস্ত অংশই ব্যবহার্য।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/ব্যবহার : নিম গাছের ছাল, ফুল ও বীজ ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। নিমের ছাল সিদ্ধ করে পানি খেলে ক্ষত শুকিয়ে যায়। নিম ফুল ভাজা খেলে রাতকানা উপশম হয়। পাতার গুঁড়া পানির সাথে মিশিয়ে খেলে অম্ল রোগ ও পেটের পীড়ার উপশম হয়। নিম তৈল মাখলে মাথা ধরা কমে যায়।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- ছালের রস ২৫-৩০ ফোঁটা কাঁচা দুধ মিশিয়ে খেলে স্বপ্নদোষ হয় না।
- বমি আসতে থাকলে নিম পাতার রস ৫-৬ ফোঁটা দুধ বা পানিসহ খাওয়ালে বমি প্রশমিত হয়।
- পাতার রস একটু মধুর সাথে মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেলে কামলা (জণ্ডিস) রোগ ভাল হয়।
- ১ গ্রাম নিম পাতার গুঁড়া সকালে খালি পেটে পানি দিয়ে খেলে ছোট কৃমি উপশম হয়।
- নিমের ছাল ৪-৫ গ্রাম ১ কাপ গরম পানিতে রাতে ভিজিয়ে রেখে সকালে খেলে পেটের অজীর্ণ ভাল হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৪-৫ বছরে নিমগাছ পরিপক্ব হয় তবে পূর্ণাঙ্গ পরিপক্ব হতে ৮-১০ বছর সময় প্রয়োজন।

অন্যান্য ব্যবহার : নিমের কাঠ দিয়ে উত্তম আসবাবপত্র তৈরি হয়। নিমের কাঠ অত্যন্ত শক্ত ও টেকসই। কাঠ দিয়ে ঘরবাড়ির চৌকাঠ বানানো যায়। নিম বীজ ও তৈল সাবান, কসমেটিক্স তৈরি ও পোকা মাকড় নিবারণে ব্যবহৃত হয়। নিমের শুকনো পাতা চাল, গম, ডাল ও কাপড়-চোপড়ে পোকা প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। নিমের খৈল ক্ষেতে ব্যবহার করলে পোকামাকড় হ্রাস করে ও জৈবসার হিসেবে কাজ করে।

আয় : একটি প্রাপ্তবয়স্ক গাছে ৫০-৬০ কেজি ফল পাওয়া যায় যার বাজার মূল্য প্রায় ৬০০-৯০০ টাকা। এছাড়াও একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ এককালীন ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রয় করা সম্ভব। মাত্র দু'টি প্রাপ্তবয়স্ক নিম গাছ থেকে বছরে প্রায় ২১,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব। এক একরে বাণিজ্যিক নিম চাষে ১৫,০০০-২০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

BANBEDOC Library
Accession No. 21020

৫৮. নিশিন্দা

সংস্কৃত নাম : নিরগুন্দি
Botanical Name : *Vitex negundo Linn*
Common Name : *Nishinda*
English Name : *Chaste Tree*
Family : *Verbenaceae*

পরিচিতি : নিশিন্দা ছোট আকারের পাতাঝরা গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। ৫ থেকে ১০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে দেখা যায়। ঘন শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট এবং কাণ্ড এবড়ো- খেবড়ো। পাতা অসমান ও বর্শাকৃতির। ফুল ছোট নীলাভ ও বেগুনি, সুগন্ধিযুক্ত দেখতে খুবই সুন্দর।
রাসায়নিক উপাদান : পাতায় একটি সবুজাভ হলুদ বর্ণের উদ্বায়ী তেল, একটি অ্যালকালয়েড, একটি গ্লাইকোসাইড, জৈব এসিড স্টেরল ও এমাইনো এসিড বিদ্যমান।
প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এই গাছের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।
চাষাবাদ : বীজ থেকে বংশবিস্তার সম্ভব হলেও অঙ্গজভাবেই নিশিন্দার বংশবিস্তার সহজ ও প্রচলিত। সজিনার মত এর কাটিংয়ের মাধ্যমে বংশবিস্তার করা যায়। অভিজাত নার্সারিতেও নিশিন্দার চারা পাওয়া যায়। বর্তমানে এর চাষের ব্যাপক প্রচলন না থাকলেও হেজ উদ্ভিদ হিসেবে বহুল ব্যবহার রয়েছে।
লাগানোর দূরত্ব : ৩ থেকে ৫ ফুট।
উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে নিশিন্দা জন্মে থাকে তবে দোঁআশ মাটিতে ভাল জন্মে।
বীজ আহরণ : বীজ অনেকটা গোলমরিচের মতো, তবে আকারে কিছুটা ক্ষুদ্রাকৃতির। বীজের রঙ কালো এবং সাদাটে হয়ে থাকে। জুন-জুলাই মাসে ফল ধরে এবং ফল পরিপক্ব হলে বীজ সংগ্রহ করা যায়।
প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ১২ হাজার।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : নিশিন্দা পাতা কাঁচা ব্যবহারই উত্তম। পাতা ভালভাবে ধুয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করা যায় এবং এক বছর ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে পাতা কালচে বাদামি রঙ ধারণ করা পর্যন্ত শুকিয়ে নিতে হবে। রৌদ্রে শুকাবার সময় কোনরকম ধুলাবালি যেন পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রয়োজনমতো পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
ব্যবহার্য অংশ : পাতা ও বীজ।
উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : নিশিন্দার পাতা পরজীবীনাশক এবং এর যক্ষ্মা ও ক্যান্সারবিরোধী গুণ রয়েছে। ফোলা ও মচকানোর ব্যথা কমাতে, কানের রোগ এবং গুঁড়া কৃমির উপদ্রব কমাতে নিশিন্দার ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বাতব্যথা নিবারক, সর্দি জ্বর ও শ্লেষ্মা নিবারক, কৃমিনাশক, বলকারক ও মূত্রবর্ধক।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- কৃমিতে ৫০০ মি. গ্রাম শুকনো নিশিন্দা পাতাগুঁড়ার সাথে মধু অথবা চিনি মিশিয়ে ৫-৭ দিন সকালে খালি পেটে খেলে উপকার পাওয়া যায়। ডায়াবেটিস চিনি অথবা মধু মিশানো নিষেধ।

- সর্দিজ্বরে ৫ মিলি গ্রাম পাতার রস মধুর সাথে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার খেতে হবে।
- রিউমাউয়েড আর্থরাইটিস ও বাতে ৫ গ্রাম পাতা গুঁড়ার সাথে সামান্য পরিমাণ লবঙ্গ গুঁড়া ও ৩-৪ চা চামচ মধু মিশিয়ে দৈনিক ২ বার খেতে হবে।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৯ থেকে ১০ মাসে নিশিন্দা গাছ থেকে পাতা সংগ্রহ করা যায়।

অন্যান্য ব্যবহার : নিশিন্দার কাঠ ধূসর, সাদা এবং শক্ত। নির্মাণ কাজ ও জ্বালানি হিসেবে নিশিন্দা কাঠ ব্যবহৃত হয়। এর ছাই থেকে রঙ তৈরি হয়। পাতাসহ সমস্ত গাছ সুগন্ধযুক্ত। কীট-পতঙ্গ এই গন্ধ সহ্য করতে পারে না, তাই খাদ্যশস্য সংরক্ষণ কাজে নিশিন্দা পাতা ব্যবহার করা হয়। জামা-কাপড় ও বই পোকার উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্যেও নিশিন্দার শুকনো পাতা ব্যবহার করা যায়। ধূপের সাথে এর শুকনো পাতা ব্যবহার করলে মশা দূর হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ৪৫,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা আয় করা যায়।

৫৯. পাথরকুচি

সংস্কৃত নাম : বটপত্রী, পাষাণবেদ
Botanical Name : *Kalanchoe pinnata (Lam.) Pres.*
Common Name : *Patharkuchi*
English Name : *American Leaf Plant, Sprout Leaf Plant*
Family : *Crassulaceae*

পরিচিতি : পাথরকুচি একটি গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। তিন থেকে চার ফুট পর্যন্ত বড় হয়। কাণ্ড খুবই সরু থাকে। পাতা বেশ মসৃণ খাঁজকাটা, ডিম্বাকৃতি, পুরু ও তিন-চার ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতে বসতবাড়িতে পাথরকুচি দেখা যায়।

চাষাবাদ : পাথরকুচি চাষ বা বংশবিস্তার খুবই সহজ। একটি পরিপক্ব পাতা ছিঁড়ে ভিজা মাটির উপর রেখে দিলে কয়েক দিনের মধ্যেই পাতার কিনারা থেকে একাধিক নতুন চারা গজায়। মাঝে মাঝে পানি দিতে হয়। এছাড়া অন্য কোন বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না।

লাগানোর দূরত্ব : ২-৩ ফুট।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে পাথরকুচি গাছ জন্মে।

বীজ আহরণ : অঙ্গজ বংশবৃদ্ধি ঘটে। বীজের প্রয়োজনীয়তা নেই।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রযোজ্য নয়। অঙ্গজ বংশবিস্তার সম্ভব।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সাধারণত কাঁচা অবস্থায় পাথরকুচি ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ : পাতাও গাছের ছাল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : পাথরকুচি ক্ষত পরিষ্কারক ও শীতলজনিত ব্যথা, যকৃত এবং প্লীহার ব্যথা বৃদ্ধিনাশক। কুকুরের বিষ ও কীটপতঙ্গের বিষনাশক। মূত্রকৃচ্ছ্রতানাশক, ঋতুকারক ও পেটের ব্যথা নিবারক। সির্কার সাথে প্রলেপ সহযোগে ব্যবহারে ধবল বা শ্বেতী রোগনাশক।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- ২ চা চামচ পাতার রস আধাকাপ অল্প গরম পানিতে মিশিয়ে সকালে ও বিকেলে খেলে মূত্র রোধে উপকার পাওয়া যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে ১ চা-চামচ রস একই নিয়মে খাওয়াতে হবে।
- ১ চা-চামচ করে পাতার রস সকালে-বিকালে দুইবার করে ৭ দিন খেলে মেহ রোগে উপকার পাওয়া যায়।
- শিশুর পেটে ব্যথা হলে ৪০ থেকে ৬০ ফোঁটা পাতার রস গরম করে ঠাণ্ডা হলে অল্প মুখে দিতে হবে ও কাঁচা রস পেটে মেখে দিতে হবে।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৪-৫ মাসে পরিপক্ব হয়।
অন্যান্য ব্যবহার : পাথরকুচি বাড়ি এবং আঙিনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।
আয় : প্রতি একর জমিতে ৫০,০০০ টাকা থেকে ৬০,০০০ টাকা।

৬০. পান

সংস্কৃত নাম : পাগবল্লী
Botanical Name : *Piper betle Linn.*
Common Name : *Pan*
English Name : *Betel Leaf*
Family : *Piperaceae*

পরিচিতি : পান লতানো গাছ এবং কাণ্ড শক্ত। পাতা ৩ থেকে ৮ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু এবং বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতির। পাতায় ৭টি শিরা আছে বলে একে সপ্তশিরা বলা হয়। অনেক রকমের পান আছে। যথা : বাংলা পান, সাঁচি পান, কর্পূর গন্ধযুক্ত মিঠা পান ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার পানের স্বাদ ও পানের পার্থক্য আছে। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত পানের ফুল ও ফল হয়ে থাকে। চীন, মালয়েশিয়া ও ভারত পানের আদি বাসস্থান।
প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের রাজশাহী, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া ও বরিশালে পানের চাষ বেশি হয়। সুনামগঞ্জ, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি জেলার পাহাড়ি অঞ্চলে আদিবাসীরা বড় গাছে পান উঠিয়ে দিয়ে চাষ করে। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায়ও পান চাষ হয়।
চাষাবাদ : পান চাষ সাধারণত পানের বরজে কাটিং থেকে করা হয়। পানের লতানো কাণ্ডের গিঁট থেকে অস্থানিক মূল বের হয়। এই মূলের সাহায্যে লতিয়ে ওঠা জিনিসকে শক্ত করে রাখে। পান গাছ ছায়াতে হয়। পান গাছকে তাই বিশেষভাবে তৈরি ঘন বেড়া ও উপরে চালা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। এভাবে ঢেকে রাখা পান ক্ষেতকে বলা হয় বরজ।
লাগানোর দূরত্ব : দেড় থেকে দুই ফুট।
উপযোগী মাটি : দো-আঁশ মাটি পান চাষের জন্য ভালো।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সাধারণত কাঁচা অবস্থায় পান পাতা ব্যবহার করা হয়।
ব্যবহার্য অংশ : পাতা।
উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : পান মনে প্রফুল্লতা আনে, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলি এবং মস্তিষ্ক সতেজ ও শক্তিশালী করে। পান যৌন শক্তি বৃদ্ধি করে, রক্ত পিত্ত ও শ্লেষ্মা বিকৃতি দূর করে। পান স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালির প্রদাহে উপকারী। পানের রস কান পাকা ও মাথা উকুন দূর করে। পানের শিকড়ে গর্ভ নিরোধক শক্তি আছে।

কোন অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- পান চিবালে দাঁত ও মাড়ি মজবুত করে এবং মাড়ি ফুলা দূর করে।
- সুপারি ও এলাচির সংগে পান খেলে দাঁত ব্যথা ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে মুখের সুগন্ধ আনয়ন করে।
- পান বাটা বা চিবিয়ে প্রলেপ দিলে টাটকা ক্ষতের রক্ত পড়া বন্ধ হয় ও ক্ষত শুকায়।
- সুপারি ও চুনের সাথে পানের রস গ্রহণ করতে হয় এবং রস চিবানোর পর অবশিষ্টাংশ ফেলে দিতে হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ১ বছরে পান পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : পৃথিবীব্যাপী পানের জনপ্রিয়তা রয়েছে।

আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ১,০০,০০০ টাকা থেকে ১,৫০,০০০ টাকা আয় করা যায়।

৬১. পিতরাজ

সংস্কৃত নাম : রোহিতক
Botanical Name : *Aphanamixis polistachya*
Common Name : *Pitraj/Royna*
English Name : *Parker*
Family : *Meliaceae*

পরিচিতি : চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত মাঝারি আকারের বৃক্ষ, ১০-১২ মিটার উঁচু হয়। পাতা ৩০-৩৫ সেন্টিমিটার লম্বা, পুষ্পদণ্ড পাতার দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কিছু ছোট বা সমান। এর পাতা চাঁপা ফুলের পাতাসদৃশ। পত্রদণ্ডের দুই দিকে সমান্তরালভাবে পাতা হয় এবং অগ্রভাগে একটি পাতা হয়। পুষ্পদণ্ডে স্ত্রী পুরুষভেদে দু রকমের ফুল ফোটে। ফল গোলাকার, মসৃণ, শাঁসযুক্ত এবং ঈষৎ লাল। তবে ফিকে পীতবর্ণও হতে দেখা যায়। ফলের বীজ থেকে তেল পাওয়া যায়। এটিকে রোহিতক বা রয়নাও বলা হয়ে থাকে। ছাল পুরু ও ভিতরে ঈষৎ রক্তাভ।

প্রাপ্তিস্থান : দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই গাছ দেখা যায়।

চাষাবাদ : বীজ হতে চারা তৈরি করে পিতরাজ গাছ লাগানো যায়। ডিসেম্বর মাসে গাছে ফুল ফোটে এবং মার্চ মাসে ফল পাকে। তখন বীজ সংগ্রহ করতে হয়। বীজ সংগ্রহের ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে চটে অথবা মাটির পটে বীজ বপন করতে হয়। বীজ বপনের পূর্বে ফল হতে বীজ বের করে নিতে হয়। বপনে দেরি হলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়। এক বছরের চারা মাঠে রোপণ করতে হয়। পরিপক্ব ফল থেকে বীজকে আলাদা করার জন্য ৩-৪ দিন ছায়াযুক্ত পরিবেশে স্তূপাকারে রাখতে হয় ও ফলকে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে হাত দিয়ে কচলিয়ে বীজ সংগ্রহ করা হয়। এরপর বীজ রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা উত্তম।

লাগানোর দূরত্ব : ১৮ ফুট।

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ৪০০ থেকে ৫০০টি।

বীজ আহরণ ও সংগ্রহের সময় : মার্চ-মে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বীজ সংগ্রহ করে পরিষ্কার করে ছায়াযুক্ত রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। বীজের আর্দ্রতা কমে কিছুটা গাঢ় বর্ণ ধারণ করলে প্যাকেটজাত করতে হবে।

ব্যবহার্য অংশ : ফলের শাঁস, তেল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : চরকের চিকিৎসাস্থানে উল্লেখ করা আছে, প্লীহা, যকৃৎ বৃদ্ধি পেলে (পিতরাজ) যথাযথ পাকের নিয়মে তৈরি করে প্রয়োগ করলে ঐ রোগ নিরাময় হবে। এছাড়াও উদর, কামলা, শোথ ও অরুচি প্রশমক হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়। বীজের তেল বাত-ব্যাধিতে ব্যবহার হয়। তেল দিয়ে বাতি জ্বালানো যায়।

কোন অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- মেয়েদের রক্তপ্রদর রোগ শুরু হওয়ার অল্পদিনের মধ্যে মূলার ছাল ৫ গ্রাম ভাল করে থেঁতো করে ৪ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে আন্দাজ আধকাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে সেই পানি দ্বিগুণ দুধ মিশিয়ে সকাল-বিকাল দু'বার করে এক সপ্তাহ খেলে এই রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।
- মেহ ও স্থৌল্য রোগের (মোটা হয়ে যাওয়া) এটি একটি মহৌষধ। বীজের তেল বাতের মালিশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ছাপ কটু রসায়ন ও বলবৃদ্ধিকারক।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৭-১০ বছর।

অন্যান্য ব্যবহার : এর কাঠ খুবই শক্ত এবং ঘরের আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার হয়।

~~**আয় : প্রতি একর জমিতে**~~ ৩০,০০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৬২. পিপুল

Botanical Name : *Piper longum Linn.*
Common Name : *Pipul*
English Name : *Long Pepper*
Family : *Piperaceae*

পরিচিতি : পিপুল মাটিতে বেয়ে বড় হওয়া সুগন্ধিযুক্ত লতানো গাছ। কখনও অন্য গাছে বেয়ে ওঠে। লতার সামনের অংশ কোমল, পাতা ডিম্বাকৃতির, উপরের অংশ গাঢ় সবুজ ও নিচের অংশ হালকা সবুজ। দেখতে অনেকটা পানের মতো। পুষ্পদণ্ড সোজা ও উন্নত। জুলাই-আগস্ট মাসে গাছে একলিঙ্গ ধরনের ফুল ধরে। ফুল কুঁড়ি অবস্থায় সবুজ। ফল পাকলে হলুদ ও পরে ধূসর বর্ণ ধারণ করে। নভেম্বর মাসে ফল পাকে।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জের আনাচে-কানাচে পিপুল দেখা যায়। বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।

চাষাবাদ : পুরনো পর্বসন্ধি থেকে শিকড় বের হয়। শিকড়সহ কিছুটা লতা কেটে মাটিতে রোপণ করলে অথবা শিকড় ব্যতীত লতার কিছু অংশ মাটিতে রোপণ করলেও পর্বসন্ধি থেকে শিকড় বের হয়ে নতুন চারা হয়। অপেক্ষাকৃত উঁচু ছায়াযুক্ত স্যাঁতসেঁতে কিন্তু জলমগ্ন নয় এমন জমিতে বর্ষার আগেই লাগাতে হয়।

লাগানোর দূরত্ব : ১-২ ফুট।

উপযোগী মাটি : ছায়াযুক্ত স্যাঁতসেঁতে কিন্তু জলমগ্ন নয় এমন মাটিতে পিপুল ভাল হয়।

বীজ আহরণ : পুরনো পর্বসন্ধি থেকে শিকড় বের হয়। শিকড়সহ কিছুটা লতা মাটিতে পুঁতে দিলে নতুন চারা গজায়।

বীজ সংগ্রহের সময় : নভেম্বর।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সাধারণত পিপুলের ফল বা বীজ ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হয়। নভেম্বর মাসে পিপুল ফল পাকলে তা সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

ব্যবহার্য অংশ : বীজ, ফল ও মূল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : পিপুলই একমাত্র ভেষজ যাকে চরক সংহিতার যুগে সর্বাপেক্ষা বেশি অনুশীলন করা হয়েছে। হজমকারক, বায়ুনাশক, পাকস্থলি ও যকৃতের শক্তিবর্ধক। কাশি, জীর্ণজ্বর, মেদ, হাঁপানি, বাত, প্লীহাবৃদ্ধিতে উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- যক্ষ্মার প্রাথমিক অবস্থায় বিশেষ চিকিৎসা শুরু করার আগে ২৫০ মি.গ্রা. পিপুল বীজগুঁড়া হালকা গরম পানিসহ সকাল-বিকাল দুইবার খেলে ৪/৫ দিনের মধ্যেই উপকার পাওয়া যায়।
- মেধা বৃদ্ধির জন্য পিপুল বীজগুঁড়া ১৫০ মি.গ্রা. ২০/২৫ ফোঁটা ঘিয়ের সাথে মিশিয়ে কিছুদিন খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে।
- গুঁড়াকৃমির উপদ্রবে প্রতিদিন বিকালে ২৫০ মি.গ্রা. পিপুল বীজগুঁড়া পানিসহ খেলে কৃমির উপদ্রব কমে যাবে।
- বয়সের কারণে শ্লেষ্মার বিকারজনিত রোগে আক্রান্ত হলে ২৫০ মি.গ্রা. পিপুল বীজগুঁড়ার সাথে ৩/৪ চামচ বাসক পাতার রস মিশিয়ে খেলে উপকার পাবেন।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৯ থেকে ১০ মাসে পিপুল পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : পিপুল পাতা শাক হিসেবে রান্না করে খাওয়া যায়।

আয় : প্রতি একর জমিতে ১৫০,০০০ টাকা থেকে ২০০,০০০ টাকা।

৬৩. পুদিনা

সংস্কৃত নাম : রোচনী
Botanical Name : *Mentha arvensis Linn.*
Common Name : *Pudina*
English Name : *Mint*
Family : *Labiatae*

পরিচিতি : পুদিনা বর্ষজীবী অতিশয় উগ্র গন্ধবিশিষ্ট বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। এর অনেকগুলো প্রজাতি আছে। পুদিনা পাতা উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের, কিনারা করাতের মতো কাটা, পুরু এবং কোমল ও অগ্রভাগ সরু। ফুল ছোট, সাদা ও গুচ্ছাকার হয়। তবে পুদিনার ফুল কমই হয়ে থাকে। পুদিনার গাছ, পাতা ও তেল ব্যবহার হয়। আমাদের

দেশে পুদিনা সাধারণত তিন প্রকার : ১. পাহাড়ি পুদিনা, ২. জংলি পুদিনা ও ৩. জলজ পুদিনা।

রাসায়নিক উপাদান : পাতায় প্রচুর পরিমাণে উদ্বায়ী তেল, প্রোটিন, এমাইনো এসিড ও খনিজ উপাদান বিদ্যমান।

প্রাপ্তিস্থান : পুদিনার আদি নিবাস ইউরোপ ও এশিয়া। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এর চাষ হতে দেখা যায়। পৃথিবীতে এর প্রায় ২৫ প্রজাতি আছে।

চাষাবাদ : সেচের ব্যবস্থা থাকলে বছরের যে কোন সময় পুদিনা চাষ করা যায়। তবে সাধারণত বর্ষাকালে ভেজা ও স্যাঁতসেঁতে মাটিতে মূলসহ কাণ্ডের গোড়ার অংশ লাগাতে হয়।

লাগানোর দূরত্ব : ৬-৮ ইঞ্চি।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে জন্মে।

বীজ আহরণ : প্রযোজ্য নয়। অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে বংশবিস্তার ঘটে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : পুদিনা পাতা কাঁচা ব্যবহার করাই ভালো। পুদিনা গাছ পাতাসহ উঠিয়ে ভালভাবে ধুয়ে ছোট ছোট করে কেটে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর তা শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। এভাবে এক এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা/সমস্ত গাছ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : পুদিনা হজমকারক ও হিক্কা নিবারক। কামলা রোগ দূর করে ও কুষ্ঠ রোগে উপকারী। পুদিনার পোড়া ছাই দাঁতের মাড়ি শক্ত করে। মধু ও লবণের সঙ্গে খেলে কৃমি দূর হয়।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- হজমে সমস্যা হলে ২/৩ চা চামচ পুদিনার রস খাবারের পর দিনে ২ বার বিট লবণসহ খেতে হবে।
- সর্দি হলে সামান্য পরিমাণ পুদিনা বেটে এক ছটাক পানিতে গুলে খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।
- অরুচি হলে পুদিনা বেটে লবণ মিশিয়ে খাবারের সংগে খেলে অরুচি দূর হয়। পুদিনার চাটনিও বিশেষ মুখরোচক।
- বমি বমি ভাব হলে পুদিনা বেটে সামান্য লবণসহ খেলে বমি বমি ভাব দূর হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৪ থেকে ৫ মাসেই পুদিনা ব্যবহার উপযোগী হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উন্নতমানের ক্যান্ডি তৈরিতে পুদিনা ব্যবহার হয়। বর্তমানে বিভিন্ন প্রসাধনী প্রস্তুতে পুদিনার ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়াও পৃথিবীব্যাপী পুদিনা বেশি ব্যবহৃত হয় সালাদ তৈরিতে। বাংলাদেশে সালাদ-এ পুদিনার ব্যবহারসহ পুদিনার চাটনির বেশ কদর রয়েছে।

আয় : প্রতি একর জমিতে পুদিনা চাষ করে বছরে ৭০,০০০ থেকে ৯০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৬৪. পুনর্নবা

সংস্কৃত নাম : পুনর্নবা, শোথঘ্ন
Botanical Name : *Boerhaavia diffusa Linn.*
Common Name : *Punarnava*
English Name : *Spreading Hogweed*
Family : *Nyctaginaceae*

পরিচিতি : পুনর্নবা বহুল পরিচিত ঘন শাখা-প্রশাখাযুক্ত ও মাটিতে বেড়ে ওঠা স্বল্প বর্ষজীবী লতাগুল্ম। শিকড় মোটা এবং প্রধান শিকড় শক্ত ও কাঠের মতো। লতা শুকিয়ে গেলে মূল থেকে যায় যা বর্ষাকালে আবার গজায়। লতা নরম, ২ থেকে ৩ ফুট লম্বা গোলাকার ও মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। পাতা পুরু, ছোট গোলাকার হৃৎপিণ্ডের মতো, অগ্রভাগ মোটা এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফুল হালকা গোলাপি ও সাদা বর্ণের হয়ে থাকে। বীজ খুব ছোট ও কালো বর্ণের।

প্রাপ্তিস্থান : পুনর্নবা বাংলাদেশ ও ভারতে পতিত জমিতে আর্দ্র স্থানে বর্ষাকালে বেশি জন্মে।

চাষাবাদ : বীজ দিয়ে বংশবিস্তার হলেও শিকড়সহ লতাপাতা দিয়ে এ গাছের বংশবিস্তার করা ভালো। লতাপাতাসহ শিকড় মাটিতে লাগালে আপনা আপনি বংশবৃদ্ধি হতে থাকে। যে কোন সময় লাগালেই হয়, তবে বর্ষায় লাগানোই ভাল।

লাগানোর দূরত্ব : লাগানোর দূরত্ব ৩ থেকে ৪ ফুট।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে এই গাছ জন্মে। তবে বেলে বা দোআঁশ মাটিতে ভালো জন্মে।

বীজ আহরণ : ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করা যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রযোজ্য নয়। শিকড় থেকে বংশবিস্তার করা যায়।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : পুনর্নবা সাধারণত কাঁচা অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে শুষ্ক অবস্থায়ও ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে পুনর্নবা গাছ পাতাসহ উঠিয়ে ভালভাবে ধুয়ে ছোট ছোট করে কেটে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর তা শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। এভাবে এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : সমগ্র উদ্ভিদ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামন্দা, শূলরোগে ও লিভারের রোগনাশক। হজমকারক, মূত্রকারক এবং প্লীহা ও যকৃত বৃদ্ধিতে উপকারী। জণ্ডিস ও শোথ রোগে উপকারী। ঋতু, ঘর্ম ও দুগ্ধবর্ধক এবং শ্লেষ্মা পরিষ্কারক। জ্বর, ফোলা ও সন্ধিব্যথা নিবারক এবং পুনর্নবা বীজ কাম ও যৌনশক্তি বর্ধক।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- উদরী, জণ্ডিস, অভ্যন্তরীণ প্রদাহ ও মূত্রকৃচ্ছতায় পুনর্নবা ক্বাথ চিরতাসহ ব্যবহার হয়।
- পুরাতন চক্ষু প্রদাহে মধুসহ পুনর্নবা ড্রপ আকারে ব্যবহারে উপকারী।
- চোখের ছানি ও ক্ষতরোগে পুনর্নবা রসে কাজল তৈরি করে ব্যবহার করতে হয়।

- শোথ ও মূত্রকৃচ্ছ্রতায় সমগ্র উদ্ভিদ (মূলসহ) হালকা ছেঁচে ২০-৩০ গ্রাম, আদা ৩/৪ গ্রাম একসাথে ৪ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে রোজ সকালে ও বিকালে দু'বার খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- ঋতুস্রাব বৃদ্ধি ও অনিদ্রায়, ২০-২৫ গ্রাম সম্পূর্ণ গাছ (মূলসহ) হালকা ছেঁচে ৫/৬ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে রোজ সকাল-বিকাল সেব্য।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৪ থেকে ৫ মাসেই পুনর্নবা ব্যবহার উপযোগী হয়।
অন্যান্য ব্যবহার : পশুখাদ্য হিসেবে গাছ ব্যবহার করা যায়।
আয় : প্রতি একর জমিতে ১,২৫,০০০ টাকা থেকে ১,৫০,০০০ টাকা।

৬৫. বকফুল

সংস্কৃত নাম : অসন্তি
Botanical Name : *Sesbania grandiflora (L) Pers.*
Common Name : *Bakphool*
English Name : *Agati*
Family : *Leguminosae*

পরিচিতি : বকফুল মধ্যাকৃতির পাতাঝরা বৃক্ষ। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়। গাছ লম্বায় ২৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর কাণ্ড সরল, উন্নত এবং বাকল ম্লান বাদামি। এর শাখা ফাঁক ফাঁক হয়। যৌগিকপত্র অনেকটা পালকের মতো। ফুল ২ থেকে ৪ ইঞ্চি, ছোট বোঁটা থাকে এবং সাদা বা রক্তবর্ণ। ফুলের অগ্রভাগ বাঁকা। পাপড়ি ৬টি এবং অসমান। ফল দীর্ঘ, প্রায় গোলাকৃতি এবং অসংখ্য বীজে পূর্ণ, কচি ফলের রঙ ম্লান হলুদ, পাকা ফল প্রায় বাদামি। এর বীজ থেকে চারা তৈরি করা সহজ। ভারত, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া এর আদি বাসস্থান।
প্রাপ্তিস্থান : ভারত, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া।
লাগানোর দূরত্ব : ৬ থেকে ১০ ফুট।
উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ মাটিতে বকফুল ভালো জন্মে।
বীজ আহরণ : জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ফল পাকলে রোদে শুকিয়ে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। ফল পাকলে দ্রুত সংগ্রহ না করলে পোকার আক্রমণ ঘটে।
প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ১০ হাজার।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সাধারণত কাঁচা অবস্থায় বকফুলের পাতা ও ফুল ব্যবহার করা হয়।
ব্যবহার্য অংশ : গাছের ছাল, পাতা, ফুল ও সার কাঠ।
চাষাবাদ : বীজ হতে চারা জন্মায়। ১-২ বৎসর বয়সকাল থেকে ফুল দেখা যায়।
উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : বকফুলের পাতার রস মাথাধরায় উপকারী এবং নাকের সর্দি আরাম করে শরীরকে হালকা করে। ছাল বলকারক ও সংকোচক। ফুলের রস শরীরের ব্যথা-বেদনার উপশম করে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- বুকে সর্দি বসে গেলে বকফুলের রস ১ চা চামচ করে ২/৩ ঘণ্টা পরপর ২/৩ বার করে খাওয়ালে সর্দি তরল হয়ে উঠে যায়। কিন্তু ১২ মাসই বকফুল পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে ঐ গাছের পাতার রস একটু গরম করে ২ চা চামচ করে ২/৩ ঘণ্টা পরপর খাওয়ালেও একই কাজ দেবে।
- এলার্জিতে বকফুল গাছের পাতার রস একটু গরম করে ২ চা চামচ করে খেলে আর ২/১ ফোঁটা নাকে টানলে এই অসুবিধা চলে যাবে। প্রাচীন বৈদ্যদের কাছে এটা ছিল এন্টি-হিস্টামিনিক ড্রাগ।
- বকফুলের সার কাঠ মেয়েদের শ্বেত প্রদর রোগে মহাউপকারী।
- ঘুসঘুসে জ্বরে বকফুল গাছের ছাল ৫/৬ গ্রাম, হরীতকী ৫/৬ গ্রাম একসঙ্গে ৪ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে সকালে একবার খেতে হবে। যদি এর সাথে ৫ গ্রাম গোক্ষুর বীজ সিদ্ধ করে ঐ ক্বাথটা তৈরী করা যায় তাহলে আরও ভাল হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : বকফুলের বৃদ্ধি খুব দ্রুত। এক-দু'বছরেই গাছে ফুল ধরে এবং ফল হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : ফুল গ্রামাঞ্চলে সব্জি হিসেবে বেশ জনপ্রিয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে ৩০,০০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকা।

৬৬. বহেড়া

সংস্কৃত নাম : বিভিতক

Botanical Name : *Terminalia belerica Rotz.*
Common Name : *Bhohera*
English Name : *Beleric Myrobalan*
Family : *Combretaceae*

পরিচিতি : বহেড়া শাখা-প্রশাখাযুক্ত বড় পত্রঝড়া বৃক্ষ। ইহা সাধারণত ১৮ মি.-৩০ মি. লম্বা হয়। গাছের গুঁড়ি বেশ লম্বা, কালচে ধূসর বর্ণের। ছাল বেশি পুরো হয় না। মাঘ-চৈত্র মাসে পাতা ঝরে যায়। ফল গোলাকৃতি। প্রতি ফলে একটি বীজ থাকে।

রাসায়নিক উপাদান : ফলে প্রচুর পরিমাণ ট্যানিন, স্টেরল, ম্যানিউল ও অন্যান্য চিনি বিদ্যমান।

প্রাপ্তিস্থান : বহেড়া বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি হিমালয় প্রদেশের সর্বত্র জন্মে। দেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহের বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়। এছাড়াও গ্রামাঞ্চলে, পঞ্চগড় ও মৌলভীবাজারে পাওয়া যায়।

চাষাবাদ : অপেক্ষাকৃত শুষ্ক জমিতে ও পাহাড়ের ঢালে বহেড়ার চাষ করা যায়। জানুয়ারি হতে মার্চ মাস পর্যন্ত পাকা ফল সংগ্রহ করা যায়। ফল শক্ত আবরণ বিশিষ্ট। ফলের আবরণ মখমলের মতো দেখতে। সাধারণ তাপমাত্রায় ১-৩ মাস পর্যন্ত ফল সংরক্ষণ করা

যায়। ফল ৪০-৪৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে ফলত্বক ছাড়িয়ে বীজতলায় অথবা চটের ব্যাগে বপন করে চারা তৈরি করা যায়। বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে চারা গজাতে শুরু করে এবং ৫০-৬০ দিন পর্যন্ত গজায়। অংকুরোদগম হার শতকরা ৬০-৭০ ভাগ। ২ বছর বয়সের চারা রোপণই উত্তম। চারা অবস্থায় গাছ নরম থাকে বিধায় কাঠি দিয়ে গাছ বেঁধে রাখতে হয়।

বীজ আহরণ : ফল পেকে গাছের তলায় আপনা আপনি ঝরে পড়ে। বস্তুত তখনই একে সংগ্রহ করতে হয়। পরবর্তীতে শুকিয়ে ঘরের সাধারণ তাপমাত্রায় রেখে ১ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় এবং এর কার্যকারিতা অটুট থাকে। জানুয়ারি-মার্চ মাস বীজ আহরণের উত্তম সময়।

লাগানোর দূরত্ব : সাধারণত ১৮-২৭ ফুট দূরত্বে গাছ লাগানো উত্তম।

উপযোগী মাটি : সাধারণত দোআঁশ মাটি বহেড়া চাষের জন্য উপযোগী। তবে পাহাড়ি লালমাটিতে বহেড়া জন্মে।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রতি কেজিতে ২০০-২৫০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বহেড়া সম্পূর্ণরূপে পেকে গেলে আপনা আপনি গাছ থেকে ঝরে পড়ে। ফল যাতে মাটিতে পড়ে থেঁতলে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে জাল দিয়ে পুরো গাছ আবৃত করে ফল সংগ্রহ করা যেতে পারে। ভাল করে পরিষ্কার করে রৌদ্রে সংরক্ষণ করতে হয়। এছাড়া মৃদু তাপে সামান্য ভাঁপ দিয়ে পরবর্তীতে রৌদ্রে শুকিয়েও সংরক্ষণ করা যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে শুকাবার সময় যেন কোন রকম ধুলা না পড়ে।

ব্যবহার্য অংশ : গাছের ছাল, ফল ও বীজ ব্যবহার হয়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : বহেড়া ত্রিফলার অন্যতম ফল। বহেড়া পাকস্থলির রোগে ও যৌনরোগ, জ্বর, মাথাব্যথা, অর্শ, উদরাময় ও আমাশয়ে বিশেষ উপকারী। বলকারক, শক্তিদায়ক এবং চোখ, মস্তিষ্ক ও গুহ্যদ্বারের বিভিন্ন রোগে ব্যবহার হয়। বহেড়া চুল কালো করে এবং চুলের অকালপক্বতা দূর করে এবং গোড়া শক্ত করে। বহেড়ায় মাদকতা আছে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- চুল উঠতে থাকলে বহেড়া ক্বাথ, নারিকেল তেল ও মেথি মিশিয়ে মাথায় দিলে চুল ওঠা বন্ধ হয় এবং নতুন চুল গজায়।
- চোখের মণির পাশে সাদা দাগ দেখা দিলে বহেড়ার শাঁস মধুসহ পিষে চোখে দিলে রোগ আরোগ্য হয়।
- কৃমি রোগে তিন আনা পরিমাণ বহেড়ার শাঁস গুঁড়া ডালিম পাতার রসসহ খেলে কৃমি নষ্ট হয়।
- গলার স্বর ভেঙ্গে গেলে বহেড়ার শাঁস ভিজিয়ে খেলে এবং বহেড়ার গুঁড়া মধুসহ খেলে স্বরভাঙ্গা রোগ আরোগ্য হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৪-৫ বছরে পরিপক্ব হয়ে তবে পূর্ণাঙ্গ পরিপক্ব হতে ১০ বছর সময় প্রয়োজন।

অন্যান্য ব্যবহার : বহেড়া কাঠ প্যাকিং বক্স বানানো, জ্বালানি হিসেবে ও কাগজের মণ্ড প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। এতে শতকরা ২৫ ভাগ ট্যানিন থাকে এবং এটি চামড়া ট্যান করার কাজে বিশেষ উপযোগী।

আয় : একটি প্রাপ্তবয়স্ক গাছে ১৫০-২০০ কেজি ফল পাওয়া যায়, যার বাজার মূল্য প্রায় ৪০০০ টাকা। এছাড়াও একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ এককালীন ৩,০০০-৪,০০০ হাজার টাকায় পর্যন্ত বিক্রয় করা সম্ভব।

৬৭. বাসক

সংস্কৃত নাম : বাসক
Botanical Name : *Adhatoda vasica Nees.*
Common Name : *Basok*
English Name : *Malabar Nut, Vasaka*
Family : *Acanthaceae*

পরিচিতি : বাসক চিরসবুজ, বহু বর্ষজীবী গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। বাসক গাছ ৫ থেকে ৭ ফুট উঁচু হয়। কাণ্ড সরল এবং শাখা গোলাকার। পাতা লম্বা, পাতলা ও নরম। পাতা কাণ্ডের গোঁড়া হতে বের হয়। কাণ্ড গাঁটযুক্ত। ফুল সাদা, তবে মাঝে মধ্যে লাল ছিটযুক্ত দাগ থাকে। মে-জুন মাসে ফুল ও জুলাই-আগস্ট মাসে ফল সংগ্রহ করতে হয়।

রাসায়নিক উপাদান : ফলে প্রচুর পরিমাণ ট্যানিন, স্টেরল, ম্যানিউল ও অন্যান্য চিনি বিদ্যমান।

প্রাপ্তিস্থান : বাসক বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। এছাড়া ভারত, ভুটান প্রভৃতি দেশের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর জন্মে।

চাষাবাদ : সাধারণত গ্রাম অঞ্চলে বাড়ির চারপাশে বা খেতের আইলে লাগানো হয়। এছাড়া ঝোপ-ঝাড়ে অবহেলা-অযত্নে এমনিতেই জন্মে। বীজ অথবা কাটিং বা কোলন থেকে বাসক চাষ করা যায়। বর্ষাকালে বাসকের ডাল কাটিং করে বেলে মাটিতে রোপণ করলে উন্নতমানের বাসক উৎপাদন করা যায়। কাটিংয়ের জন্য অপেক্ষাকৃত শক্ত কাণ্ড কেটে নির্দিষ্ট স্থানে রোপণ করতে হয়। কাণ্ডের দৈর্ঘ্য ৯ থেকে ১০ ইঞ্চি হওয়া দরকার। পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা করা গেলে বছরের যে কোন সময় রোপণ করা যায়। বীজ থেকে চারা তৈরি করেও এর চাষ করা যায়। বীজ থেকে চারা তৈরির জন্য বর্ষার শুরুতে বীজতলায় বীজ বপন করতে হয়। চারার বয়স ৩ থেকে ৪ মাস হলে তা উপযুক্ত জায়গায় রোপণ করতে হয়।

লাগানোর দূরত্ব : ৩ থেকে ৬ ফুট দূরত্বে লাগানো যায়।

উপযোগী মাটি : আমাদের দেশের আবহাওয়া ও সব ধরনের মাটিতে বাসক জন্মে তবে বেলে মাটিতে ভাল হয়।

বীজ আহরণ : জুলাই-আগস্ট মাসে পরিপক্ব ফল সংগ্রহ করে তা রোদে শুকিয়ে বীজ আলাদা করে আহরণ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ১৩৫,০০০ থেকে ১৪০,০০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বাসক পাতা কাঁচা ব্যবহারেই উত্তম। পাতা ভালভাবে পরিষ্কার করে ছোট ছোট করে কেটে রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করা যায় এবং এক বছর ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে পাতা বাদামি রঙ ধারণ করা পর্যন্ত শুকিয়ে নিতে হবে। রৌদ্রে শুকাবার সময় কোনরকম ধুলাবালি যেন না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রয়োজনমতো পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা, ফুল, ছাল ও মূল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : বাসক সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে বলা হয়েছে যতোদিন বাসক পৃথিবীতে থাকবে ততদিন ক্ষয়-কাশ রোগীকে আর নিরাশ হতে হবে না।' পুরনো হাঁপানি ও সর্দিজনিত পীড়ায় একটি অত্যন্ত ফলপ্রদ ঔষধ।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- পাতাসিদ্ধ পানি পান করলে বসন্ত সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।
- কাশির জন্য বাসক অত্যন্ত ফলপ্রদ। মিশ্রী ও গোলমরিচের সংগে বাসক পাতার রস অথবা বাসকসিদ্ধ পানি মিশিয়ে পান করলে সব ধরনের কাশি ভালো হয়।
- বাসকের পাতা শুকিয়ে বিড়ি বানিয়ে অথবা তামাকের মতো পান করলে শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানি দূর হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৬ থেকে ৭ মাসে বাসক ব্যবহার উপযোগী হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : সাধারণত বাসকের পাতা জৈবসার এবং রঙ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক হিসেবে ফল ব্যবহার হয়। বাসক পাতা কুচি কুচি করে কেটে পানিতে মিশালে পানির জীবাণু মারা যায় এবং পানি বিশুদ্ধ হয়।

চাহিদা : শিল্পক্ষেত্রে চাহিদা বার্ষিক ৩,৬০,০০০ কেজি এবং ঔষধ শিল্পে বার্ষিক ৬০,০০,০০০ কেজি।

আয় : এক একর জমিতে বাণিজ্যিক চাষে ৬০-৭০ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব।

৬৮. বিছুটি/আলকুশী

সংস্কৃত নাম : কপিকাচ্ছু
Botanical Name : *Tragia involucrata Linn.*
Common Name : *Bichuti, Alkushi*
English Name : *Stinging Nettle*
Family : *Euphorbiaceae*

পরিচিতি : বিছুটি আলকুশি বৃক্ষারোহী বর্ষজীবী লতা। কখনও কখনও অনেক বছর বাঁচতে দেখা যায়। অতিশয় ঘন শাখা বিশিষ্ট, প্রায় ৫-১০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। পাতা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশ সরু, উভয় দিকে পশমের মতো লালচে বাদামি বর্ণের লোম আছে। পাতার কিনারা করাতের দাঁতের মতো কাঁটাযুক্ত। পুষ্পদণ্ড খাড়া ও অনেক ফুল হয়। পাকা ফলে হুল জাতীয় আবরণ থাকে এবং হাত দিলে চুলকায় ও জ্বালা করে। লতার প্রত্যেক গাঁট থেকে ফুল বের হয়।

প্রাপ্তিস্থান : বিছুটি দেশের পতিত জমি ও বেড়ার ধারে এবং জঙ্গলে জন্মাতে দেখা যায়, তবে পার্বত্য অঞ্চলে বেশী দেখা যায়।

চাষাবাদ : অক্টোবর মাসে বিছুটির ফুল ও ফল দেখা যায়। বীজ থেকে চাষাবাদের জন্য সিমের মতো দেখতে ফল সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে ফল থেকে বীজ আলাদা করতে হয়। বর্ষার শুরুতে বীজ বপন করা ভালো।

লাগানোর দূরত্ব : ৪ থেকে ৬ ফুট দূরত্বে লাগানো যায়।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে বিছুটি জন্মে তবে বেলে বা দোআঁশ মাটিতে ভালো হয়।

বীজ আহরণ : বিছুটির ফল দেখতে অনেকটা সিমের মতো। চৈত্র মাসে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। ফল সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে ফল থেকে বীজ আলাদা করে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ৮০০-১০০০০।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : ফেব্রুয়ারি মাসে বীজ পাকলে সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : মূল, বীজ ও পাতা ব্যবহার হয়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : ফোড়া দ্রুত পেকে যেতে সাহায্য করে, বায়ু ও কফ পরিষ্কারে কার্যকরী। এছাড়া জ্বর ও স্নায়বিক দুর্বলতায় বিছুটি ব্যবহার করা যায়।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- বিছুটি ফল বেটে ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া দ্রুত পেকে যায়।
- রক্ত দূষিত হলে বিছুটির ক্বাথ সিদ্ধ করে এক ছটাক পরিমাণ দিনে দু'বার খেলে রক্তদোষ ভাল হয়।
- বিছুটির বীজ অত্যন্ত শুক্রবর্ধক।
- ইন্দ্রিয় শৈথিল্যে এক চা চামচ পরিমাণ বিছুটির বীজ গুড়া, দুধ ও চিনিসহ গরম করে একমাস খেলে শিথিল ইন্দ্রিয় দৃঢ় ও কার্যক্ষম হয়।
- নারীর যোনিতে কোন আঘাত লাগলে, বিছুটির মূল পানিসহ সিদ্ধ করে সেই সিদ্ধ করা পানিতে পরিষ্কার কাপড় ভিজিয়ে সহ্য করার মতো গরম অবস্থায় যোনিতে সেক দিলে আঘাতজনিত যন্ত্রণা দূর হয়। এভাবে এক সপ্তাহ সেক দিতে হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : অপরিপক্ব বিছুটির গাছ গরু ছাগলের খাদ্য।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৫ ৬ মাসে বিছুটি পরিপক্ব হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে ২০,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৬৯. বিষকাঁটালি

Botanical Name : *Polygonum hydropiper L.*
Common Name : *Biskatali*
English Name : *Water pepper*
Family : *Polygonaceae*

পরিচিতি : অনেক শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বিরুৎ উদ্ভিদ। ডোবা বা জলাশয়ের ধারে জন্মে থাকে। পাতা একক, সম্পূর্ণ সূক্ষ্মাগ্র। এটি যেখানে জন্মে সেখানে খুব ঘন সন্নিবেশিতভাবে থাকে। কাণ্ডের নিচের অংশ তখন পর্ব থেকে শিকড় বের করে মাটির সাথে সংলগ্ন হয়ে থাকে। বীজ কালো, গোড়ার দিক অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। ভারত এর আদি বাসস্থান।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের আনাচেকানাচে, ডোবা-নালা, খাল-বিলের ধারে পাওয়া যায়।
চাষাবাদ : প্রাকৃতিকভাবে জন্মে থাকে। নভেম্বর মাসে বীজ আহরণ করা যায়। বীজ বপনের মাধ্যমে বংশবিস্তার হয়।
বীজ আহরণ : বীজ পেকে কালো রঙ ধারণ করলে আহরণ করতে হয়।
লাগানোর দূরত্ব : ধান ও পাটের বীজের মতো বপন করলেই চলে।
উপযোগী মাটি : স্যাঁতসেঁতে কর্দমাক্ত মাটিতে ভাল জন্মে।
প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ২৫,০০০-৩০,০০০ পর্যন্ত বীজ হয়।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সাধারণত কাঁচা অবস্থায় ব্যবহৃত হয়।
ব্যবহার্য অংশ : সম্পূর্ণ উদ্ভিদ।
উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : বিষকাঁটালি ভেষজ গুণে সমৃদ্ধ। পাতার রস রক্তপাত বন্ধ করে। রক্তক্ষরণ ও রক্ত আমাশয়ে উপকারী। বিষকাঁটালি শব্দের অর্থ যা বিষ বা আঘাত নষ্ট করে। ফোড়া ফাটানোর জন্য এ গাছটি ব্যবহার হয়ে থাকে। বর্ষাকালে খোলা পায়ে অধিক চলাফেরা করলে, পায়ে আঙুলের চিপায় ঘা হলে এ গাছ বাটা লাগিয়ে দিলে অতি সহজেই আরোগ্য হয়।
কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- পাতার রস ১-২ চা চামচ খেলে রক্ত বমি ও আমাশয়ে উপকার পাওয়া যায়।
- কেটে গেলে পাতার রস ব্যবহার করা হয়।
- তিন বছরের নিচের শিশুদের ও গর্ভবতী মায়েদের খাওয়া নিষেধ।
- গরুর শরীরে উকুন হলে শোয়ার জায়গায় বিষকাঁটালি বিছিয়ে দিলে উকুন দূরীভূত হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : পশুখাদ্য হিসেবে বিষকাঁটালির প্রচলন রয়েছে।
পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : নয় মাস।
আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৭০. বেল

সংস্কৃত নাম : বিল্ব
Botanical Name : *Aegle marmelos (L.) Corr. (Ruta).*
Common Name : *Bel*
English Name : *Wood Apple, Bengal Quince.*
Family : *Rutaceae*

পরিচিতি : আমাদের দেশে বেল একটি পরিচিত ফল। বেল গাছ ২০ থেকে ৩৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এর পাতা ত্রিপত্রযুক্ত। পাতার গোড়ার দিকে সোজা শক্ত কাঁটা থাকে এবং গ্রীষ্মকালে পাতা ঝরে যায়। ফল শক্ত খোলবিশিষ্ট এবং এর জনপ্রিয়তা রয়েছে। ফুল হাল্কা সবুজ বর্ণের ছোট বোঁটায় হয়। ফল গোলাকার এবং ভিতরে ৮ থেকে ১০টি বিভাগ থাকে। বীজ অনেকগুলো সাদা বর্ণের আঠা জাতীয় পদার্থের মধ্যে থাকে। মে মাসে ফুল হয় এবং ফল পরের বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে পাকে।

রাসায়নিক উপাদান : ফলে, প্রচুর শর্করা দ্রব্য, উদ্বায়ী তেল, অ্যালকোহল, ট্যানিন, প্রোটিন, খনিজ লবণ ও বিভিন্ন ভিটামিন বিদ্যমান।

প্রাপ্তিস্থান : বেল বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জন্মায়। বাংলাদেশের প্রায় সব নার্সারিতে বেলের চারা পাওয়া যায়। বেল গাছের প্রায় কুড়ি ধরনের জাত আমাদের দেশে আছে। এ কারণে বেল গাছের চারা সংগ্রহের সময় কাঙ্ক্ষিত প্রজাতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। মাটিতে বীজ বুনে বেল গাছের বংশ বৃদ্ধি সম্ভব।

চাষাবাদ : বাংলাদেশে সব জেলাতেই এই গাছ দেখা যায়। এপ্রিল-মে মাসের দিকে ফুল দেখা দেয়। ফল পাকার পরপরই আবার ফুল ফোটে। বীজ হতে চারা তৈরির মাধ্যমে বংশবিস্তার করা যায়। এপ্রিল-মে মাসে বীজ সংগ্রহ করে ৫-৬ ঘণ্টা রোদে শুকিয়ে ১০-১৫ দিন স্বাভাবিকভাবে সংরক্ষণ করা যায়। বীজকে ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে মাটি ও গোবর (৩ ঃ ১) মিশ্রিত বীজতলায় বপন করলে ৫৮% বীজ অংকুরিত হয়। ৩-৪ মাস বয়সের চারা লাগানোর উপযুক্ত হয়। তবে ১ বছর বয়সী চারা লাগানো উত্তম।

লাগানোর দূরত্ব : ১০-১৫ ফুট পর পর চারা লাগাতে হবে।

উপযোগী মাটি : অপেক্ষাকৃত ভিজা মাটিতে বেল গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। তবে সব ধরনের মাটিতে এর চাষ করা যেতে পারে। পানির *PH 6.5* সবচেয়ে উত্তম।

বীজ আহরণ : এপ্রিল-মে মাসে ফুল হয় এবং পরের বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে ফল পাকে। এপ্রিল-মে মাসে বীজ সংগ্রহ করে ৫-৬ ঘণ্টা রোদে শুকিয়ে ১০-১৫ দিন স্বাভাবিকভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ৫,০০০-৫,৫০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বীজ সংগ্রহ করে ৫-৬ ঘণ্টা রোদে শুকিয়ে ১০-১৫ দিন স্বাভাবিকভাবে সংরক্ষণ করা যায়। পাকা বেল কোল্ড স্টোরেজে ৬ মাস পর্যন্ত এবং স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ১০-২০ দিন পর্যন্ত রাখা যায়। কাঁচা বেল সব সময়ই গাছে পাওয়া যায়। কচি বেলের শাঁস রৌদ্রে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। মূলের ছাল, পাতা ও ফুল একইভাবে সংরক্ষণ করা যায়। তবে শুকনো দ্রব্য অর্দ্র জায়গায় রাখা যাবে না।

ব্যবহার্য অংশ : বেল ফল, কচি ফলের শাঁস, মূলের ছাল, পাতা ও ফুল ব্যবহার হয়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : বেল শাঁস মস্তিষ্ক, পাকস্থালী, হৃৎপিণ্ড ও যকৃতের শক্তিবর্ধক। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বেলপাতা ব্যবহৃত হয়। বেলপাতার রস আরও কয়েকটি ঔষধি উপাদানের সঙ্গে যোগ করে জণ্ডিস, আমাশয়, শ্বাসকষ্টের ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বেল পাতার ছাই নিমের মতোই একটি উত্তম দাঁতের মাজন। এ মাজন মুখের গন্ধ দূর করতে ও দাঁতের মাড়ি সবল রাখতে সাহায্য করে। বেল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় শরবত প্রস্তুতিতে। বেলপাতা সর্দি ও সর্দিজ্বরে উপকারী। বেল ফুল পিপাসা, বমি ও পাতলা পায়খানায় উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

০ বেল গাছের ছালের রস ২৫ গ্রাম দুধ ও জিরাসহ খেলে শুক্রমেহ রোগে আরাম হয়। বেলের শিকড় সাপের বিষ প্রতিষেধক।

- আমাশয়ে : কাঁচা বেল আগুনে পুড়িয়ে আখের গুড়সহ খেলে আমাশয় ও অম্বাধিক্য ভাল হয়।
- পেটের অসুখে : কাঁচা বেল পোড়া অত্যন্ত উপকারী। কাঁচা বেল পোড়া খেলে পাতলা দাস্ত বন্ধ হয়।
- বদহজমে : হজমশক্তি কম হলে কাঁচা বেল পোড়া খেলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়।
- ঘামজনিত দুর্গন্ধে : বেল পাতার রস গায়ে মাখলে দুর্গন্ধ দূর হয়।
- সর্দিতে : কাঁচা বেল খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।
- অরুচিতে : কচি বেল পোড়া খেলে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়।
- ভুল বকা : বেলপাতা পিষে মাথায় প্রলেপ দিলে ভুল বকা বন্ধ হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৪-৫ বছরে বেল গাছ পরিপক্ব হয় তবে পূর্ণাঙ্গ পরিপক্ব হতে ১০ বছর সময় প্রয়োজন।

অন্যান্য ব্যবহার : কচি বেল শুঁঠ আয়ুর্বেদীয় ঔষধে প্রচুর পরিমাণ ব্যবহার হয়। বেলের শরবত আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয়।

আয় : বেল চাষ বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক। একটি প্রাপ্তবয়স্ক গাছে ২০০-৫০০টি ফল পাওয়া যায়, যার বাজার মূল্য প্রায় ২৫০০ টাকা।

৭১. ভেরেন্ডা

সংস্কৃত নাম : এরেন্ডা
Botanical Name : *Ricinus communis Linn.*
Common Name : *Verenda*
English Name : *Castor*
Family : *Euphorbiaceae*

পরিচিতি : ভেরেন্ডা ছোট গুল্ম জাতীয় গাছ। ১০ থেকে ১২ ফুট লম্বা হয়। শাখা-প্রশাখা এবং কান্ড ও পত্রদণ্ড নরম ও ভিতরে ফাঁপা। গাছের গায়ে সর্বত্র সাদা পাউডারের মতো পদার্থ থাকে। পাতাগুলো ছোট হলেও প্রায় আঙ্গুলসহ হাতের তালুর মতো। পাতার কাটা অংশ আছে প্রায় ৫ থেকে ৬ ইঞ্চি লম্বা। অগ্রভাগ ক্রমশ সরু। পাতার বোঁটা ফাঁপা ও ৪ থেকে ১২ ইঞ্চি লম্বা হয়। পুষ্পদন্ড মোটা ও শাখা-প্রশাখায় এক বছরের মধ্যে ফুল ও ফল হয়। সাধারণত কাণ্ডের অগ্রভাগে পুষ্পদণ্ডের চারিদিকে গোল হয়ে ছোট ছোট হলুদ ফুল হয়। ফল ত্রিকোষযুক্ত। ফলের গায়ে নরম কাঁটা হয়। ফল পাকলে বীজ ফেটে যায়। বীজের শক্ত আবরণে সাদা সাদা ডোরা দাগ থাকে। নভেম্বর ফুল মার্চ মাসে ফল বীজ পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র আবর্জনাপূর্ণ জায়গায়, পতিত জমিতে, রাস্তার ও রেললাইনের ধারে ভেরেন্ডার ঝাড় বেশি দেখা যায়।

চাষাবাদ : বীজ থেকে চারা হয়। সারা বছর চারা তৈরি করা যায়, তবে জুলাই-আগস্ট মাসে অর্থাৎ বর্ষা মৌসুমে চারা তৈরির জন্য বীজ বপন করা ভালো।

লাগানোর দূরত্ব : ৫ থেকে ৭ ফুট।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে ভেরেন্ডা জন্মে থাকে।

বীজ আহরণ : মার্চ মাসে পরিপক্ক ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করে রোদে শুকালে ফল ফেটে তা থেকে বীজ বেরিয়ে আসে।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৩-৪ শত।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : পরিপক্ক ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করে রোদে শুকালে ফল ফেটে তা থেকে বীজ বেরিয়ে আসে। অতঃপর প্যাকেটিং করে বীজ সংরক্ষণ করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ : ভেরেন্ডার শিকড়, পাতা, ফল এবং তেল

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : ভেরেন্ডা জোলাপ হিসাবে বিশেষ কার্যকরী। ভেরেন্ডা সর্দি, কাশি, হাঁপানি, শোথ, মুখ ব্যাকা ইত্যাদিতে উপকারী। ভেরেন্ডা বীজ মূত্র প্রবাহক, কৃমি নিষ্কাশক এবং সন্তান প্রসবে সহায়ক। ফোলা, বাত, সন্ধিবাত ইত্যাদিতে বিশেষ উপকারী। নিয়মিত ভেরেন্ডা পাতার প্রলেপ চুলের গোড়ায় দিলে চুল পড়া বন্ধ করে, চুল দৃঢ় ও ঘন বৃদ্ধি করে। ভেরেন্ডা তেল পেট ফাঁপা, কোষ্ঠ, শূল, বাত, দুর্বলতাজনিত রোগ, বাতপ্রদাহ, গনোরিয়া এবং জোলাপ হিসাবে ব্যবহার হয়

কোন অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- ছোট বাচ্চাদের মাথায় বা পেটফাঁপায় ভেরেন্ডা পাতার প্রলেপ বিশেষ উপকারী।
- পাতার রস সিদ্ধ করে খেলে মাথার যন্ত্রণা কমে যায়।
- মূল ভালো করে পরিষ্কার করে সিদ্ধ করে সেই পানি খেলে প্রস্রাব বৃদ্ধি পায় ও পরিষ্কার হয়
- ২/৪ চা চামচ ভেরেন্ডার মূলের রস পানির সাথে মিশিয়ে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যে আরাম হয়।
- ১ চা চামচ কচি পাতা এক গ্লাস পানিতে সিদ্ধ করে ছেঁকে খেলে অম্লরোগে আরাম হয়

পরিপক্ক হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ১ বছরেই ভেরেন্ডা গাছে ফুল ও ফল হয়

অন্যান্য ব্যবহার : ভেরেন্ডার বীজে প্রায় ৪৫ ভাগ তেল থাকে। তেল প্রসাধনী, লুব্রিকেন্ট, মোমবাতি, সাবান বানাতে ও [illegible] ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ৩০,০০০ টাকা থেকে ৩৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা যেতে পারে।

৭২. ভূঁইকুমড়া

সংস্কৃত নাম : স্বাদুকন্দ, ভূকুষ্মাণ্ড

Botanical Name : *Ipomoea mauritiana Jacq.*
Common Name : *Bhuikumra*
English Name : *Not known*
Family : *Convolvulaceae*

পরিচিতি : ভূঁইকুমড়া বৃহদারোহী লতা জাতীয় গুল্ম। পাতা ২ থেকে ৬ ইঞ্চি লম্বা, হাতের পাঞ্জার মতো ৫ থেকে ৭ ভাগে বিভক্ত থাকে। ফুল ফানেলাকার কলমি ফুলের মতো লাল এবং বেগুনি বর্ণের। ফল ছোট ছোট গোলাকার সবুজ বর্ণের। কন্দ বেশি পুরনো হলে ২০ কেজি পর্যন্ত দেখা যায়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূঁইকুমড়া জন্মে।
চাষাবাদ : সাধারণত কন্দের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে।
লাগানোর দূরত্ব : ১ থেকে ৩ ফুট।
উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতেই ভূঁইকুমড়া জন্মে।
বীজ আহরণ : আগস্ট মাসে কন্দ সংগ্রহ করে ঠাণ্ডা ছায়াযুক্ত জায়গায় রেখে দিলে জানুয়ারি মাসে চারা গজায়; তখন রোপণ করতে হয়।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সাধারণত কাঁচা কিংবা শুকনো অবস্থায় ভূঁইকুমড়ার কন্দ ব্যবহার করা হয়।
ব্যবহার্য অংশ : কন্দ।
উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : ভূঁইকুমড়া যৌনশক্তি বর্ধক ও বীর্য গাঢ়কারক হিসাবে বিশেষ কার্যকরী। এছাড়াও বলকারক, রসায়ন ও বাজীকরণ। বীর্যবর্ধক ও স্নিগ্ধকারক এবং পুষ্টিকারক ও স্তন্যদুগ্ধ বর্ধক। মূত্রকারক, বর্ণপ্রসাদক ও জীবনীশক্তি বর্ধক। জ্বর, পিত্তজ্বর ও দাহনিবারক। প্লীহা ও লিভার রোগে উপকারী এবং বিবেচক।
কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- ভূঁইকুমড়া চূর্ণ অতিরিক্ত ঋতুস্রাব বন্ধকারক এবং স্ত্রী ও পুরুষের যৌনশক্তি বৃদ্ধিকারক।
- ভূঁইকুমড়া, গম, বার্লি, দুধ, ঘি, চিনি এবং মধু দিয়ে সন্দেহ তৈরি করে খেলে দুর্বলতা কমে যায়।
- ভূঁইকুমড়া শালপানি, গোক্ষুর, আপাং, অনন্তমূল, পুনর্নবা ও বৃহতী চূর্ণ করে ১২ আউন্স মাত্রায় দিনে ২ বার খেলে জ্বর ও কাশিতে উপকার হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : ভূঁইকুমড়া পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে।
পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ১ বছর হতে ৩ বছরে পরিপক্ব হয়।
আয় : প্রতি একর জমিতে চাষ করে ৬০,০০০ টাকা থেকে ৯০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৭৩. ভৃঙ্গরাজ

সংস্কৃত নাম : ভৃংগরা
Botanical Name : *Wedelia chinensis (Osb.) Merr.*
Common Name : *Bhringraj*
English Name : *Trailing Eclipta*
Family : *Compositae*

পরিচিতি : ভৃঙ্গরাজ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড ৬ থেকে ৯ ইঞ্চি লম্বা হয়। কাণ্ডের নিচের গাঁটে শিকড় হয় এবং পাতা ১ থেকে ২ ইঞ্চি লম্বাকৃতি যার অগ্রভাগ সরু এবং কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়, দু'দিকে সাদা বর্ণের লোমযুক্ত। গাছের অগ্রভাগে এক একটি পীতবর্ণের ফুল হয়। ফুলের পাপড়ি কর্তিত ও লোমযুক্ত। বর্ষাকালে

ফুল ও শরৎকালে ফল হয়। আমাদের দেশে চার প্রজাতির ভৃঙ্গরাজ দেখা যায়। একটির ফুল হলুদ, অপরটির ফুল নীল, অন্যটির সাদা এবং একটির ডাঁটা একটু কালচে।

প্রাপ্তিস্থান : ভৃঙ্গরাজ বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্র নদীর কিনারায়, খাল ও পুকুরের ধারে নরম মাটিতে ভৃঙ্গরাজ ভালো জন্মে। বিশেষ করে ঢাকা, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলাসমূহে বেশি জন্মে।

চাষাবাদ : ভৃঙ্গরাজের চাষ করা খুব সহজ। এর অঙ্গজ জননই সহজ। নরম ও আর্দ্র মাটিতে শিকড় বা শিকড় ছাড়া লতা লাগালেই নতুন গাছ জন্মে। তবে এটির যত্ন নিতে হয়।

লাগানোর দূরত্ব : ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি।

উপযোগী মাটি : নরম ও আর্দ্র মাটি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : ভৃঙ্গরাজ সাধারণত কাঁচা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ব্যবহার্য অংশ : সম্পূর্ণ গাছ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : ভৃঙ্গরাজ পাতা পাকা চুল রঙ করতে এবং চুল বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবহার হয়। ভৃঙ্গরাজ বীজ, ফুল ও পাতার ক্বাথ বক্ষরোগের আক্রমণ নিবারণ করে। ভৃঙ্গরাজ সর্দি, শির, শূল, ইন্দ্রলুপ্ত ও চর্মরোগ নিবারক। ভৃঙ্গরাজ প্লীহা রোগ ও কাশিতে উপকারী। ভৃঙ্গরাজ পাতার রস নিয়মিত পান করলে চোখের জ্যোতি ও রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- ভৃঙ্গরাজ পাতার রস দ্বারা কুলি করলে দাঁতের ব্যথা ও মুখের রোগ দূর হয় এবং চোখে দিলে চোখ ওঠা নিবারণ হয়।
- পাতা বাটা প্রলেপ দিলে সকল প্রকার দাদ ও চর্মরোগে উপকার পাওয়া যায়।
- কালো ভৃঙ্গরাজ রস পান করলে এবং মাথায় ব্যবহার করলে চুল কালো হয় এবং পাতার রস মাথায় মাখলে উকুন মরে যায়।
- পাতার রস ১৫ গ্রাম সমান লবণসহ খেলে তৎক্ষণাৎ শূলের ব্যথা ও পেটের ব্যথা দূর হয় এবং পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি পায়।
- সূর্যোদয়ের পরে অনেকের মাথাব্যথা হয় (শিরোরোগ) বা অর্ধকপালে ব্যথা হয় (সাইনোসাইটিস); সে ক্ষেত্রে ভৃঙ্গরাজের পাতা গুঁড়ার নস্য নিলে বা পাতার রস মাথায় মাখলে উপশম হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৬ থেকে ৮ মাসে ভৃঙ্গরাজ ব্যবহার উপযোগী হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে ৪০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা।

৭৪. মেহগনি

Botanical Name : *Swietenia mahagoni (L.) Jacq.*
Common Name : *Mehagini, Mehogoni*
English Name : *Mehgani*
Family : *Meliaceae*

পরিচিতি : মেহগনি বিরাটাকৃতির পাতাঝরা বৃক্ষ। সাধারণত ৪০-৯০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। এর কাণ্ড সরল, উন্নত গাঢ় ধূসর, পরিপক্ব গাছের কাণ্ড প্রায় কালো রঙের কাছাকাছি। পাতা পক্ষল যৌগিক, ফুল ক্ষুদ্র ও আকর্ষণহীন। ঘন বিন্যস্ত পাতার জন্য গাছটি সুদৃশ্য এবং ছায়াতরু হিসেবে রাস্তার পাশে রোপণের জন্য একটি উত্তম বৃক্ষ। এপ্রিল মাসে গাছের পাতা ঝরে যায়, খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে গাছ পুনরায় সবুজ পাতায় ভরে ওঠে। মেহগনির ফুল আকর্ষণহীন, ফল প্রায় গোলাকৃতি ও ধূসর বর্ণের। বীজ থেকে চারা জন্মে সহজেই এবং এর বৃদ্ধিও দ্রুত। কাঠের মূল্যে মেহগনি পৃথিবীর অভিজাত গাছের অন্যতম। বাংলাদেশে দুটি প্রজাতির মেহগনি বেশি দেখা যায়। এর মধ্যে *S. mahogoni.* চেনার সহজ উপায় হলো এর পাতা ছোট এবং কাঠ খুবই মূল্যবান। *S. macrophylla King*-এর পাতা অপেক্ষাকৃত বড়। বড় পাতার মেহগনিকে বলা হয় *Hoinduras* বা *Mexican Mahogony* এবং ছোট পাতার মেহগনিকে বলা হয় *Common Mahogony*. উভয় প্রজাতির আদি বাসস্থান জ্যামাইকা, হন্ডুরাস, মেক্সিকো ও কিউবা।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের সব অঞ্চলে রাস্তার পাশে মেহগনি দেখা যায়। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে মেহগনির চাষ হচ্ছে। পাহাড় ও টিলা অঞ্চলে মেহগনি ভালো হয়।

চাষাবাদ : বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে কাঠের জন্য মেহগনির চাষ হচ্ছে। পাহাড় ও টিলা অঞ্চলে মেহগনি ভাল জন্মে। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বীজ সংগ্রহ করা যায়। বীজের অংকুরোদগম হার প্রায় ৬০ ভাগ। ১৫ থেকে ২০ দিনে অংকুরোদগম হয়। বীজতলায় বীজ বপন করে চারা ২ পাতা বিশিষ্ট হলে ব্যাগে স্থানান্তর করা উত্তম। ফেব্রুয়ারি মাসে ২-৩ বছরের চারা রোপণ করার জন্য ভালো।

লাগানোর দূরত্ব : ১৮ থেকে ২৭ ফুট।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে মেহগনি গাছ জন্মে। তবে বেলে-দোআঁশ মাটিতে ভালো জন্মে।

বীজ আহরণ : গাছ থেকে পাকা ফল সংগ্রহ করে কয়েক দিন রোদে রাখলে আবরণ ফেটে ফল থেকে বীজ বেরিয়ে আসে। একটি ফলে ৪০ থেকে ৬০টি বীজ পাওয়া যায়। বীজ রোদে শুকিয়ে আলো বাতাস যুক্ত জায়গায় ১ থেকে ২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ২৫০০ থেকে ৩২০০।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : মেহগনি বীজের তেল *(Solvent Extract)* কাচের বোতলে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। গাছের ছাল ও পাতা রোদে শুকিয়ে পাউডার করে ২-৩ বছর সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : বীজ, পাতা ও ছাল।

উপকারীতা/লোকজ ব্যবহার : জ্বর জ্বর ভাব ও সর্দি-কাশিতে মেহগনির বীজ ও বাকল বেশ উপকারী। মধ্য আমেরিকাতে বাকল কুইনাইনের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চর্ম রোগ, একজিমা, উচ্চ রক্তচাপ এবং গনোরিয়াসহ বহুবিধ যৌন রোগ ও ডায়াবেটিসে ব্যবহার হয়।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- পাতার গুঁড়া পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করলে কীট বিতাড়ক হিসেবে কাজ করে।
- মেহগনি ছালের ইথানলিক নির্যাস মাউথ ওয়াশ এবং চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়।
- মেহগনি বীজের শাঁস ২৫ গ্রাম পরিমাণ প্রতিদিন খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে।
- এর কাঠ খুবই মূল্যবান এবং সহসা ঘুণে ধরে না।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৮-১০ বছরে মেহগনি গাছে ফল ধরে, তবে পরিপক্ব হতে ২০ থেকে ৩০ বছর সময় প্রয়োজন।

অন্যান্য ব্যবহার : মেহগনি কাঠের রঙ বাদামি, দানা মিহি। সহজেই পালিশ করা যায় এবং কাঠ টেকসই। এর কাঠ ঘরের কাজ, দরজা-জানালা, আসবাবপত্র তৈরি, জাহাজ ও এরোপ্লেনের নানা কাঠের কাজে ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর মূল্যবান কাঠের মধ্যে মেহগনি অন্যতম। মেহগনির বীজের তেল উন্নত জৈব কীটনাশক ও খৈল সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

আয় : একটি পরিপূর্ণ মেহগনি গাছ থেকে বছরে প্রায় ২০ কেজি বীজ পাওয়া যায়, যার বাজার মূল্য প্রায় ৪,০০০ টাকা। এছাড়া পরিপক্ব একটি মেহগনি গাছ ৩০ হাজার থেকে ১,২০,০০০ টাকায় বিক্রি করা সম্ভব।

৭৫. মেথি

সংস্কৃত নাম : মেথিকা
Botanical Name : Trigonella foenum-graceum Linn.
Common Name : Methi
English Name : Fenugreek
Family : Liguminosae

পরিচিতি : মেথি বর্ষজীবী। ১ থেকে দেড় ফুট লম্বা সূক্ষ্ম লোমযুক্ত এবং ঝোপ গুল্ম জাতীয় গাছ। পাতা ছোট, একই বৃন্তে তিনটি করে থাকে এবং অগ্রভাগ কাটা কাটা ও তিনটি অংশে বিভক্ত। ফুল ১-২টি একত্রে পাতার গোড়া থেকে বের হয় এবং বেঁটা ছোট। ২-৩টি শুঁটি হয় এবং প্রত্যেক শুঁটিতে ১০ থেকে ১৫টি বীজ হয়। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বীজ বপন করা হয়। জানুয়ারি মাসে হলুদ আভাযুক্ত ফুল হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ফল হয়। মেথির বীজ ও গাছ ব্যবহার হয়।

প্রাপ্তিস্থান : মেথি বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে চাষ হয়। মেথির আদি জন্মস্থান ইউরোপ। পৃথিবীতে এর প্রায় ৫০টি প্রজাতি আছে। এর মধ্যে ভারতবর্ষে ৮টি প্রজাতি দেখা যায়।

চাষাবাদ : অক্টোবর-নভেম্বর মাসে জমিতে বীজ বুনে চাষ করা হয়।

লাগানোর দূরত্ব : জমিতে ছিটিয়ে মেথি চাষ করা হয়।

উপযোগী মাটি : বেলে বা দোআঁশ মাটিতে মেথি ভালো হয়।

বীজ আহরণ : ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে পরিপক্ব গাছ জমি থেকে সংগ্রহ করে তা শুকিয়ে মাড়াই করে বীজ আহরণ করা যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় দশ হাজার।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : মেথি পাতা কাঁচা অবস্থায় ও ফল শুকিয়ে মাড়াই করে বীজ এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা ও বীজ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগে এবং রক্তের কোলস্টেরল কমাতে মেথি বিশেষ কার্যকরী। এছাড়াও পিত্তজনিত রোগ ও চুল পড়া বন্ধ করে। মেথি গাছ ও বীজ রজঃ নিঃসারক এবং পুরাতন সর্দিনাশক। যকৃত ও প্লীহা বৃদ্ধিতে বিশেষ উপকারী। কাঁচা মেথি পাতা পোড়া ঘায়ে ও ফোড়ায় উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- ডায়াবেটিসে ১/২ চা চামচ মেথি বীজের গুঁড়া প্রতিদিন ২/৩ বার পানিসহ খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।
- মেথি ডাল রান্নাবান্নায় প্রচুর ব্যবহার দেখা যায় বিশেষ করে রংপুর, দিনাজপুর জেলাতে।
- উচ্চ রক্তচাপে ১/২ চা চামচ মেথি বীজের গুঁড়া প্রতিদিন ২/৩ বার পানিসহ খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- মেথি পাতা রান্না করে খেলে বাতের ব্যথা ভালো হয়।
- প্রসব পরবর্তী সমস্যায় ১ চা চামচ মেথি বীজ গুঁড়া প্রতিদিন ২/৩ বার পানিসহ খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ১ থেকে ২ মাসে মেথি পাতা ও ৪ থেকে ৫ মাসে বীজ সংগ্রহ করার উপযোগী হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : শাক হিসেবে মেথির চাহিদা রয়েছে।

আয় : প্রতি একর জমিতে বার্ষিক আয় আনুমানিক ২০,০০০ টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকা।

৭৬. মেহেদি

সংস্কৃত নাম : মাদায়ান্তিক
Botanical Name : *Lawsonia inermis Linn.*
Common Name : *Mendi*
English Name : *Samphire, Henna, Mehedi*
Family : *Lythraceae*

পরিচিতি : গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। সাধারণত ৫′–১০′ উঁচু হতে পারে। এর পাতা ০.৭৫″-১.৫″ লম্বা হয়ে থাকে। পত্রের অগ্রভাগ সরু, ফুল সুগন্ধযুক্ত ও শ্বেত বর্ণের ফল অনেকটা মটরের ন্যায়। এর ফুল ও ফল সারা বৎসর হয়।

রাসায়নিক উপাদান : পাতা ও ছালে অনুজীবধ্বংসী রঙিন ন্যাফথোকুইনোন দ্রব্য, প্রচুর পরিমাণ ট্যানিন, কিছু গ্লাইকোসাইড, স্টেরল ও টার্পিন বিদ্যমান।

প্রাপ্তিস্থান : আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া এর আদি নিবাস। তবে সুদীর্ঘকাল থেকে বাংলাদেশের সর্বত্র বাড়ির আঙ্গিনায় মেহেদি রোপিত হয়ে আসছে।

চাষাবাদ : ডাল ভেঙ্গে লাগালেই নতুন গাছ হিসেবে স্থায়ী হয়ে যায়। তবে কাটিং দিয়ে এর বংশবিস্তার করা হয়। অপেক্ষাকৃত শক্ত কাণ্ডকে কাটিং হিসাবে ব্যবহার করাই উত্তম। বছরের যে কোন সময় লাগানো যায়। তবে বর্ষাকালে কাটিং করে বীজতলায় লাগানো ভাল। কাটিং একটু কাত করে লাগাতে হবে। মূলসমেত কাটিং সরাসরি ক্ষেতে লাগানো যায় অথবা মাটি ও গোবর ৩ ঃ ১ অনুপাতে ভর্তি করে চটের ব্যাগ ও মাটির পটে কিছুদিন রেখে লাগানো যেতে পারে।

লাগানোর দূরত্ব : ৪ থেকে ৫ ফুট।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে মেহেদি চাষ করা যায়।

বীজ আহরণ : জুলাই মাসে প্রাপ্তবয়স্ক গাছে সাদা বা গোলাপী রঙের অজস্র ফুল আসে। ফল প্রায় একেই সংগে দেখা যায়। জুলাই-আগস্ট মাসে ফল পাকলে তা সংগ্রহ করে এর থেকে বীজ আহরণ করতে হয়। উল্লেখ্য বীজের চাইতে কাটিংয়ের মাধ্যমে বংশবিস্তার উত্তম।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ১০ লক্ষ।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : প্রায় মটর দানার মতো ধূসর ফলের ভিতর ছোট ছোট ৮৫-৯৫টি বীজ থাকে। কাটিংয়ের সাহায্যে নতুন চারা উত্তোলন সহজ বিধায় বীজ সংরক্ষণের প্রয়োজন পড়ে না।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : মেহেদি পচন বিরোধী চর্মরোগ, চুল ওঠা ও চুল পাকা রোধে কার্যকরী। শুক্রমেহ, চুলের খুশকি, শ্বেতপ্রদর, নখকুনী ও হাত-পায়ের হাজায়, মুখ ও গলক্ষতে উপকারী। এর ছাল পাতা, বীজ ও ফুল ব্যবহৃত হয়।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

০ চুল উঠে যাওয়া বা পেকে যাওয়া রোধে ১টি হরিতকী ও ১০/১২ গ্রাম মেহেদি পাতা একটু থেঁতো করে ২৫০ মি.গ্রা. পানিতে সিদ্ধ করে ৬০-৭০ মি.লি. থাকতে নামিয়ে ছেঁকে ঠাণ্ডা হলে মাথায় লাগালে উপকার পাওয়া যায়।

- শুক্রমেহ রোগে মেহেদি পাতার রস এক চা-চামচ দিনে দু'বার পানি বা দুধের সাথে একটু চিনি মিশিয়ে খেলে এক সপ্তাহের মধ্যে উপকার পাওয়া যায়।
- মুখ ও গলার ক্ষতে পাতাসিদ্ধ পানি মুখে কিছুক্ষণ রাখলে সেরে যায়।
- ঘেমে গিয়ে গায়ে দুর্গন্ধ হলে মেহেদি পাতা ও বেনামূলসিদ্ধ পানিতে গোসল করলে উপকার পাওয়া যায়।
- কানে পুঁজ হলে মেহেদি পাতার রস ২ ফোঁটা করে কানে দিলে ৪/৫ দিনে পুঁজ পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ১ থেকে ২ বছরের গাছ থেকে পাতা সংগ্রহ করা যায়।

অন্যান্য ব্যবহার : ঔষধ ছাড়াও প্রসাধনে মেহেদির খ্যাতি আজ শুধু প্রাচ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বাংলাদেশ-ভারতসহ সুদূর ইউরোপেও আজকাল প্রসাধনী হিসেবে এর কদর রয়েছে। পাতা-পায়ে বৈচিত্রময় আল্পনা তৈরিতে ও মাথার চুল রাঙাতে ব্যবহৃত হয় মেহেদি। মেহেদির ফুল থেকে এক প্রকার তেল পাওয়া যায় যা থেকে সুরভি প্রস্তুত করা যেতে পারে। বাগানের জন্য সুন্দর বেড় দেয়ার কাজে মেহেদি গাছ ব্যবহার করা যেতে পারে।

আয় : প্রতি একর জমিতে ৮০,০০০ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকা।

৭৭. মুথা

সংস্কৃত নাম : মুস্তা
Botanical Name : *Cyperus rotundus Linn.*
Common Name : *Mutha*
English Name : *Nut grass*
Family : *Cyperaceae*

পরিচিতি : মুথা এক জাতীয় ঘাস। গ্রামাঞ্চলে এটি ভাদলা মুথা নামেও পরিচিত। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র এটি দেখা যায়। দূর্বাঘাসের পাতা থেকে এর পাতা একটু চওড়া। এটি বর্ষজীবী উদ্ভিদ। মূলে সরু সরু শিকড় আছে। পুষ্পদণ্ড গাছের আগা থেকে বের হয়। ফুল দেখতে ফিকে অথবা লালচে আভাযুক্ত ধূসর বর্ণ ও অতিশয় নরম। ফল লম্বা আকৃতির। ফুল ও ফল প্রায় সারা বছরই দেখা যায়। তবে বর্ষায় বেশি হয়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।

চাষাবাদ : মূল থেকে মুকুল বের হয়ে নতুন গাছ জন্মে।

লাগানোর দূরত্ব : ধান গমের মতো ছিটিয়ে বুনতে হয়।

বীজ আহরণ : কন্দ থেকে হয়। বীজ এবং কন্দ মার্চ-এপ্রিল মাসে আহরণ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ২-৩ হাজার।

উপযোগী মাটি : বালিপ্রধান স্যাঁতসেঁতে জমিতে ভালো জন্মে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : মুথায় সাধারণত কন্দ ব্যবহার হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে কন্দ সংগ্রহ করে পরিষ্কার করে অল্প রোদে শুকিয়ে চটের বস্তায় সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : মূল ও পাতা।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : আমাশয়, ঘা, জ্বর ও পাইওরিয়ায় উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- আমাশয়ে ৪/৫ গ্রাম কাঁচা মুথা একটু থেঁতো করে ৪ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে ৪/৫ বার খেতে হবে।
- মাতাল হলে বা মদের নেশা বেশি হলে মুথাসিদ্ধ পানি খাওয়ালে নেশা কেটে যায়।
- কোন কিছুর খোঁচা লেগে ঘা হলে মুথা বাটা লাগালে ২/১ দিনের মধ্যে যন্ত্রণা উপশম হয়।
- পাইওরিয়ায় মুথার রস করে অল্প জল মিশিয়ে খানিকক্ষণ মুখে রেখে দিলে সেরে যায়।
- মাছ শিকারের জন্যও মুথা ব্যবহার করা হয়।
- মুথাসিদ্ধ পানি একটু একটু করে খেলে জ্বর ও পিপাসা দুই-ই যায়।

অন্যান্য ব্যবহার : মুথার কন্দতে এক ধরনের তেল থাকে যা সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৯ মাস।

আয় : প্রতি একর জমিতে ২০,০০০ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকা।

৭৮. মুন্ডি/ছাগলনাদী

Botanical Name : *Sphaeranthus indicus Linn.*
Common Name : *Chagol Nadi, Mundi*
English Name : *Globe-thistle*
Family : *Compositae*

পরিচিতি : মুন্ডি/ছাগলনাদী ছোট আকৃতির বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। দেশের প্রায় সব জায়গায় এটি ধান বা কালাই ক্ষেতে জন্মে। সাধারণত ১২ ইঞ্চির মতো উঁচু হয়ে থাকে। শাখাগুলি বিস্তৃত, পাতার কিনারা করাতের ন্যায় খাঁজকাটা। কাণ্ড গোলাকার। পাতা ডিম্বাকৃতি, উভয়দিকে লোমযুক্ত, বোঁটা ছোট। ফুল বেগুনি রঙের, ফল মসৃণ। শীত গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই ফুল ও ফল হয়। ভারত ও মালয়েশিয়া এর আদি বাসস্থান।

প্রাপ্তিস্থান : দেশের সব জায়গায় এটি জন্মে তবে ঢাকা ও রাজশাহীতে বেশি জন্মে।

চাষাবাদ : বীজ থেকে বংশ বৃদ্ধি হয়।

লাগানোর দূরত্ব : ৬ ইঞ্চি। ধান গমের মতো ক্ষেতে ছিটিয়ে বুনা যায়।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে এটি জন্মে থাকে তবে বেলে বা দোআঁশ মাটিতে বেশি জন্মে।

বীজ আহরণ : এপ্রিল-মে মাসে বীজ আহরণ করা যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : লক্ষাধিক।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বীজ সংগ্রহ করে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে শুষ্ক স্থানে বেশ কিছুদিন সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : ফুল, পাতা, মূল ও ফল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : বীজ ও শিকড় কৃমিনাশক। শিকড়ের ছাল ঘোলের সাথে খেলে অর্শরোগ সেরে যায়। ছাগলনাদীর রস প্রতিদিন খেলে চুল পড়া বন্ধ হয় ও চুল দেরিতে পাকে। এর ফুল স্নিগ্ধকর, বলকারক ও জ্বরনাশক। তাছাড়াও এর রস দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি বৃদ্ধি করে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- প্রোস্টেট গ্লান্ডের বৃদ্ধিতে এর ফুলের গুঁড়া ৫-৭ গ্রাম এক কাপ ফুটন্ত পানিতে মিশিয়ে ছেঁকে নিয়ে নির্যাসটুকু দিনে দুইবার খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- স্নায়বিক দুর্বলতায় এর পাতা ২-৩ গ্রাম এক কাপ ফুটন্ত গরম পানিতে মিশিয়ে ছেঁকে নিয়ে দিনে দুইবার খেতে হবে।
- পাকস্থলির দুর্বলতায় ৩-৫ গ্রাম ছাগলনাদীর মূলের গুঁড়া মধুসহ দিনে দুইবার খেতে হবে।
- রক্ত-অর্শে এর মূল বেটে আক্রান্ত স্থানে ২ বার প্রলেপ দিতে হবে।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৪ থেকে ৫ মাসে পরিপক্ব হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ২৫,০০০ টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৭৯. মৌরি

সংস্কৃত নাম : মাধুরিকা
Botanical Name : *Foeniculum vulgare Gaertn (Mill).*
Common Name : *Mouri*
English Name : *Sweet Fennel*
Family : *Umbelliferae*

পরিচিতি : মৌরি ঝোপ জাতীয় বর্ষজীবী উদ্ভিদ। গাছ প্রায় তিন ফুট পরিমাণ লম্বা সূক্ষ্ম লোমযুক্ত হয়। সাধারণত পাতা হয় না, কখনো হলে তা ছোট ছোট সরু হয়। এই ফ্যামিলির সব গাছের ফুল বা ফল ছাতার মতো হয়। পুষ্পদণ্ড ফাঁপা, ফুলের বহির্বাস নেই, পাপড়ি পীতবর্ষ এবং ফুল হলুদ বর্ণের হয়। বীজ সরু, ঈষৎ বক্র, লম্বা শিরাযুক্ত, হালকা ধূসর সবুজ বর্ণের ছোট ও লম্বা হয় এবং পাকলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। ফলের মস্তকের উপর টুপির মতো ক্ষুদ্র আবরণ থাকে।

প্রাপ্তিস্থান : মৌরি বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে চাষ হয়ে থাকে।

চাষাবাদ : সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মৌরি জমিতে বীজ ছড়ানো হয় এবং এপ্রিল-মে মাসে বীজ পাকে। বীজ পাকলে গাছ মরে যায়।

লাগানোর দূরত্ব : ধানের মতো ক্ষেতে ছিটিয়ে বপন করতে হয়।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে মৌরি জন্মে।

বীজ আহরণ : এপ্রিল-মে মাসে ফল পাকলে তা সংগ্রহ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৩০ হাজার।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : আহরণের পর রোদে শুকিয়ে বাঁশের অথবা মাটির পাত্রে সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : মৌরি, মৌরি মূল, বীজ, পাতা ও বীজের তেল ব্যবহার হয়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : পাকস্থলি সবল করে এবং ব্যথা ও বায়ু দূর করে। বক্ষস্থল, যকৃত, প্লীহা ও মূত্রাশয়ের প্রতিবন্ধকতা দূর করে এবং ঋতু ও মূত্র প্রবাহক। দুগ্ধ ও মূত্র বৃদ্ধি করে এবং শীতলজনিত ও বায়ুজনিত ব্যথা দূর করে। মূত্রাশয় ও মূত্রতলির পাথর নির্গত করে এবং হৃৎপিন্ডের রোগে উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- বায়ু নিঃসারক হিসেবে মৌরির ফল বা বীজগুঁড়া ৪-৫ গ্রাম পরিমাণে খাবারের পর দিনে ২ বার পানিসহ খেতে হবে।
- রজঃ নিঃসারক বা ঋতু প্রবাহক হিসেবে এর ফল বা বীজগুঁড়া ৫-৭ গ্রাম পরিমাণে সকালে খালি পেটে ও রাত্রে খাবারের পূর্বে হালকা গরম পানিসহ খেতে হবে।
- যকৃত, প্লীহা, বক্ষস্থল ও মূত্রাশয়ের প্রতিবন্ধকতায় মৌরির ফল বা বীজগুঁড়া ৫-৭ গ্রাম খাবারের পর দিনে ২ বার ঠাণ্ডা পানিসহ খেতে হবে।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : মৌরি ৬-৭ মাসে পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : গাছের পাতা রান্নার উপকরণ হিসেবে অনেক স্থানে ব্যবহার করা হয়। মৌরি মসলা হিসেবে রান্নার কাজে ব্যবহার হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে ২০,০০০ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকা।

৮০. রক্ত চন্দন

Botanical Name : *Pterocarpus santalinus Linn.*
Common Name : *Rakto Chandon*
English Name : *Red Sandal*
Family : *Leguminosae*

পরিচিতি : রক্ত চন্দন চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। গাছ প্রায় ৪০ থেকে ৫০ ফুট লম্বা হয়। গাছের ছাল প্রায় কালো আভাযুক্ত ধূসর বর্ণের। কাঠ শক্ত, বাহ্যিকভাবে সাদা এবং ভিতরে রক্তবর্ণ। পাতার মাথা কিছুটা চাপা ও চামড়ার ন্যায় শক্ত এবং উভয় দিক গোলাকার এবং নিচের দিকে মসৃণ অস্পষ্ট লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড লম্বা এবং চারিদিক ফুল হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ফল হয়।

প্রাপ্তিস্থান : সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে দেখা যায়।

চাষাবাদ : বীজ থেকে বংশ বিস্তার হয়।

লাগানোর দূরত্ব : ১৮ থেকে ২৭ ফুট।

উপযোগী মাটি : বেলে বা দোআঁশ মাটিতে ভালো হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৫ হাজার।

বীজ আহরণের সময় : অক্টোবর-নভেম্বর।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বীজ সংগ্রহ করে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে ৬ মাস পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : কাঠ ও কাঠের সারাংশ এবং তেল ব্যবহার হয়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : রক্ত চন্দন হৃদরোগে বিশেষ কার্যকরী। রক্ত চন্দনের ক্রিয়া প্রায় শ্বেতচন্দের মতো। শান্তিদায়ক, প্রত্যাবর্তক ও শীতলকারক। রক্ত পরিষ্কারক, বর্ণ

প্রসাদক, উষ্ণতা প্রশমক, ফোলা ও প্রদাহ নিবারক। হৃদকম্পনাশক, যৌনশক্তি বর্ধক, বলকারক ও আমাশয়ে উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- রক্ত চন্দন অত্যন্ত শীতবীর্য সমন্বিত, গুরু, চক্ষুর হিতকারক, তিক্ত মধুর রসযুক্ত এবং বর্ণকারক।
- জ্বর, তৃষ্ণা, পিত্তজ কাশ, দাহ, কৃমি, বাত, রক্তদোষ, ব্রণ, বমন, রক্তপিত্ত, পিত্ত ও চক্ষুরোগ নিবারক।
- রক্ত চন্দন ঘষে চোখের বাইরে চোখের পাতায় প্রলেপ দিলে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়।
- প্রস্রাবে জ্বালা-পোড়া বন্ধ করে এবং মাথাব্যথা চোখের রোগে উপকারী।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ১৫-২০ বছরে পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : হিন্দু ধর্মে পূজা অর্চনায় চন্দনের ফোঁটা দেয়া খুবই পবিত্র বলে মানা হয়। এছাড়াও সুগন্ধি ও রঙ তৈরিতে চন্দন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আয় : প্রতি একর জমিতে বার্ষিক আয় ৮০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ টাকা।

৮১. রসুন

Botanical Name : *Allium sativum Linn.*
Common Name : *Rasun*
English Name : *Garlic*
Family : *Liliaceae*

পরিচিতি : রসুন আমাদের কাছে বহুল পরিচিত কন্দ জাতীয় বর্ষজীবী উদ্ভিদ। একাধিক কোয়া বা কন্দ বিশিষ্ট সাদা শল্কপত্রাবৃত অংশটুকু মাটির নিচে থাকে এবং সবুজ পাতাসহ লম্বা পুষ্পদণ্ড (কলি) মাটির উপরে থাকে। কন্দ একসঙ্গে গুচ্ছমূলের সাথে যুক্ত থাকে।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে রসুনের চাষ করা হয়।

চাষাবাদ : সমতল ভূমিতে নভেম্বর মাসে এবং পাহাড়ি এলাকায় নভেম্বর মাসে এর কন্দ বোনা হয়। রোপণের পূর্বে জমিতে ভালভাবে চাষ দিয়ে মাটি আলগা করে নিতে হয়। কন্দর মুখ থেকে পিঁয়াজ কলির মতো চ্যাপ্টা সোজা পাতা বের হয়। লম্বায় প্রায় এক হাত পর্যন্ত বড় হয়। বাংলাদেশে রসুন পর্যায়ক্রমে মরিচ, ভুট্টা, আলু ও সিমের সাথে বোনা হয়। কন্দ বপনের পর পরিপক্ব হতে প্রায় চার মাস সময় লাগে।

লাগানোর দূরত্ব : সাধারণত ৬-৮ ইঞ্চি দূরত্বে লাগাতে হয়।

উপযোগী মাটি : রসুনের জন্য অল্প রৌদ্রযুক্ত জায়গা প্রয়োজন। সাধারণত বেলে-দোআঁশ মাটিতে রসুন বাল জন্মে থাকে।

বীজ আহরণ : মার্চ-এপ্রিল মাসে পাকা বীজ বা কন্দ আহরণ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ১৫০০-২০০০।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : মার্চ-এপ্রিল মাসে পাকা বীজ বা কন্দ সংগ্রহ করা হয়। বীজ রোদে শুকানো হয় এবং বাছাই করে পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষণ করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ : রসুনের কন্দ থেকে পাতা পর্যন্ত সকল অংশই ব্যবহার করা যায়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : যৌবন রক্ষায় রসুনের বীজ কার্যকর। বাতবেদনা, জীর্ণ জ্বর, শরীরের জড়তা ও পেটের বায়ুতে রসুন খেলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তাছাড়া রসুন বাতের জন্যও বেশ উপকারী।

কোন অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- ২ কোয়া রসুন গাওয়া ঘিয়ে ভেজে মাখন মাখিয়ে খেতে হয়। খাওয়ার শেষে একটু গরম পানি পান করা উচিত। অথবা আটার সঙ্গে রসুন বাটা মিশিয়ে রুটি বা লুচি করে খাওয়া যায়। তাছাড়া খাবার সঙ্গে একটু ঘি, চিনি ও একটু রসুন বাটা মিশিয়ে খেলে যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- যৌবন রক্ষায় কাঁচা আমলকির রস ২/১ চামচ নিয়ে তার সঙ্গে ১ বা ২ কোয়া রসুন বাটা খেতে হয়, এতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই যৌবন বজায় থাকে। যৌবনের প্রারম্ভ রসুন খেলে ব্যবহারের দরকার থাকে না।
- ২/১ কোয়া রসুন চিবিয়ে খেয়ে একটু গরম দুধ খেলে এসব ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া যায় : (ক) স্বল্প মেধায় (খ) বিস্মরণে (গ) কৃমিতে (ঘ) বাতব্যাধি (চ) চুলকানিতে (ছ) পাণ্ডুরোগে (জ) জীর্ণ জ্বরে (ঝ) শরীরের জড়তায়।
- পেটের বায়ুতে ঠাণ্ডা পানিতে ২-৫ ফোঁটা রসুনের রস মিশিয়ে খেলে অনেক ক্ষেত্রে এর উদ্বেগ চলে যায়।
- মাংসাশিত বাতে গাওয়া ঘিয়ের সঙ্গে ২/৩ কোয়া রসুন বাটা খেতে হয়, অথবা ৫-৭ ফোঁটা রসুনের রস ঘিয়ে মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- যক্ষা রোগে প্রতিরোধক হিসাবে এক কোয়া রসুন গরম দুধে মিশিয়ে খাওয়া।
- শুক্রের বলবৃদ্ধিতে কিছুদিন রসুনের রস ২/৫ ফোঁটা অল্প গরম পানিতে বা দুধে মিশিয়ে খাওয়া উপকারী।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৩-৪ মাসে রসুন পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : রসুনের কন্দ, কলি, পাতা ইত্যাদি সবজি ও মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে ২৫,০০০ টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকা

৮২. রাম তুলসী

সংস্কৃত নাম : বনতুলসী

Botanical Name : *Ocimum gratissimum Linn*

Common Name : *Ram Tulshi*

English Name : *Shrubby Basil*

Family : *Labiatae*

পরিচিতি : রাম তুলসী গাছ সুগন্ধিযুক্ত, ৪ থেকে ৮ ফুট লম্বা। কাণ্ড কাষ্ঠবৎ বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। পাতা ২ থেকে ৩ ইঞ্চি ডিম্বাকৃতির এবং কিনারা করাতের মতো খাঁজ কাটা। বেগুনি ও লাল বর্ণের এবং ফিকে পীত বর্ণের। ফল ছোট, গোলাকার ও চ্যাপ্টা বীজ বাদামি, কোথাও শরবতি, কোথাও রাজকষ্ঠ বা জোয়ান বলা হয়। বর্ষাকালে এর ফুল ও ফল হয় এবং শীতকালে পরিপক্ব হয়। তুলসী গাছ, পাতা, বীজ ও রস ব্যবহার হয়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশ ও ভারতের সর্বত্র রাম তুলসী জন্মে। এর আদি জন্মস্থান পূর্ব এশিয়া। বিশেষ করে প্রতি হিন্দু ধর্মালম্বীদের বাড়িতে এটি পাওয়া যায়।

চাষাবাদ : বীজ থেকে চারা উত্তোলন করে এর চাষ করা যায়। পাকা বীজ সংগ্রহের পর পরই বীজতলাতে লাগালে চারা গজায়। চারা গাছ বড় হয়ে উঠলে নির্দিষ্ট জায়গায় লাগাতে হয়। সাধারণত ৩-৪ ফুট অন্তর চারা লাগাতে হবে। আংশিক ছায়াতেও এ গাছ জন্মে। প্লাবনমুক্ত ভূমিতে সহজে চাষ করা যাবে। তুলসীর বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা শতকরা ৫০-৬০ ভাগ।

লাগানোর দূরত্ব : ৩ থেকে ৪ ফুট।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটি রাম তুলসী চাষের জন্য উপযোগী, তবে বেলে-দোআঁশ মাটিতে অধিক পরিমাণে তুলসী গাছ জন্মে। তাছাড়া তুলসী টবেও লাগানো যায়।

বীজ আহরণ : শীতকালে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৩ লক্ষাধিক।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : রাম তুলসীর পাতা কাঁচা ব্যবহারই উত্তম। তুলসী গাছ পাতাসমেত উত্তোলনপূর্বক ভালভাবে পরিষ্কার করে ছোট ছোট করে কেটে রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে এবং এক বছর ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে পাতা বাদামি রঙ ধারণ করা পর্যন্ত শুকিয়ে নিতে হবে। রৌদ্রে শুকাবার সময় যাতে কোন রকম ধুলাবালি না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ড্রাই চেম্বার ব্যবহার করা যেতে পারে। শুকাবার পর পাতার আর্দ্রতা যেন শতকরা ২ ভাগ থাকে। প্যাকেটের গায়ে সংগ্রহ তারিখ, উৎসস্থল শনাক্তকরণ এবং ব্যবহারের শেষ সময় অবশ্যই উল্লেখ রাখতে হবে।

ব্যবহার্য অংশ : বীজ, পাতা শিকড় ও রস।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : রাম তুলসী মস্তিষ্ক ও ফুসফুসের রোগে বিশেষ উপকারী। প্রদাহ বা ফোলা ও স্নায়বিক দুর্বলতানাশক। হৃৎপিণ্ডের শক্তিবর্ধক। লিভার, প্লীহা, মস্তিষ্কের প্রতিবন্ধকতা দূরকারক। মাথা ব্যথা, বাত ব্যথা, পক্ষাঘাত রোগে উপকারী। ম্যালেরিয়া ও চর্মরোগে উপকারী এবং মশা দূর করে। মাথা ধরা ও স্নায়বিক রোগে ব্যবহার করা হয় এবং হৃৎপিণ্ডের বেদনানাশক হিসেবে কাজ করে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- বাতে আক্রান্ত হলে : রাম তুলসীর পাতার রসে একটি কাপড় কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে ভেজানো কাপড় ব্যথা জায়গায় বেঁধে রাখলে বাতের ব্যথা ভাল হয়।
- কোন ভাবে শরীরে পারদ প্রবেশ করলে : প্রতিদিন সকালে ২ চামচ রাম তুলসীর রস খেলে পারদের বিষক্রিয়া নষ্ট হয়।
- ভিমরুল কামড়ালে : রাম তুলসীর পাতার রস কামড় দেওয়া জায়গায় মাখলে যন্ত্রণা দূর হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৬ থেকে ৮ মাসে তুলসী গাছ পরিপক্ব হয়ে থাকে।

অন্যান্য ব্যবহার : রাম তুলসীর পরিপক্ব শক্ত কাঠ দিয়ে মালা তৈরি হয়ে থাকে।

আয় : দেশে ও বিদেশে রাম তুলসীর চাহিদা রয়েছে। তাই এটি চাষ করা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হবে। এক একর রাম তুলসী চাষে বার্ষিক ১,০০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৮৩. রীঠা

সংস্কৃত নাম : অরিষ্টক
Botanical Name : *Sapindus mukorosi Gaertn.*
Common Name : *Ritha*
English Name : *Soap Nut*
Family : *Sapindaceae*

পরিচিতি : রীঠা বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট, অযত্নে বেড়ে ওঠে এমন একটি বৃক্ষ। এটি পাহাড়ি এলাকায় বেশি দেখা যায়। গাছ ৩০ থেকে ৪০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। গাছ দেখতে খুব সুন্দর হয়। এর পাতা ১ থেকে ৪ ইঞ্চি চওড়া এবং অগ্রভাগ সরু, লম্বা, চিকন ও লোমযুক্ত। ফুল সাদা ও বেগুনি বর্ণের। ফুল সুপারির মতো লম্বা ও শাঁসযুক্ত। রীঠা পাতার অগ্রভাগ সামান্য মোটা ও ভোঁতা এবং নিম্নদেশ কোমল ও লোমযুক্ত। ডিসেম্বর মাসে ফুল এবং মার্চ-এপ্রিল মাসে ফল হয়। রীঠার ফল ও বীজের শাঁস ব্যবহার হয়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রীঠা প্রাকৃতিকভাবে জন্মে।

চাষাবাদ : প্রাকৃতিকভাবে জন্মে। গাছ দেখতে খুব সুন্দর। এখনও বাণিজ্যিকভাবে কোথায়ও চাষ হয় না।

লাগানোর দূরত্ব : ১২ থেকে ১৮ ফুট।

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ মাটিতে ভালো হয়।

বীজ আহরণ : আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ২৫০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : গাছ থেকে পাকা ফল সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

ব্যবহার্য অংশ : ফল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : রীঠা হজমকারক, বমনকারক ও শক্তিবর্ধক এবং ঋতু প্রবাহক এবং গর্ভপাত কারক। কলেরা, উদরাময় ও সর্পবিষনাশক। মৃগী, হাঁপানি ও মূর্ছা প্রভৃতি রোগে ব্যবহার করা হয়।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- বীজের শাঁস কাপড়ে জড়িয়ে নাকে রাখলে হাঁপানির উপশম হয়।
- রীঠার বীজ ও ছালের রস ডিপথেরিয়া, হাঁপানি, মৃগী, বাত ও গেঁটে বাতে উপকারী।
- রীঠা কণ্ঠরোগে বিশেষ উপকারী এবং বাহ্যিকভাবে ব্যবহারে চর্ম পরিষ্কারক হিসাবে বিশেষ কার্যকরী।
- রীঠার ধোঁয়া মানসিক বিকৃতি, হিস্টিরিয়া ও মূর্ছা রোগের উপকারী এবং ভিজানো পানি নাকে দিলে চক্র কেটে যায় ও সর্দিনাশক।
- রীঠা বীজের শাঁস যৌনশক্তি বর্ধক কণ্ঠনালির ফোলা প্রশমনকারক।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৩-৪ বছরে রীঠা গাছ পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : রীঠা পোড়া এবং ছাই চুন রঙ করার জন্য ব্যবহার হয়। বীজ পানিতে ভিজিয়ে রাখলে ফেনা হয়। উলের তৈরি পোশাক-পরিষ্কারের জন্য এই ফেনা খুবই কার্যকরী। সাবান তৈরিতে ফোসিং এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার হয়।
আয় : প্রতি একর জমিতে বার্ষিক ৬০,০০০ থেকে ৮০,০০০ টাকা।

৮৪. লজ্জাবতী

সংস্কৃত নাম : লজ্জালু
Botanical Name : *Mimosa pudica L.*
Common Name : *Lajjaboti*
English Name : *Sensitive plant*
Family : *Leguminosae*

পরিচিতি : লজ্জাবতী গুল্ম জাতীয় লতানো উদ্ভিদ। মাটিতে গড়িয়ে বড় হয় এবং গায়ে কাঁটা থাকে। স্পর্শ পেরেই পাতাগুলো গুটিয়ে নেয়। পাতার গোড়া থেকে ফুল বের হয়। ফুল নরম ও গোলাপি বা হালকা বেগুনি রঙের এর হয়ে থাকে। ফুল ও ফল বছরের সকল সময়ই জন্মে। সাধারণত জুলাই থেকে ডিসেম্বর এর মধ্যে ফুল ও ফল হয়। প্রতি ফলে ৩-৪টি বীজ হয়। লজ্জাবতী গোলাপি, ঈষৎ সাদা ও দুগ্ধবৎ সাদা এবং সবুজ—এই চার প্রকার এদেশে দেখা যায়।
প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের সকল স্থানে পতিত জমিতে, যেখানে সেখানে আগাছা হিসেবে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। তবে পাহাড়ি এলাকায় বেশি দেখা যায়।
চাষাবাদ : বাংলাদেশের সকল স্থানে পতিত জমিতে, যেখানে সেখানে আগাছা হিসেবে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বীজ হতে এর বংশবিস্তার হয়। অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে এর বংশবিস্তার সম্ভব।
লাগানোর দূরত্ব : ১০ ফুট পর্যন্ত দূরত্বে লাগানো যায়।
উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে লজ্জাবতী জন্মে।
বীজ আহরণ : আগস্ট থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত পরিপক্ব ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করা যায়।
প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ৫০ থেকে ৬০ হাজার।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না।
ব্যবহার্য অংশ : মূল, কাণ্ড, পাতা বীজ ও ফুল ব্যবহৃত হয়।
উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : লজ্জাবতী রক্ত পরিষ্কারক ও উজ্জ্বলতাকারক এবং ঋতুস্রাবকারক ও প্রদরনাশক। লজ্জাবতীর রস, পুরাতন আমাশয়, হাত-পা জ্বালায়, কানে পুঁজ, ঘামের দুর্গন্ধ, নালি ঘা, পুরনো ক্ষত ও অর্শ রোগে উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- লজ্জাবতীর ১০ গ্রাম পাতাসহ ডাঁটা ৪ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে ঐ ক্বাথ খেলে পুরাতন আমাশয়ে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

- লজ্জাবতীর ১০ গ্রাম মূল ও ডাঁটা ১ কাপ দুধ ও তিন কাপ পানি মিশিয়ে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে ঐ ক্বাথ সকালে-বিকেলে ২ বার খেলে অর্শ রোগের রক্ত পড়া বন্ধ হয় ও জ্বালা দূর হয়।
- হাত-পা জ্বালার সাথে জ্বর হলে, লজ্জাবতীর ১০ গ্রাম মূল ও ডাঁটা ১ কাপ দুধ ও তিন কাপ পানি মিশিয়ে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে ঐ ক্বাথ সকালে বিকালে ২ বার খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- ঘামের দুর্গন্ধ হলে লজ্জাবতীর পাতাসহ ডাঁটার ক্বাথ তৈরি করে বগল ও শরীরে লাগাতে হবে।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৫ থেকে ৬ মাসে লজ্জাবতী ব্যবহার উপযোগী হয়।
অন্যান্য ব্যবহার : ডি-অক্সিজেনের কাজে ব্যবহৃত হয়।
আয় : বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব হলে এই উদ্ভিদ চাষ করে সহজে বাড়তি আয় করা সম্ভব। এক একর জমিতে লজ্জাবতী চাষে ২০-৩০ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব।

৮৫. লেমনগ্রাস/লেবুগন্ধী ঘাস

সংস্কৃত নাম : ভূতৃণ, সুগন্ধতৃণ
Botanical Name : *Cymbopogon citratus (DC.) Stap.*
Common Name : *Lemongrass, Lebughash*
English Name : *Lemon Grass*
Family : *Gramineae*

পরিচিতি : লেবুগন্ধী ঘাস বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। গাছ অনেকটা ধান গাছের মতো তবে পাতা তুলনামূলকভাবে চওড়া। পাতা লম্বাকৃতি, চিকন ও অগ্রভাগ সুচালো। লেবুর মতো গন্ধযুক্ত। পাতা লম্বায় প্রায় ১২ ইঞ্চি, খসখসে ও প্রান্তভাগ ধারালো। অনেক দেশে তেলের জন্য এর চাষ হয়। বছরে বেশ কয়েকবার পাতা তোলা যায় এবং গাছ তিন-চার বছর একাধারে ভাল পাতা সরবরাহ করতে পারে। লেমন তেল হতে সাইট্রাল নিষ্কাশন করে সুগন্ধি ও ভিটামিন 'এ' সংশ্লেষণ করা চলে। এশিয়ার উষ্ণ অঞ্চল এর আদি নিবাস।
প্রাপ্তিস্থান : সারাদেশে বিশেষ করে ঢাকায় লেবুগন্ধী ঘাস পাওয়া যায়।
চাষাবাদ : মাটির নিচের অংশের সাহায্যে এরা বংশ বৃদ্ধি করে। তাই মাটির উপরের অংশ কেটে ফেলে দিয়ে চাষ করা যায়।
লাগানোর দূরত্ব : এক থেকে দেড় ফুট দূরত্বে লাগানো যায়।
উপযোগী মাটি : বেলে বা দোআঁশ মাটিতে ভালো হয়।
বীজ আহরণ : সাধারণত শিকড়ের মাধ্যমে এর বংশ বৃদ্ধি হয়। মার্চ-এপ্রিল গাছ যখন অনেক দুর্বল এবং হলুদ হয়ে আসে তখন গাছ কেটে শেকড় অন্যত্র লাগানো হয়।
পরিপক্ব হওয়ার বয়স : ৮ থেকে ৯ মাসে পরিপক্ব হয়।
প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : শিকড়ের মাধ্যমে এর বংশবৃদ্ধি হয়।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : কাঁচা অবস্থায় লেমনগ্রাসের পাতা ব্যবহৃত হয়।
ব্যবহার্য অংশ : সম্পূর্ণ গাছ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : ব্যাকটেরিয়া, রোগ-জীবাণু, পেটে ব্যথা, কৃমি, শ্বাসনালি প্রদাহ, বাত, কুষ্ঠ রোগে ব্যবহার করা হয়। লিভার ও শিরাসমূহের প্রতিবন্ধকতা ও সংকোচন রোধ করে। জরায়ুর ব্যথায় বিশেষভাবে উপকারী। লেবুগন্ধী ঘাস ফুলের ঘ্রাণ স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে ও মস্তিষ্ক পরিষ্কার করে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

০ লেমন তেল হতে সাইট্রাল নিষ্কাশন করে সুগন্ধি ও ভিটামিন-এ সংশ্লেষণ করা চলে।

অন্যান্য ব্যবহার : বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যকে সুগন্ধিযুক্ত করার জন্য লেমনগ্রাস ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রসাধনীতে প্রাকৃতিক সুগন্ধি হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে।

আয় : প্রতি একর জমিতে ৩৫,০০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকা।

৮৬. শঠী

সংস্কৃত নাম : গন্ধশুঠ
Botanical Name : *Curcuma zeodoaria Rosc.*
Common Name : *Shathi*
English Name : *Zedoary*
Family : *Xingiberaceae*

পরিচিতি : শঠী গাছ অনেকটা হলুদ গাছের মতো কন্দ জাতীয় এবং পাতা হলুদ পাতার মতো ২ ফুট পর্যন্ত লম্বা। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট লম্বা এবং মাথার চারিদিকে ২ থেকে ৩ বর্ণের মিশ্রিত ফুল হয়। কন্দ গোলাকার, লম্বাটে এবং বাঁকা বাঁকা, অনেকটা আদার মতো চারিদিকে মুখী বের হয়। এপ্রিল-মে মাসে ফুল ও পরে ফল হয়। এর পাতা প্রায় ৪০ সে.মি. লম্বা, বৃন্তদেশ সরু। পুষ্পদণ্ড ১৫ সে.মি. বা ততোধিক লম্বা হতে পারে। ফুল পীত, শ্বেত ও বেগুনি রঙের মিশ্রণ হয়ে থাকে। বীজকোষ ডিম্বাকৃতি ও মসৃণ। বীজ লম্বাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ। মে মাসে ফুল ও পরে ফল হয়।

প্রাপ্তিস্থান : শঠী বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আপনা আপনি জন্মে।

চাষাবাদ : সাধারণতঃ কন্দের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে।

লাগানোর দূরত্ব : দেড় থেকে ২ ফুট।

উপযোগী মাটি : বেলে বা দোআঁশ মাটিতে ভালো হয়।

বীজ আহরণ : কন্দের মাধ্যমে শঠীর বংশ বৃদ্ধি হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে কন্দ সংগ্রহ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : শঠী ৫০ থেকে ৬০ পিস।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : গাছ শুকিয়ে গেলে মাটির নিচ থেকে কন্দ সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে তা সংরক্ষণ করতে হয়।

ব্যবহার্য অংশ : কন্দ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : শঠী পাকস্থলি, যকৃত, হৃৎপিণ্ড ও যৌনশক্তি বর্ধক। হজমকারক, বায়ু নিঃসারক, প্রতিবন্ধকতা অপসারক এবং মূত্র ও হায়েজ প্রবাহক। বলগম বহিষ্কারক এবং শীতলজনিত কাশিনাশক। প্রদাহ নিধারক এবং ব্যথায় উপকারী। তাছাড়া কন্দ প্রস্রাবকারক, সুগন্ধি ও উত্তেজক বলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- এর ক্বাথ শ্বাসকাশে উপকারী।
- কাশি ও কফ নিঃসারণের জন্য শুকনো শঠীকন্দ টুকরো আস্তে আস্তে চিবিয়ে খেলে উপকার হয়।
- সন্তান প্রসবের পর দৌর্বল্য দূর করার জন্য অন্য কয়েকটি বলকারক দ্রব্যের সাথে শঠী মিশিয়ে খাওয়া ভাল।
- গায়ক-গায়িকারা গলা পরিষ্কার রাখার জন্য বিশেষত যেখানে প্রায়ই গলা খুসখুস করে সেসব ক্ষেত্রে শুকনো শঠীর কন্দ চিবিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : মে মাসে ফুল ও পরে ফল হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : এর কন্দ পানিতে চটকে থিতিয়ে জমাকৃত শ্বেতসারকে শঠীর পালো বলা হয়। প্রাচীনকালে শঠী থেকে আবির তৈরি হতো। শঠীর কন্দ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে বার্ষিক ৩০,০০০ টাকা থেকে ৩৫,০০০ টাকা।

৮৭. শতমূলী

সংস্কৃত নাম : শতাবরী
Botanical Name : *Asparagus racemosus Willd.*
Common Name : *Shatamuli*
English Name : *Asparagus*
Family : *Liliaceae*

পরিচিতি : শতমূলী বীরুৎ প্রকৃতির উদ্ভিদ যা দেশের সর্বত্র বন-জঙ্গলে জন্মায়। শতমূলী বহুবর্ষজীবী লতানো উদ্ভিদ। কোন বড় গাছকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। এ গাছের লতায় বাঁকানো কাঁটা থাকে। সরু মূলা বা গাজরকে একসঙ্গে বেঁধে রাখলে যেমন দেখায়, শতমূলীর শেকড়কে ঠিক সে রকমই দেখায়। শতমূলী গাছের পাতাগুলো সরু সুতোর মতো দেখায়। সে জন্য কিছুটা দূর থেকে এটা দেখতে খুব সুন্দর লাগে। অনেকে শোভাবৃদ্ধির জন্য শখ করে বাড়ির সামনে বাগানে ফুলগাছের সঙ্গে শতমূলী গাছ লাগিয়ে থাকেন এবং কোন বড় গাছ থাকলে এ লতা নিজে থেকেই তাকে জড়িয়ে বড় হয়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের সর্বত্র শতমূলী জন্মে। সাধারণত নদীর তীরবর্তী উর্বরা বেলে ও দোআঁশ মাটিতে এর মূল ভাল ও খুব পুষ্ট হয়। এছাড়া উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শতমূলী জন্মে। কারো মতে শতমূলীর আদি জন্মস্থান ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া।

চাষাবাদ : বংশ বিস্তারের জন্য বীজই প্রধান মাধ্যম। উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ এবং বালুযুক্ত মাটিতে এ গাছটি ভাল জন্মায়। বর্ষার শুরুতে গাছে ফুলের মঞ্জুরি আসে। পাকে ফাল্গুনে। ফলের আকার অনেকটা মটর দানার সমান। কাঁচা অবস্থায় ফলের রঙ সবুজ পাকা ফলের রঙ লাল হয়ে যায়। পাকা ফলে একটা সুগন্ধ রয়েছে। শতমূলী দো-আঁশ এবং বেলেমাটিতে খুব ভাল হয়। একটা পুরানো গাছ থেকে ১০/১২ কেজি মূল পাওয়া

যায়। বীজ বপনের পূর্বে এটিকে ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম হতে ১০-১৫ দিনের মতো সময় লাগে। এর অঙ্কুরোদ্‌গমের হার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ। অঙ্কুরিত চারার বয়স দুই থেকে তিন মাস হলে তা বপন করতে হয়।

লাগানোর দূরত্ব : ৩ থেকে ৪ ফুট।

উপযোগী মাটি : সাধারণত উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশে শতমূলী গাছ ভাল জন্মে। তবে বেলে-দোআঁশ ও বেলে মাটিতে অত্যধিক হয়ে থাকে।

বীজ আহরণ : সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের মধ্যে ফুল ও ফল হয়। ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাসে ফল পাকে। তখন ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৭০ হাজার।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : শতমূলী বীজ সংগ্রহ করে ভাল করে রৌদ্রে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। তাছাড়া শতমূলী উঠিয়ে মূলগুলো কেটে ভালভাবে রোদে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে শুষ্ক স্থানে রেখে ১ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় এবং এর কার্যকারিতা অটুট থাকে। একইভাবে বাজারজাত করা যাবে।

ব্যবহার্য অংশ : শতমূলী গাছের শিকড় ব্যবহৃত হয়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : শতমূলী যৌন শক্তিবর্ধক, বীর্য সৃষ্টিকারক ও গাঢ়কারক, পুষ্টিকারক এবং বলকারক ও দুধ সৃষ্টিকারক। তাজা শিকড়ের রস দুধে মিশিয়ে গনোরিয়ায় ব্যবহার করা হয়। দাঁতের গোড়া শক্ত হয়। শতমূলী বসন্ত রোগের প্রতিষেধক এবং যৌন দুর্বলতায় উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- শোথ রোগে আধতোলা পরিমাণ শুকনো শতমূলী গুঁড়া মধুসহ খেলে শোথ রোগ ভালো হয়।
- পিত্ত রোগে শতমূলীর ক্বাথ খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।
- রক্তদোষে শতমূলীর ক্বাথ এক তোলা পরিমাণ প্রতিদিন ২ বার খেলে এক সপ্তাহের মধ্যে রক্তদোষ নিবারিত হয়।
- আমাশয়ে আধা তোলা পরিমাণ শতমূলীর রস মধুসহ তিন দিন খেলে আমাশয় ও রক্ত আমাশয় ভালো হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : নয় মাস। তবে কন্দ সম্পূর্ণ পরিপক্ব হতে ২/৩ বছর সময় লাগে।

অন্যান্য ব্যবহার : লতানো উদ্ভিদ বিধায় অনেকে বাগানে এবং বাড়ির আঙিনায় শোভা বৃদ্ধির জন্য এ গাছটি লাগিয়ে থাকেন।

চাহিদা : বাংলাদেশে শিল্প ক্ষেত্রে এর চাহিদা বার্ষিক ১,২০,০০০ কেজি এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে বার্ষিক ৬০,০০,০০০ কেজি।

আয় : এক একর জমিতে শতমূলী চাষে ১০,০০০-২৫,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৮৮. শিমুল

সংস্কৃত নাম : শ্যামলী
Botanical Name : *Bombax ceiba Linn.*
Common Name : *Shimul*
English Name : *Silk Cotton Tree*
Family : *Bombacaceae*

পরিচিতি : শিমুল বৃহৎ আকৃতির, উঁচু, পাতাঝরা বৃক্ষ। ৫০ থেকে ৭০ ফুট পর্যন্ত উঁচু ও গায়ে বহু কাঁটা হয়। শীতের হিমেল হাওয়ায় প্রথম ছোঁয়াতেই পাতা ঝরে যায়। গাছের বাকল রূপালী ধূসর। পাতা হাতের আঙুলের মতো বিভক্ত ও চারিদিকে বিস্তৃত। অগ্রভাগ বর্শাকৃতি। পাতা বের হবার পূর্বে মার্চ-এপ্রিল মাসে লাল রক্তবর্ণ ফুল হয়। পাপড়ি বা ফুল ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেশর অনেক।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র শিমুল গাছ দেখা যায়।

চাষাবাদ : বেলে-দোআঁশ বা নতুন মাটিতে এ গাছ ভাল জন্মে। চাষের জন্য পাকা ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে তুলা থেকে বীজ আলাদা করে নার্সারি বেডে বীজ বপন করতে হয়। বীজের অংকুরোদগম হার শতকরা ৭৫ ভাগ এবং ১৫-২০ দিনে বীজ থেকে চারা গজায়। শুকনো পাত্রে ৬ থেকে ৮ মাস বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

লাগানোর দূরত্ব : ২০ থেকে ৩০ ফুট।

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ বা নতুন মাটিতে এ গাছ ভাল জন্মে।

বীজ আহরণ : এপ্রিল-মে মাসে ফল পাকে। তখন গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে বীজ আলাদা করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ ২১,৫০০-৩৮,৫০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : পাকা ফল গাছ থেকে আহরণ করে রোদে শুকিয়ে ফল থেকে বীজ আলাদা করে বীজতলায় বপন করা হয়। শুকনো পাত্রে বীজ ৬-৮ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : শিমুল গাছের মূল, আঠা ও ফুলের বোঁটা ব্যবহৃত হয়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : শিমুল শিকড় টনিক এবং ফুল চর্মরোগে উপকারী। পুরনো কাশিতে শিমুল পাতার রস দু'বেলা চিনিসহ খেলে ভাল উপকার পাওয়া যায়। তাছাড়া কচি শিমুলের মূল বেটে মিছরি দিয়ে শরবতের মতো খেলে গনোরিয়ায় উপকার হয়। শিমুলের কাঁটা গরুর দুধে বেটে মুখের ব্রণে লাগালে ব্রণ তাড়াতাড়ি সেরে যায়। শিমুলের আঠা স্নিগ্ধতাকারক।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- শ্বেতী রোগে শিমুল মূল ও আপাংয়ের বীজ গোচনাসহ একত্রে পিষে প্রলেপ দিলে শ্বেতী রোগ ভাল হয়।
- রক্তপিত্ত রোগে তিন আনা পরিমাণ শিমুল ফুল গুঁড়া মিশ্রী ভিজানো পানিসহ পান করলে উপকার পাওয়া যায়।

- শুক্রক্ষয়ে ২ তোলা শিমুল মূলের রস আধাতোলা মধুসহ নিয়মিত খেলে শুক্রবৃদ্ধি ঘটে।
- কুকুরে কামড়ালে কলার মধ্যে ভরে একটি করে শিমুল বীজ সাতদিন ৭টি খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- কাশি হলে শিমুলের গোড়া লেবুর রসসহ খেলে কাশি ভাল হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৪ থেকে ৫ বছরে শিমুল গাছে ফুল ও ফল আসে। তবে ১০ থেকে ১৫ বছরে পরিপক্ব হয়। শিমুল মূল এক বছরেই সংগ্রহ করা যায়, তবে তা শীতকালে।

অন্যান্য ব্যবহার : শিমুল কাঠ নরম, পীতাভ ও সহজে নষ্ট হয়। শিমুলের কাঠ প্যাকিং বক্স, দিয়াশলাইয়ের খোলা ও কাঠি, কাগজের মণ্ড বানানোসহ বহু প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার হয়। শিমুল তুলা বালিশ, গদি ও কার্পাস তুলার সাথে মিশ্রিত অবস্থায় তোষক ও জাজিমে ব্যবহার হয়। বাংলাদেশে শিমুল কাঠ দিয়ে কফিনও তৈরি হয়।

সম্ভাব্য আয় : একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছে ২০ থেকে ২৫ কেজি তুলা হয় যার বাজার মূল্য প্রায় ১২০০ টাকা। শিমুল ফুল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয়। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ থেকে যে পরিমাণ ফুল ঝরে পড়ে তা দিয়ে ৫ সদস্যের এক পরিবারের দেড় থেকে দু'মাসের রান্নার জ্বালানি হয়। গাছ বিপদের বন্ধু, তাই প্রয়োজনে বিক্রি করলে ১০-১৫ বছর বয়সের একটি শিমুল গাছ ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকায় বিক্রি করা যায়।

৮৯. শেফালী/শিউলী

সংস্কৃত নাম : পারিজাত
Botanical Name : *Nyctanthes arbortristis Linn.*
Common Name : *Shefali, Jui, Sheuli*
English Name : *Night Jasmine*
Family : *Oleaceae*

পরিচিতি : মাঝারি আকারের গাছ। ১৫ থেকে ২০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। ফুল তারকা আকৃতি, সাদা এবং কমলা বর্ণের কেন্দ্র ও বোঁটা বিশিষ্ট পাপড়িযুক্ত। রাত্রিকালে ফুল ফোটে এবং চারিদিকে মৃদু গন্ধে ভরে ওঠে। সাধারণত সকালে ফুল ঝরে পড়ে। বীজকোষ দুই পর্দাবিশিষ্ট। ২টি বীজ থাকে। শেফালী এদেশে শিউলী ফুল হিসেবে বেশি পরিচিত।

প্রাপ্তিস্থান : ভারত এর আদি নিবাস। তবে পৃথিবীর সর্বত্রই বিশেষ করে নিরক্ষীয় অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।

চাষাবাদ : বীজ থেকে চারা জন্মানো যায়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস ফুল ফোটার সময় তবে পরিবেশভেদে সারা বছরই ফুল পাওয়া যায়। ফুল ফোটা শেষ হওয়ার পর পরই গাছ ছেঁটে দেয়া উচিত। শেফালী গাছ ব্যগানের দেয়ালের পাশে রোপণের জন্য উপযুক্ত।

লাগানোর দূরত্ব : ৮ থেকে ১০ ফুট।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে শেফালী জন্মে।

বীজ আহরণ : মার্চ-এপ্রিল মাসে শেফালী ফল পাকে। সে সময় ফল থেকে বীজ আহরণ করা যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৪ হাজার।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : গাছের পাতা সাধারণত কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ : ফুল, পাতা, গাছের বাকল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : শেফালী পাতাসিদ্ধ জ্বর ও বাতের ব্যথায় উপকারী। শেফালী পাতা কৃমিনাশক। শেফালী ফল মাথার খুশকিনাশক।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- পিত্তজ্বর হলে : দুই তোলা পরিমাণ শেফালী পাতার রস মধুসহ খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।
- পিত্ত বৃদ্ধিতে : শেফালী পাতা ভিজিয়ে খেলে পিত্ত অবদমিতহয়।
- কোমরে বাত হলে : শেফালী পাতার ক্বাথ খেলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।
- খুশকিতে : শুকনো শেফালী বীজ গুঁড়া মাথায় ঘষলে খুশকি দূর হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৩-৪ বছরে শেফালী পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : শেফালী বাগানের শোভা বর্ধন করে। শেফালী ফুলের রঙ সুতি কাপড় ও শোলার খেলনা রঙ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। শেফালী গাছের বাকলে ট্যানিন আছে। তাই কখনও কখনও চামড়া ট্যান করার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফুল সনাতন ধর্মের পূজায় ব্যবহৃত হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে বার্ষিক ৩০,০০০ থেকে ৩৫,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৯০. শ্বেত চন্দন

সংস্কৃত নাম : চন্দন
Botanical Name : *Santalum album Linn.*
Common Name : *Chandan*
English Name : *Sandal Wood, Shet Chandan.*
Family : *Santalaceae*

পরিচিতি : শ্বেত চন্দন চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত সূক্ষ্ম লোমযুক্ত বৃক্ষ। গাছ ৩০ থেকে ৪০ ফুট উঁচু হয়ে থাকে। এই গাছ বেশি মোটা হয় না এবং বৃদ্ধি খুবই মন্থর। ছাল গাঢ় ধূসর বর্ণ বা প্রায় কালোবর্ণ, খসখসে, পরিপক্ব গাছের ছালে লম্বা ভাগে কাটা দাগ হয়। কাঠ শক্ত, তৈলময় বাদামি বর্ণের ও অতিশয় সুগন্ধযুক্ত। গাছ ২০ বৎসরের পূর্বে ব্যবহার উপযোগী হয় না। অসার কাঠ ও পাতায় কোন গন্ধ থাকে না। পাতা ডিম্বাকৃতি সরু ১.৫ থেকে ২.৫ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ধূসর আভাযুক্ত বেগুনি ও কালো বর্ণের। বর্ষা ও শীতকালে দুই বার এর ফুল ফুটে। চন্দন কাঠ ও তেল ব্যবহার করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান : চন্দন ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে ২ থেকে ৩ হাজার ফুট উঁচু ভূমিতে জন্মে। এছাড়া পাকিস্তান ও মিসরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চন্দন কাঠ জন্মে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে এই গাছ দেখা যায়।

চাষাবাদ : চন্দনের পাকা ফল দেখতে ছোট ও ঘন কালো। অংকুরোদগম হার শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ পর্যন্ত। বীজ সাধারণত ৮ থেকে ১৪ দিনে গজায়। চন্দন গাছ ছোট অবস্থায় বীজ দেওয়া শুরু করলেও ২০ বছর বা বেশি বয়সের গাছের বীজই চারা তৈরির জন্য সবচাইতে

ভালো। সাকার এবং এবং কপিচের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি হলেও বীজ থেকে চারা তৈরিই ভালো পন্থা। এই গাছের বৃদ্ধির জন্য বৃষ্টি খুবই প্রয়োজনীয় তাই বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ভালো জন্মে। তবে কম ঢালবিশিষ্ট পাহাড়ি এলাকা চন্দনের বংশবৃদ্ধির জন্য ভালো। চন্দন গাছ ধীরগতিতে বড় হয়। উপরন্তু আংশিক শেকড় পরজীবী বলে আশ্রয়ী গাছ ছাড়া এর বৃদ্ধির গতি আরও কমে যায়। শ্বেতচন্দনের আশ্রয়ী গাছ হিসাবে নিম, শিশু, সেগুন ইত্যাদি উপযুক্ত। চন্দন গাছ শেকড়ের সাহায্যে মাটি হতে চুন ও পটাশ সংগ্রহ করলেও নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের জন্য আশ্রয়ী গাছের শেকড়ের ওপর নির্ভর করে। এ কারণে কোন পাত্রে বীজ থেকে চারা উত্তোলনের সময় বীজ বপনের আগেই পাত্রে আশ্রয়ী গাছের চারা উত্তোলন আবশ্যক।

লাগানোর দূরত্ব : ১৫ থেকে ১৭ ফুট দূরত্বে লাগাতে হয়।

উপযোগী মাটি : সাধারণত দোআঁশ মাটিতে এ গাছটি ভালো হয়ে থাকে।

বীজ আহরণ : চন্দন গাছ বছরে দুইবার ফল দেয়। জুন-সেপ্টেম্বর এবং নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি। প্রতি ফলে একটি বীজ থাকে। দেখতে মটর দানার মতো।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ ৪,৩০০ থেকে ৬,০০০টি।

বীজ সংগ্রহের সময় : জুন-সেপ্টেম্বর এবং নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বীজ সংগ্রহ করে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে কিছুদিন বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : কাঠ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : সাদা চন্দন প্রধান অঙ্গসমূহের শক্তিবর্ধক এবং হৃৎপিণ্ডের রোগে বিশেষ উপকারী। চন্দন শক্তিদায়ক, উষ্ণতানাশক, বলকারক এবং মস্তিষ্ক এবং হৃৎপিণ্ডে প্রফুল্লতা আনে। রক্ত পরিষ্কার করে এবং উচ্চ রক্তচাপ ও চর্মরোগে উপকারী। ফোলা ও যন্ত্রণা নিরাময় করে। কাঠ ঘষা প্রলেপ মাথায় ব্যথায় উপকারী। চন্দন তেল পুরনো কাশিতে উপকারী। চন্দন ঘষা ক্বাথ মুখের মেছতা ও কালো দাগ দূর করে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- বসন্তরোগে : বসন্তরোগের প্রাথমিক অবস্থায় শ্বেত চন্দন ঘষা, কলমি বা হিঞ্চে শাকের ১ চামচ পরিমাণ রস মিশ্রিত করে রোগীকে পান করালে বসন্তের গুটি বের হয়ে পড়ে এবং জ্বরের কোন ভয় থাকে না।
- শিশুদের নাভিপাকা রোগে : শ্বেত চন্দন ঘষা শিশুদের নাভি-কুণ্ডে লাগালে নাভিপাকা রোগ ভালো হয়।
- মেহ রোগে : শ্বেত চন্দন ঘষা, অল্প পরিমাণ মিছরি ইসুবগুলের শরবতে মিশিয়ে নিয়মিত পান করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। চন্দনের তেল (১৫ ফোঁটা) ঠাণ্ডা পানিসহ পান করলেও মেহ আরোগ্য হয়।
- প্রমেহ : এক চামচ পরিমাণ আদা, চন্দন ঘষা, বিহিদানা ভিজানো পানি মিশিয়ে মধুসহ খেলে প্রমেহ ভালো হয়।
- চর্ম রোগ হলে প্রতিদিন সেই জায়গায় চন্দনের প্রলেপ দিলে চর্ম রোগ ভালো হয়।
- চন্দন ঘষা পানির সাথে কর্পূর মিশিয়ে মাথায় ঘষলে মাথা ধরা ভালো হয়।
- উষ্ণ রক্তচাপ বা ব্রঙ্কাইটিস রোগে প্রতিদিন সকালে ৭/৮টি তুলসি পাতা খেয়ে এক ঘণ্টা পর আধা কাপ দুধের সাথে ১ চামচ চন্দন ঘষা পানি খেলে ধীরে ধীরে রোগ ভালো হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ২০ বছরে পরিপক্ব হয় তবে পূর্ণাঙ্গ পরিপক্ব হতে ৪০ থেকে ৬০ বছর সময় প্রয়োজন।
অন্যান্য ব্যবহার : হিন্দু ধর্মে পূজা-অর্চনায় চন্দনের ফোঁটা দেয়া খুবই পবিত্র বলে গণ্য করা হয় এবং মৃত্যুর পর চন্দন কাঠ দিয়ে সৎকার করার রীতি প্রচলিত আছে। এছাড়াও চন্দন কাঠের খোদাই করা বিভিন্ন মূর্তি ও ভাস্কর্য প্রাচীনকাল থেকেই সেরা। চন্দন কাঠ রূপচর্চায় ব্যবহৃত হয় এবং এই কাঠের তৈরি বিভিন্ন উপহার সামগ্রী পৃথিবীব্যাপী সমাদৃত।
আয় : শ্বেত চন্দন খুবই মূল্যবান গাছ হিসেবে স্বীকৃত। এক কেজি চন্দন কাঠের বাজার মূল্য প্রায় ৩০০ টাকা। এই হিসেবে একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ এককালীন ৪০,০০০-৬০,০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রয় করা সম্ভব।

৯১. শ্বেতদ্রোণ/চেতন নাথ

সংস্কৃত নাম : দ্রোণপুষ্পি
Botanical Name : *Leucas cephalotes (Roth.) Spreng.*
Common Name : *Setodron, Dandokolos*
English Name : *Not known*
Family : *Labiatae*

পরিচিতি : দেশের পতিত জমিতে ও চাষের মাঠে এই বর্ষজীবী শক্ত বীরুৎটি জন্মে থাকে এবং কাণ্ড ৬০ সে.মি.-এর মতো লম্বা। পাতা কোমল, লোমযুক্ত, বোঁটা ছোট ও ডিম্বাকৃতি। পাতার কিনারা খাঁজকাটা। পুষ্পগুচ্ছ বড় ও গোলাকৃতি। ফুল শ্বেতবর্ণ। শীতকালে ফুল হয়, গ্রীষ্মকালে গাছ মরে যায়। আবাদ শেষে কোন কোন অঞ্চলে বর্ষার বৃষ্টির শেষে অনেক গাছ হয়। বাংলায় এর নাম বড় ঘলঘসা।
প্রাপ্তিস্থান : সিলেট, সুনামগঞ্জ ও তামাবিল অঞ্চলে বেশি জন্মে।
চাষাবাদ : অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে এই গাছ বংশবিস্তার করে। বর্ষার শেষে অযত্নে পতিত জমিতে জন্মে থাকে। বাণিজ্যিকভাবে আমাদের দেশে এখনও চাষাবাদ হয় না। গাছের গোড়ায় অঙ্গজ চারা জন্মায়। এগুলো ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে রোপণ করা যেতে পারে।
লাগানোর দূরত্ব : ১ থেকে ২ ফুট।
উপযোগী মাটি : স্যাঁতসেঁতে মাটিতে ভালো জন্মে।
বীজ আহরণ : বর্ষার শেষে অঙ্গজ কাটিংয়ের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে।
প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রযোজ্য নয়। অঙ্গজ প্রজনন হয়।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : জানুয়ারি মাসে গাছ পরিপক্ব হয়। তখন তা কেটে ছায়াযুক্ত রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
ব্যবহার্য অংশ : সম্পূর্ণ উদ্ভিদ।
উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : গাছের টাটকা রস চুলকানিতে বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করা হয়। ফুল কাশি ও সর্দিতে উপকারী। এছাড়াও এই গাছ পিত্ত ও বায়ুনাশক। কামলা/জণ্ডিস রোগে উপকারী।
কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- গাছ পিষে তার রস বের করে খোস-পাঁচড়া ও চুলকানিতে বাহ্যিকভাবে ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

- শুকনো অথবা কাঁচা ফুল চিবিয়ে খেলে সর্দি-কাশিতে উপকার পাওয়া যায়।
- পিত্তশূল রোগে গাছ কাঁচা অবস্থায় রস করে বয়স্কদের জন্য ১/২ চা চামচ ও শিশুদের জন্য ১ চা চামচ খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।
- জণ্ডিস/কামলা রোগ হলে ১/২ চা চামচ এই গাছের রস মধুসহ খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। গর্ভবতী মায়েদের খাওয়া নিষেধ।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৬ মাস।

অন্যান্য ব্যবহার : পশুখাদ্য হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে।

আয় : প্রতি একক জমিতে বার্ষিক ২০,০০০ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৯২. সজিনা/সাজনা

সংস্কৃত নাম : শিগ্রু
Botanical Name : *Moringa oleifera Lam.*
Common Name : *Sajina, Sajna*
English Name : *Drumstick*
Family : *Moringaceae*

পরিচিতি : সজিনা মাঝারি আকৃতির পত্রঝরা বৃক্ষ। সাধারণত ১৫ থেকে ২০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। এর বাকল ও কাঠ নরম। পত্রাক্ষে ৬-৯ জোড়া বিপরীতমুখী ডিম্বাকৃতি পাতা দেখা যায়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সজিনা গাছে ফুল আসে। মুকুলের ডাঁটাগুলো বিস্তৃত, গুচ্ছবদ্ধ ও প্রায় ৩ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। ফুল সবুজের আভাযুক্ত সাদা ও মিষ্টি গন্ধযুক্ত। সবুজ বর্ণের সজিনা ফল গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এক একটি ফল ৯টি শিরাযুক্ত ২০ ইঞ্চি বা কখনও কখনও এর বেশি লম্বা হয়।

প্রাপ্তিস্থান : সজিনা বাংলাদেশের সর্বত্র বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে বেশি দেখা যায়।

চাষাবাদ : বীজ ও কাটিং উভয় পদ্ধতিতে সজিনা চাষ করা যায়। সজিনার ফলে ১০-১৫টি বীজ থাকে, এগুলো তিন শিরাবিশিষ্ট এবং ত্রিভুজাকৃতির। বীজ থেকে বংশবিস্তার সম্ভব হলেও অঙ্গজ বা কাটিং থেকে নতুন চারা তৈরি করাই সহজ এবং উত্তম। বীজতলায় কাটিং দিলে ২ সপ্তাহের মধ্যে কুশি গজায় এবং শতকরা ৯০টি নতুন চারা পাওয়া যায়। এক বৎসর বয়সী কাটিং চারা রোপণের জন্য উত্তম।

লাগানোর দূরত্ব : ১০ থেকে ১২ ফুট।

উপযোগী মাটি : উষ্ণ ও আর্দ্র পলিমাটি সজিনা গাছের জন্য উপযুক্ত।

বীজ আহরণ : মার্চ-এপ্রিল।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রতি কেজিতে ১,২০০-২,০০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : পরিপক্ব ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। বীজ থেকে বংশবিস্তার সম্ভব হলেও অঙ্গজ বা কাটিং থেকে নতুন চারা গজানোই উত্তম।

ব্যবহার্য অংশ : সজিনার পাতা, ফল, মূল, ছাল ও বীজ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : সজিনা অভ্যন্তরীণ প্রদাহ, প্লীহা, অরুচি, হাঁপানি ও গেঁটে বাতে সর্বপ্রকার ব্যথা ও বাত ব্যথা, সন্ধিব্যথা, কোমর ব্যথা ও পক্ষাঘাতে এবং শ্লেষ্মাজনিত

রোগসমূহে উপকারী। এছাড়া সজিনা হজমকারক, ক্ষুধাবর্ধক এবং পিত্ত ও বায়ু নিঃসারক ও মূত্রকারক। এছাড়া বৃক্ষ ও মূত্রথলির পাথুরী চূর্ণকারক। ফুল কামশক্তিবর্ধক।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- সজিনা গাছের তাজা মূলের রস দুধসহ সেবনে অভ্যন্তরীণ প্রদাহ, প্লীহা বৃদ্ধি, অরুচি, হাঁপানি ও গেঁটে বাতে উপকারী।
- সজিনা বীজের তেল বাতের মালিশ হিসেবে ব্যবহার হয়।
- সজিনার মূলের রস দুধসহ খেলে মূত্র বৃদ্ধি পায়।
- সজিনার আঠা দুধসহ বেটে কপালে লাগালে মাথা ধরায় আরাম হয়।
- সিজনার মূল ও ছালের রস তিনদিন খেলে শরীর থেকে কৃমিমুক্ত হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৩-৪ বছরে সজিনা পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : সজিনার কাঠ খুবই নরম এর বিশেষ ব্যবহারও নাই। ফল ও পাতা পুষ্টিকর তরকারি হিসেবে ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বীজের তেল সুগন্ধি ও প্রসাধনী তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে বার্ষিক ২০,০০০ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকা।

৯৩. সর্পগন্ধা

সংস্কৃত নাম : সর্পগন্ধা
Botanical Name : *Rauwolfia serpentina (Linn.) Benth.*
Common Name : *Sarpagondha*
English Name : *Snake Root*
Family : *Apocynaceae*

পরিচিতি : সর্পগন্ধা একটি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। উচ্চতা ২ থেকে ৩ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। এটি রোমশ উদ্ভিদ। পাতা লম্বাটে, অগ্রভাগ সরু, উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজ, পুষ্পদণ্ড লালচে এবং অনেক ফুল একত্রে তাকে। ফল জোড়ায় হয় অথবা একটি করেও হয়। ফল পাকলে কৃষ্ণবর্ণ বা গাঢ়বর্ণের হয়। সর্পগন্ধা গাছের মূল ধূসর বা পীত বর্ণের এবং লম্বালম্বি ফাটলযুক্ত।

প্রাপ্তিস্থান : দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে যেমন : টাঙ্গাইল, ঢাকা, সিলেট, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জায়গায় জন্মে।

চাষাবাদ : দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে যেমন : টাঙ্গাইল, ঢাকা, সিলেট, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ইত্যাদি জায়গায় স্বাভাবিকভাবে সর্পগন্ধা জন্মে। বীজ হতে এ গাছের বংশ বিস্তার করা যায়। স্বাভাবিকভাবে বীজের অংকুরোদগম ১৮% হতে পারে। মৃদু ঘনত্বের এসিডে বীজ চুবিয়ে ধুয়ে লাগালে বেশি অংকুরোদগম হয়।

শ্রাবণ হতে কার্তিক পর্যন্ত বীজ সংগ্রহ করা যায়। বীজ সংগ্রহের পর দু'তিন দিন রোদে শুকিয়ে পাঁচ মাস পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা যায়। বীজ বপনের পূর্বে ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। বীজতলা মাটি, গোবর ও ভিজা ভুষি (২ : ১ : ১) মিশিয়ে তৈরি করা হয়। বীজ লাগানোর ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে অংকুরিত হয়। চারা গজানোর ৪৫-৫০ দিনের মধ্যে মাটি আর গোবর (৩ : ১) ভর্তি ব্যাগে লাগানো হয়। তিন হতে চার মাসের চারা মাঠে লাগানোর জন্য উপযুক্ত হয়। অপেক্ষাকৃত ভিজা মাটিতে এর চাষ ভাল হয়।

লাগানোর দূরত্ব : ১ থেকে ২ ফুট।

উপযোগী মাটি : দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে যেমন টাঙ্গাইল, ঢাকা, সিলেট, দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম ইত্যাদি জায়গায় স্বাভাবিকভাবে সর্পগন্ধা জন্মে। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় উন্নতমানের সর্পগন্ধা জন্মে। তবে অপেক্ষাকৃত ভেজা মাটিতেও হয়।

বীজ আহরণ : জুলাই থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত বীজ সংগ্রহ করা যায়। বীজ সংগ্রহের পর দু'তিন দিন রোদে শুকিয়ে পাঁচ মাস পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ১৯০০-২৫০০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সর্পগন্ধা গাছ ২-৩ বছর বয়সকালে মূলসহ মাটি হতে উত্তোলন করতে হয়। অতঃপর ধুয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে টুকরো টুকরো করে কেটে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হয়। এরপর পরিষ্কার চটের বস্তা বা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভর্তি করে শুষ্ক স্থানে রেখে ১ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় এবং এর কার্যকারিতা অটুট থাকে।

ব্যবহার্য অংশ : এই গাছের পাতা, গাছের রস ও মূল ঔষধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : যদিও নাম সর্পগন্ধা কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এটি এখন ব্যবহার করছেন উচ্চ চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য। ব্লাড প্রেসারের সিস্টোলিক প্রেসার কমাতে সাহায্য করে এটি। কারণ সর্পগন্ধার উপক্ষার *(alkaloids)* হৃৎপিণ্ডের ওপর অবসাদ ক্রিয়া করে এবং রক্তবহ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাগুলোকে বিস্ফোরিত *(dilate)* করে ও এভাবে রক্তচাপ কমায়। সর্পগন্ধার শিকড় ও প্রধান মূল কালাজ্বর এবং পেটের ব্যথায় দুধের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। মূলের রস নিদ্রাকারক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং উচ্চ রক্তচাপ রোধ করে। এছাড়াও পেটের ব্যথা, ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা এবং জ্বর উপশমের ক্ষেত্রেও এটি খুবই উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- সর্পগন্ধা অত্যন্ত উত্তেজনানাশক ও নিদ্রাকারক। উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করলে সুনিদ্রা হয় উন্মত্ততা হ্রাস পায়। তাই উন্মাদ চিকিৎসার ক্ষেত্রে সর্পগন্ধার মূল ব্যবহৃত হয়।
- সর্পগন্ধার মূল বায়ুর ঊর্ধ্বগতিকে দমন করে। বিষধর সাপে কামড়ালে হৃদযন্ত্রে তীব্র বায়ুর চাপ সৃষ্টি হয়। যার ফলে রক্তের সঞ্চালন অসম্ভব বেড়ে যায় এবং এক সময় হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সর্পগন্ধা বায়ুচাপ দমন করে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। এর ফলে চিকিৎসা করার সময় পান।
- এর মূল অনিদ্রা, রক্তচাপ, উত্তেজনা ও পাগলামি ছাড়াও দুশ্চিন্তা ও মূর্ছা রোগসহ বিভিন্ন স্নায়বিক রোগের চিকিৎসায় কার্যকর।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ২-৩ বছরে সর্পগন্ধা পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ শিল্পে অ্যালকালয়েড উল্লেখিত রোগ নিরসনে ব্যবহৃত হয়।

চাহিদা : ঔষধ শিল্পে বার্ষিক ১,০০০ টনেরও বেশি সর্পগন্ধার প্রয়োজন হয়।

আয় : এক একরে সর্পগন্ধা চাষে বার্ষিক ৫০-৬০ হাজার টাকা আয় হতে পারে।

৯৪. সিন্দুরী

Botanical Name : *Bixa orellana Linn.*
Common Name : *Shinduri, Latkan*
English Name : *Monkey Turmeric*
Family : *Bixaceae*

পরিচিতি : সিন্দুরী ঝোপ জাতীয় চিরসবুজ বৃক্ষ অঞ্চলভেদে এই গাছ হলদি এবং দানা হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের অনেক জায়গায় বাগানের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য যত্নসহকারে লাগানো হয়ে থাকে। পাতা হৃৎপিণ্ডাকৃতির, অগ্রভাগ সরু, প্রায় ৪/৫ ইঞ্চি লম্বা হয়। ফুল ছোট ছোট, পুংকেশরের চারদিকে ৫টি পাপড়ি থাকে এবং মধ্যভাগে থাকে স্ত্রী কেশরটি। ফুলের রঙ সিন্দুরের রঙের মতো, গোলাপি ও লালের মিশ্রণ। ফল ধুতুরার মতো কন্টকাবৃত, লম্বাটে ও লাল রঙের। এর মধ্যে ৪০/৫০টি বীজ থাকে। বীজের বহিরাবরণ গাঢ় কমলা রঙের, একে মেটে সিন্দুরীর রঙ বলা যেতে পারে। আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চল এর আদি নিবাস। আমাদের দেশে এই গাছকে জাফরান বলে অনেকে ভুল করে থাকেন।
প্রাপ্তিস্থান : টাংগাইল এলাকায় বেশি পাওয়া যায়। বর্তমানে রাজবাড়ী জেলার শান্তিমিশন এলাকায় চাষ হচ্ছে।
চাষাবাদ : বীজ থেকে চারা তৈরি করে এর চাষাবাদ হয়।
লাগানোর দূরত্ব : ১০ থেকে ১২ ফুট।
বীজ আহরণ : জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ফল পাকলে গাছ থেকে সংগ্রহ করে রোদে শুকালে ফল ফেটে তা থেকে বীজ বেরিয়ে আসে।
প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ১০-১২ হাজার।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বীজ সংগ্রহ করে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে ৯ মাস পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা যায়।
ব্যবহার্য অংশ : মূলত বীজ। কিন্তু কখনও কখনও সম্পূর্ণ গাছ ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : ফল বৃক্ক রোগে উপকারী। বীজ রুচিকারক, জ্বর ও প্রমেহনাশক। পাতা কমলা রোগে হিতকর। শিকড়/শিকড়ের ছাল উত্তেজক ও সকল প্রকার জ্বরনাশক। সমগ্র গাছ রক্ত আমাশয় ও বৃক্ক রোগে ব্যবহার্য। এটি স্নিগ্ধকারক, রক্তদোষ, বমি ও তৃষ্ণা নিবারক।
কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- সিন্দুরী বীজ রুচিকারক ও জ্বর ও প্রমেহনাশক।
- সিন্দুরী ফল বৃক্ক রোগে উপকারী।
- সিন্দুরী শিকড়/শিকড়ের ছাল উত্তেজক ও সকল প্রকার জ্বরনাশক।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : ৩ থেকে ৪ বছরে পরিপক্ব হয়।
অন্যান্য ব্যবহার : সিন্দুরী বীজ পিষে গরম গরম ভালভাবে চটকে কাঠের পাত্রে কয়েক দিন ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর সেটিকে ভালভাবে ছেঁকে আরও ৫/৭ দিন রেখে দিলে পাত্রের তলায় রঙ থিতিয়ে যায়। তখন উপরের পানিটা আস্তে আস্তে ফেলে দিয়ে রঙ সংগ্রহ করে শুকিয়ে নিতে হয়।
আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

৯৫. সুপারি

সংস্কৃত নাম : পোগ
Botanical Name : *Areca catechu L.*
Common Name : *Supari*
English Name : *Betel Nut*
Family : *Palmae*

পরিচিতি : সুপারি গাছ শক্ত, সরু ও লম্বা শাখা-প্রশাখাহীন গাছ। লম্বায় সাধারণত ২৫ থেকে ৫০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। পত্রদণ্ডের পরস্পর বিপরীত দিকে পাতাগুলো থাকে এবং লম্বায় দুই ফুট পর্যন্ত হয়; পত্রদণ্ড লম্বায় ১০ ফুট পর্যন্ত হতে দেখা যায়। পুষ্পদণ্ড (বহু শাখা-প্রশাখা) বিভক্ত পুষ্পমঞ্জরী সম্পন্ন। প্রতিটি মঞ্জরীর গোড়ায় ৩৫০টি স্ত্রী ও ডগায় প্রায় ৪৮০০০ পুরুষ ফুল থাকে। ফল (সুপারি) কাঁচা অবস্থায় সবুজ ও পাকা অবস্থায় গাঢ় হলুদ বা কমলা রঙ ধারণ করে।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই সুপারি গাছ কম-বেশি দেখা যায়। তবে বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, বাগেরহাট, লক্ষীপুর, ফেনী, নোয়াখালী, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, সিলেট ও উপকূলীয় জেলাসমূহে সুপারি ভাল জন্মে।

চাষাবাদ : সাধারণত জুলাই মাসে সুপারি গাছে ফুল ধরে ও নভেম্বর মাসে ফল পাকে। ফল পাকলে গাছ থেকে আহরণ করে ১৫ সে.মি. দূরত্বে ৫ সে.মি. গভীর গর্তে সুপারির মুখ উপরের দিকে রেখে বীজতলায় বপন করতে হয়। বীজ বপনের পর বীজতলায় ছায়া ও পানি দেয়া প্রয়োজন। সাধারণত ৫০ দিনে চারা গজায়।

লাগানোর দূরত্ব : ৬ ফুট পর পর।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে সুপারি হয়ে থাকে। তবে পানি জমে না এমন দোআঁশ মাটি, পলি মাটি ও লোনা মাটি সুপারি চাষের জন্য উপযোগী।

বীজ আহরণ : নভেম্বর মাসে সুপারি গাছে ফল পাকে। সে সময় গাছ থেকে সুপারি সংগ্রহ করে ৭-১০ দিন ছায়াযুক্ত স্থানে ঢেকে রেখে বীজতলায় বীজ বপন করতে হয়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৫০টি।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সুপারি কাঁচা ও পাকা অবস্থায় ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ : তবে শিকড়ও ব্যবহার হয়ে থাকে।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : গুঁড়া কৃমি এবং রক্ত আমাশয়ে সুপারি বিশেষ উপকারী। সুপারি পেটের পীড়া, মাড়ির ফোলা ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- গুঁড়া কৃমির উপদ্রব হলে ৪ গ্রাম সুপারি থেঁতো করে ৩ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে সকালে-বিকালে দুইবার খেলে উপকার পাওয়া যায়। শিশুদের জন্য পরিমাণ অর্ধেক।
- ৪ গ্রাম সুপারি থেঁতো করে তার সংগে কাঁচা বেল শুকিয়ে তার ১ গ্রাম পরমাণ গুঁড়া ৩ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে সকালে-বিকালে দুইবার খেলে রক্ত আমাশয় সেরে যায়।

- ঘা পচে গিয়ে দুর্গন্ধ হলে কাঁচা সুপারি ভালোভাবে শুকিয়ে খোসাসহ থেঁতো করে তার মিহি গুঁড়া ঘায়ে লাগালে দুর্গন্ধ দূর হয় ও ঘা সেরে যায়।
- সুপারি মিহি গুঁড়া করে ভেজে তা দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁতের ব্যথা ও পায়োরিয়া রোগ ভাল হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৬-৮ বছরে সুপারি গাছে ফল ধরে তবে ১২ থেকে ১৫ বছরে পরিপূর্ণ ফলবান হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : পানের সাথে সুপারি খাওয়া হয়। সুপারি গাছের কাণ্ড ঘরের মাচা, খুঁটি, সিলিং ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। সুপারির খোসা দিয়ে হার্ডবোর্ড তৈরি করা যায়। সুপারি গাছের পাতা দিয়ে মাদুর, ঝুড়ি ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

আয় : একটি পরিপূর্ণ সুপারি গাছ থেকে বছরে ৬০০ থেকে ৭০০টি সুপারি পাওয়া যায়। এক একরে সুপারি থেকে ৫০-৬০ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব।

৯৬. সোনাপাতা

সংস্কৃত নাম : স্বর্ণপত্রিকা, কল্যানী
Botanical Name : *Cassia angustifolia Vahl.*
Common Name : *Sonapata/Sonamukhi*
English Name : *Senna/Tinavele Senna*
Family : *Cassalpincae*

পরিচিতি : সোনাপাতা বর্ষজীবী এবং ২ থেকে ৩ ফুট উঁচু উদ্ভিদ। পাতার ডাঁটার দু'দিকে ৭ থেকে ৮ জোড়া পত্র থাকে। পাতা ছোট মিন্দিপাতা বা তেঁতুল পাতার মতো ক্রমশ আগার দিকে সরু। ফুল হলুদ বর্ণের হয়। পত্র গাছকে টিনেভেলি সিনা বলা হয়। সোনাপাতা আরব দেশের জঙ্গলে বেশ হয়।

প্রাপ্তিস্থান : সোনাপাতা বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মে।

চাষাবাদ : বীজ থেকে চারা তৈরি করা চাষাবাদ হয়।

লাগানোর দূরত্ব : ৪ থেকে ৬ ফুট।

বীজ আহরণ : জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ফল পাকলে গাছ থেকে সংগ্রহ করে রোদে শুকালে ফল ফেটে তা থেকে বীজ বেরিয়ে আসে।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ৮ হাজার।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : বীজ সংগ্রহ করে পরিষ্কার করে ছায়াযুক্ত রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। বীজের আর্দ্রতা কমে কিছুটা গাঢ় বর্ণ ধারণ করলে প্যাকেটজাত করতে হবে।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা ও ফল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : সোনাপাতা সর্বপ্রকার ধাতুরসের পরিশোধক হিসাবে কাজ করে এবং মস্তিষ্ক পরিষ্কার করে। শীতলজনিত রোগ : গেঁটে বাত, পুরাতন ব্যথা ও মৃগী রোগে উপকারী এবং কৃমিনাশক হিসাবে সোনাপাতা ব্যবহার হয়।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- শীতলজনিত রোগ : গেঁটে বাত, পুরাতন ব্যথা ও মৃগী রোগে উপকারী।
- পরিমিত মাত্রায় ৩ মাস সেবনে গেঁটে বাত ভাল হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : এক বছর।

অন্যান্য ব্যবহার : পশুখাদ্য হিসেবে সোনাপাতা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ৪০,০০০ টাকা থেকে ৬০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৯৭. সোনালু

সংস্কৃত নাম : শ্যোনাক, শুকনাশ
Botanical Name : *Cassia fistula L.*
Common Name : *Sonalu, Bandar Lathi.*
English Name : *Indian Laburnum*
Family : *Liguminosae*

পরিচিতি : সোনালু মাঝারি ধরনের ২০-৩০ ফুট লম্বা বৃক্ষ। ঝোপঝাড় কম এবং ছাল খুব মোটা যার ভিতরটা পাকা সোনার মতো বর্ণ। পাতা জাম পাতার মতো ৫ থেকে ৬ ইঞ্চি লম্বা অগ্রভাগ সরু অনেকটা বেল পাতার মতো। প্রত্যেক শাখা অগ্রভাগে একটি পাতাসহ ৭ থেকে ৮ জোড়া পাতা থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসে পাতা ঝরে যায় এবং মার্চ মাসে নতুন পাতা বের হয়। একই সময়ে সোনালী বর্ণের ফুল ফোটে। ডিসেম্বর মাসে ফল হয়। ফল লাঠি বা তরবারির মতো ৩ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। কাঁচা ফল সবুজ এবং পাকলে কালো মিশ্রিত লাল হয়। ফলের ভিতরে আঠালো পদার্থ থাকে। গাছের ছাল, পাতা ও ফলের ভিতরের আঠালো পদার্থ ব্যবহার হয়।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশের সব জায়গা এটি জন্মে থাকে।

চাষাবাদ : বীজ থেকে চারা হয়। বছরের সব সময় চারা লাগানো যায়। তবে এপ্রিল মাসে সময় চারা লাগানো ভালো।

লাগানোর দূরত্ব : ১০ থেকে ১৫ ফুট।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে সোনালু জন্মে।

বীজ আহরণ : জুলাই মাসে ফল পাকলে গাছ থেকে তা পেড়ে রোদে শুকিয়ে বীজ আলাদা করে সংরক্ষণ করা যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রায় ১ হাজার।

বীজ সংগ্রহের সময় : ডিসেম্বর।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা, ফুল, গাছের ছাল, ফল, মজ্জা ও খোসা।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : সোনালু কোষ্ঠ পরিষ্কারক, যকৃতের প্রতিবন্ধকতা ও জণ্ডিস রোগে উপকারী। সোনালুর প্রলেপ সর্দি, ব্যথা ও ফোলা দূর করে। রক্ত আমাশয় ও পেট ফাঁপা দূর করে। টাটকা সোনালু ফল বমিকারক, হজমকারক। ডিপথেরিয়া ও কলেরা রোগে উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- ১ চা চামচ ফলের মজ্জা পানির সাথে মিশিয়ে ছেঁকে খেলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়।
- ১/২ চা চামচ পাতার পেস্ট ঘিয়ে ভেজে সকালে পানিসহ খেলে আমবাত উপকার পাওয়া যায়।
- ১/২ চা চামচ ফলের খোসা ২ কাপ পানিতে ভিজিয়ে পরবর্তীতে জ্বাল করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে প্রতিদিন ২/৩ বার খেলে ঋতুস্রাব নিয়মিত হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৪-৫ বছরে সোনালু গাছ পরিপক্ব হয় তবে পূর্ণাঙ্গ পরিপক্ব হতে ১০ বছর সময় প্রয়োজন।

অন্যান্য ব্যবহার : কাঠ ইটের মতো লাল। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও ঢেঁকি, সাঁকো ইত্যাদি বানানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

আয় : প্রতি একর জমিতে বছরে ৪০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৯৮. হলুদ

সংস্কৃত নাম : হরিদ্রা
Botanical Name : *Curcuma longa Linn.*
Common Name : *Halud, Haldi*
English Name : *Termeric*
Family : *Zingiberaceae*

পরিচিতি : হলুদ বর্ষজীবী কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ। এটি গোলাকার গাঁট বিশিষ্ট। এর ভিতরের দিকটা পীতবর্ণ, পাতা এক-দেড় ফুট পর্যন্ত বড় হয়। ফুল ফিকে সবুজ ও হরিদ্রাভ। নভেম্বর মাসে গাছে ফুল আসে। ছায়াঘেরা স্থানে এবং গাছের নিচে হলুদ ভালভাবে বেড়ে ওঠে।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হলুদ চাষ হয়।

চাষাবাদ : নভেম্বর মাসে কন্দের মাধ্যমে এর চাষ হয়। ৯-১০ মাসের মধ্যে হলুদ পরিপক্ব হয়। সাধারণত মার্চ-এপ্রিল মাসে হলুদ সারিবদ্ধভাবে রোপণের উপযুক্ত সময়। রোপণ করার পর খড়কুটা দ্বারা ঢেকে রাখলে ভাল হয়। পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে হলুদ পচে বা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। রোপণ করার পর প্রায় ৯-১০ মাস পরে অর্থাৎ ডিসেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি মাসে পাতা শুকিয়ে গেলে পাতা কেটে দিয়ে ১৫ দিন অপেক্ষা করার পর হলুদ উত্তোলন করতে হয়।

লাগানোর দূরত্ব : সাধারণত ৬-৮ ইঞ্চি দূরত্বে লাগাতে হয়।

উপযোগী মাটি : হলুদের জন্য অল্প ছায়াযুক্ত জায়গা প্রয়োজন। সাধারণত বেলে-দোআঁশ ও কিছুটা অম্লভাবাপন্ন মাটিতে অধিক পরিমাণে হলুদ জন্মে থাকে।

বীজ আহরণ : মুথাসহ হলুদ সংগ্রহ করা হয়। বীজের প্রয়োজনীয়তা নেই।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : প্রযোজ্য নয়। বংশবিস্তারে কন্দ ব্যবহার হয়।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : পাতা শুকিয়ে গেলে হলুদ সংগ্রহ করা হয়। মশলা হিসেবে ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করার পর সিদ্ধ করে শুকিয়ে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ : কন্দ।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : হলুদ কাজ করে রক্তবহ স্রোতে। রক্তের বিভিন্ন রোগে হলুদের রস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। শিশুদের কৃমি বিনাশের জন্যও হলুদের ঔষধ দিয়ে থাকেন ভেষজবিদরা। কাঁচা হলুদের রস বয়স অনুপাত প্রযোজ্য পরিমাণে লবণ মিশিয়ে সকালে পাখি পেটে খেলে কৃমি বিনষ্ট হয়। শিশুদের তোতলামি দূর করতে হলুদ খাওয়ান মায়েরা। হলুদের তেল বায়ুনাশক, অম্ল নিবারক ও হজমশক্তি বৃদ্ধিকারক হিসেবে কাজ করে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- কাঁচা হলুদের ১৫-২০ ফোঁটা রস সামান্য লবণ মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেলে কৃমির উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে মাত্রা কমাতে হবে।
- অনেক শিশুর কথা বলতে আটকে যায় বা তোতলায়, সে ক্ষেত্রে ২/৩ গ্রাম হলুদের গুঁড়া ১ চা চামচ ঘিয়ে একটু ভেজে অল্প অল্প করে খেতে হবে। এতে তোতলামি কমে যায়।
- প্রস্রাবের জ্বালা-পোড়ার সাথে পুঁজের মতো লালা ঝরলে (প্রমেহ) এক চা চামচ কাঁচা হলুদের রসের সাথে একটু মধু বা চিনি মিশিয়ে খেলে উপকার হয়।
- অনেকের কোন কোন খাদ্য এলার্জি থাকে। সেই সকল খাবার খেলে শরীরে চাকা চাকা হয়ে ফুলে ওঠে, চুলকায় ও লাল হয়ে যায়। এ অবস্থায় এক ভাগ নিম পাতার গুঁড়া, ২ ভাগ হলুদের গুঁড়া ও ৩ ভাগ আমলকি গুঁড়া একত্রে মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে এক গ্রাম করে কিছুদিন খেলে উপকার হবে। এতে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।
- ২ গ্রাম হলুদের গুঁড়ার সাথে একটু চিনি মিশিয়ে তা দিয়ে শরবত করে খেলে হাঁপানির কিছুটা উপশম হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৯ থেকে ১০ মাসে হলুদ পরিপক্ব হয়।

অন্যান্য ব্যবহার : মসলা হিসাবে হলুদ সবার কাছে অতি পরিচিত। এটি সাধারণত তরকারি রঙিন ও সুস্বাদু করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও প্রাচীনকাল থেকে হলুদ আমাদের দেশে অনুষ্ঠানের শুভ সূচক। বিবাহ বা নতুন বৌ বরণে হলুদ ব্যবহার হয়। গায়ের রঙ উজ্জ্বল ও ত্বকের কমনীয়তা বজায় রাখার জন্যও হলুদ ব্যবহার করা হয়।

আয় : প্রতি বছরে একর জমিতে ৫০,০০০ টাকা থেকে ৬০,০০০ টাকা।

৯৯. হাড়জোড়া

সংস্কৃত নাম : অস্থিসংহা
Botanical Name : *Cissus quadrangularis Linn.*
Common Name : *Harjora*
English Name : *Granadilla Large*
Family : *Vitaceae*

পরিচিতি : হাড়জোড়া বা হাড়ভাঙ্গা বহুবর্ষজীবী একটি চারকোণা বিশিষ্ট সবুজ ও রসালো লতানো উদ্ভিদ। ২ থেকে ৪ ইঞ্চি লম্বা পর্বে পরপর জুড়ে শিকলের আকৃতি ধারণ করে। প্রতিটি পর্বসন্ধির এক পাশ থেকে একটি পাতা এবং অন্য পাশ হতে একটি আকশি গজায়। পাতা হৃৎপিণ্ডের মতো এবং ৩-৫ অংশে বিভক্ত। লতার শীর্ষ থেকে এক একটি পর্ব জুড়ে শিকলের ন্যায় হাড়জোড়া বেলে চলে। লতা যত বাড়তে থাকে তত গোড়ার থেকে পাতা বা আঁকশি ঝরে পড়ে। ছোট ছোট গুচ্ছাকারে লোমযুক্ত সাদা সাদা ফুল ধরে। পাকা ফল দেখতে লাল ও রসালো এবং আকারে মটর দানার মতো।

প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশে সাধারণত সুন্দরবনে এটি প্রাকৃতিকভাবে জন্মে। তবে অন্যান্য এলাকায়ও রোপণ করলে জন্মে। লতানো এই গাছটি বাড়ির শোভা বর্ধনের জন্য লাগানো যেতে পারে।

চাষাবাদ : বীজ থেকে চারা উত্তোলন সম্ভব হলেও পর্বসন্ধিসহ লতার অংশবিশেষ মাটিতে লাগালে সহজেই নতুন গাছ জন্মে। এ জন্য হাড়জোড়ার অন্য এক নাম কাণ্ডবল্লী।

লাগানোর দূরত্ব : ৩ থেকে ৪ ফুট।

উপযোগী মাটি : সব ধরনের মাটিতে হাড়জোড়া জন্মে থাকে।

বীজ আহরণ : অঙ্গজ প্রজনন বা পর্বসন্ধির মাধ্যমে বংশবিস্তার উত্তম।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : বীজের প্রয়োজন হয় না। অঙ্গজ বংশবিস্তার সম্ভব।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : সাধারণত কাঁচা অবস্থায় হাড়জোড়া ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার্য অংশ : গাছের ছাল ছাড়ানো কাণ্ডচূর্ণ ও লতার রস প্রয়োগ করা হয়।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : হাড়জোড়া ফোলা ও ব্যথা সারাতে ও অনিয়মিত ঋতুস্রাবে বিশেষভাবে উপকারী। হাড়জোড়ার লতা ও পাতার অ্যালকোহলীয় নির্যাস উচ্চ রক্তচাপ রোধক ও মূত্রবর্ধক হিসাবে কাজ করে।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- হাড়জোড়া হাড় ভাঙ্গায় অত্যন্ত কার্যকরী। এর ডাঁটা ও পাতা সমপরিমাণ রসুন ও গুগগুল একসাথে বেটে একটু গরম করে ভাঙ্গা স্থানে প্রলেপ দিলে জুড়ে যাবে। প্রলেপটি ২/১ দিন পর পর পরিবর্তন করে লাগাতে হবে।
- কচি ডাঁটা, পোড়া ছাই, বদহজম, পেট ফাঁপা ও অন্যান্য পেটের পীড়ায় ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণতঃ হাড়জোড়ার বৃদ্ধি খুব মন্থর। ব্যবহারের উপযোগী হতে প্রায় ১ বছর সময় প্রয়োজন।

অন্যান্য ব্যবহার : বাগান বা বেড়ার শোভা বৃদ্ধির জন্য হাড়জোড়া লাগানো যেতে পারে।
আয় : প্রতি একর জমি থেকে বার্ষিক ২০,০০০-২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

১০০. হরিতকী

সংস্কৃত নাম : অভয়া
Botanical Name : *Terminalia chebula (Gaertn.) Retz.*
Common Name : *Horitaki*
English Name : *Chebulie Myrobalani, Horitaki*
Family : *Combretaceae*

পরিচিতি : হরিতকী বৃক্ষ জাতীয় পাতা ঝরা উদ্ভিদ। এই গাছ ৪০-৬০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতা ৩ থেকে ৫ ইঞ্চি লম্বা হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গাছের পাতা ঝরে যায় এবং পুনরায় নতুন পাতা গজায়। উগ্র গন্ধবিশিষ্ট ফুল সাদা বা পীত বর্ণের হয়ে থাকে। $\frac{১}{২}$ থেকে ১ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা ৫টি উন্নত শিরাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। ফলে একটি মাত্র বীজ থাকে। ভেষজ চিকিৎসকরা হরিতকী গাছকে মায়ের সাথে তুলনা করে থাকেন। তারা বলেন মানুষের কাছে এ বৃক্ষ মায়ের মতই আপন। মানুষের শরীরে সংক্রমিত প্রায় সব ব্যাধির ঔষধ হিসাবে হরিতকীর ব্যবহার রয়েছে। সকল রোগ হরণ করে বলেই প্রাচীন শাস্ত্রকারকরা এর নাম দিয়েছেন হরিতকী।

প্রাপ্তিস্থান : ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এর বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মে থাকে। এছাড়াও গ্রামাঞ্চলে লাগানো হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে উপরিউল্লেখিত বনাঞ্চলগুলিতে খুব কমই হরিতকী দেখা যায়।

চাষাবাদ : বীজ সংগ্রহের ৩০-৪০ দিনের মধ্যে মাটি ও গোবর ৩ ঃ ১ অনুপাতে ভালভাবে মিশিয়ে বীজতলায় লাগাতে হবে। অঙ্কুরোদগমের হার কম বিধায় ফলের আবরণ ফেলে, ৪৮ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে লাগালে ৫০% বীজ গজায়। তাছাড়া ফল ৪৮ ঘন্টা ভিজানোর পর ১০% ঘন সালফিউরিক এসিডে ২০ মিনিট রেখে পরবর্তীতে ভালভাবে পরিষ্কার করে ফলের আবরণ ফেলে দিয়ে বপন করলে ৭০% বীজ অঙ্কুরিত হয়। চারা গজানোর ৩০-৪৫ দিনের মধ্যে চটের ব্যাগ বা মাটির পটে মাটি ও গোবর ৩ ঃ ১ অনুপাতে মিশিয়ে চারা উঠিয়ে রাখতে হয়। বীজ অঙ্কুরোদগম হতে ১৫-২০ দিনের মতো সময় লাগে। পাঁচ-ছয় মাস বয়সের চারা লাগানোর উপযুক্ত হয়। তবে এক বছর বয়সের চারা লাগানো উত্তম।

উপযোগী মাটি : সাধারণত দোআঁশ মাটি হরিতকী চাষের জন্য উপযোগী। পাহাড়ের ঢালুতেও চাষ করা যায়।

লাগানোর দূরত্ব : ১৮-২৭ ফুট পর পর চারা লাগাতে হয়।

বীজ আহরণ : মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল ফোটে। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফল থেকে বীজ আহরণ করা যায়।

প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ : ১৪০ থেকে ২৩০টি।

বীজ সংগ্রহের সময় ও পদ্ধতি : নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সম্পূর্ণ পাকা ফল সংগ্রহ করা যায়। ফল সংগ্রহ করার পর ভালভাবে পরিষ্কার করে, রৌদ্রে শুকিয়ে তা সংরক্ষণ করতে

হবে। শুকানোর সময় যেন কোন রকম ধুলাবালি না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সংগ্রহের পর ৭-১০ দিন রোদে শুকিয়ে ৪৫ দিন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ : পুরো গাছ ঘন জাল দিয়ে আবৃত করে ফল সংগ্রহ করা যেতে পারে। ফল সংগ্রহ করার পর তা ভালমতো পরিষ্কার করে রৌদ্রে শুকিয়ে ৬-১২ মাস সংরক্ষণ করা যায়। শুকাবার সময় এতে যেন কোন প্রকার ধুলাবালি না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কোনরকম ছত্রাক বা কীট-পতঙ্গ দ্বারা যাতে আক্রান্ত না হয় সংরক্ষণ করার সময় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

ব্যবহার্য অংশ : ফল, ফলের ত্বক ও বাকল।

উপকারীতা/ঔষধি ব্যবহার : হরিতকী রক্ত পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করে, যকৃত, পাকস্থলি ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করে, বল ও যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ পরিষ্কারক, হজমকারক এবং পেটের সমস্যা ও হাঁপানি রোগ দূর করে। বায়ু, ব্যথা ও বাত নিবারণ করে এবং ঘন ঘন প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করে। পুরাতন ক্ষত ও চর্মরোগে উপকারী এবং মুখের ব্রণ দূর করে। চোখের শক্তি বাড়ায় ও চোখ উঠায় উপকারী এবং গর্ভপাত রোধ করে। হরিতকীর মোরব্বা কোষ্ঠকাঠিন্যতা দূর করে এবং অর্শরোগে উপকারী।

কোন্ অংশ কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

- অর্শরোগে : ৩-৫ গ্রাম পরিমাণ হরিতকী গুঁড়া ঘোলের সাথে একটু সৈন্ধব (বিট) লবণ মিশিয়ে খেলে সেরে যাবে।
- শুষ্ক ফল বা ফলের চূর্ণ পানিতে ভিজিয়ে ব্যবহার করতে হয়।
- চোখের রোগে : হরিতকী বেঁটে পানিতে ভিজিয়ে, এ পানি দিয়ে চোখ ধুতে হবে।
- পিত্ত বেদনায় : সামান্য গাওয়া ঘিয়ের সাথে হরিতকী গুঁড়া সেবন করতে হবে।

পরিপক্ব হওয়ার সময়কাল : সাধারণত ৪-৫ বছরে পরিপক্ব হয় তবে পূর্ণাঙ্গ পরিপক্ব হতে ১০ বছর সময় প্রয়োজন।

অন্যান্য ব্যবহার : হরিতকীর কাঠ আসবাবপত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যায়। ফল থেকে ট্যানিন, লেখার কালি ও রঙ পাওয়া যায়। গাছের ডালপালা ও ঝরা শুকনা পাতা জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহার করা যায়।

আয় : হরিতকী চাষ বাণিজ্যিকভাবে খুবই লাভজনক। একটি প্রাপ্তবয়স্ক গাছে ১৫০-২০০ কেজি ফল পাওয়া যায় বাজার মূল্য প্রায় ২,০০০ টাকা। এছাড়াও একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ এককালীন ৫,০০০-৪০,০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রয় করা সম্ভব।

——— 0 ———

১০০টি উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত তথ্য

নং	প্রচলিত বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি নাম	Botanical Name	সংস্কৃত নাম	যে সব রোগে ব্যবহৃত হয়
১.	অর্জুন	*Terminalia arjuna*	Arjuna Myrobalan	*Terminalia arjuna (Roxb.) W. & A.*	অর্জুনা	হাঁপানি, আমাশয়, ঋতুস্রাবজনিত সমস্যা, হৃদরোগ
২.	অনন্তমূল	*Hemidesmus Indicus*	Indian Sarsaparilla	*Hemidesmus indicusR. Br.*	কারিবা	চর্মরোগ, বাত, কুষ্ঠ, সিফিলিস
৩.	অশোক	*Saraca indica*	Ashoka	*Saraca indica Linn.*	অশোকা	কৃমি, পোড়া, রক্ত দূষণ
৪.	অশ্বগন্ধা	*Withania somnifera*	Winter Cherry	*Withania somnifera Dunal.*	অশ্বগন্ধা	রক্তচাপ, শোথ, ভ্রম, অনিদ্রা, শ্বাস, কাশ, ব্রংকাইটিস, কোমর, বাত ব্যথা
৫.	অড়হর	*Cajanus cajan*	Pigeon Pea	*Cajanus cajan*	-	জন্ডিস বা কামলা রোগ
৬.	আকন্দ	*Calotropis gigantea*	Gigantic swallow-wort	*Calotropis gigantea Br.*	আক, অর্ক	চুলের রোগ, দাঁত ব্যথা, দাঁদ
৭.	আগর	*Aquillaria malaccensis*	Agarwood	*Aquillaria malaccensis Lamk.*	অগুরু	বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ, ব্রংকাইটিস, এ্যাজমা ও বাত
৮.	আদা	*Zingiber officinale*	Ginger	*Zingiber officinale Roscoe.*	সুন্থি	নাক, কান, কণ্ঠ ও দাঁতের রোগ, শ্বাস, শ্বেতী, চর্মরোগ

নং	প্রচলিত বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি নাম	Botanical Name	সংস্কৃত নাম	যে সব রোগে ব্যবহৃত হয়
৯.	আপাং	*Achyranthes aspera*	Rough Chaff	*Achyranthes aspera Linn*	আপামার্গ	হাঁপানি, কলেরা, চর্মরোগ, চক্ষু রোগ, কিডনীর রোগ
১০.	আমলকি	*Phyll anthus emblica*	Emblic Myrobalan	*Phyllanthus emblica Linn.*	আমলকী	কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শরোগ
১১.	উলটকম্বল	*Abroma augusta*	Devil's Cotton	*Abroma augusta Linn.*	পীবরী, যোষিণী	স্ত্রী রোগ
১২.	উলটচন্ডাল	*Gloriosa superba*	Glory lily	*Gloriosa superba Linn.*	লাঙ্গলি	বাত, কৃমি, শোথ, ব্রণ, উকুন
১৩.	একাংগি	*Kaempferia galanga*	Black Thron	*Kaempferia galanga Linn.*	-	সর্দি, খুশকি, বাতজ্বর ও চর্মরোগে
১৪.	কদবেল	*Feronia limonia*	Elephant Apple	*Feronia limonia (Linn.) Sw.*	কপিত্থা	দাঁতের মাড়ি ও গলার ঘা, পেট ফাঁপা, অজীর্ণ, হৃদরোগ, রক্ত আমাশয়
১৫.	কনকচাঁপা	*Pterospermum acerifolium*	_	*Pterospermum acerifolium Willd.*	-	রক্তস্রাব বন্ধ করে
১৬.	করবী	*Nerium indicum*	Oleander	*Nerium indicum Mill.*	করভীর	কুষ্ঠ রোগ, চর্মরোগ, চোখ ওঠা
১৭.	কর্পূর	*Cinnamomum camphora*	Camphor	*Cinnamomum camphora L.*	কর্পূর	নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, যকৃত রোগ
১৮.	কামিনী	*Murraya paniculata*	Huney bush	*Murraya paniculata (L.) Jacq.*	-	আমাশয়, শোথ রোগ

নং	প্রচলিত বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি নাম	Botanical Name	সংস্কৃত নাম	যে সব রোগে ব্যবহৃত হয়
৯.	আপাং	*Achyranthes aspera*	Rough Chaff	*Achyranthes aspera Linn*	আপামার্গ	হাঁপানি, কলেরা, চর্মরোগ, চক্ষু রোগ, কিডনীর রোগ
১০.	আমলকি	*Phyll anthus emblica*	Emblic Myrobalan	*Phyllanthus emblica Linn.*	আমলকী	কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শরোগ
১১.	উলটকম্বল	*Abroma augusta*	Devil's Cotton	*Abroma augusta Linn.*	পীবরী, যোষিণী	স্ত্রী রোগ
১২.	উলটচন্ডাল	*Gloriosa superba*	Glory lily	*Gloriosa superba Linn.*	লাঙ্গলি	বাত, কৃমি, শোথ, ব্রণ, উকুন
১৩.	একাংগি	*Kaempferia galanga*	Black Thron	*Kaempferia galanga Linn.*	-	সর্দি, খুশকি, বাতজ্বর ও চর্মরোগে
১৪.	কদবেল	*Feronia limonia*	Elephant Apple	*Feronia limonia (Linn.) Sw.*	কপিত্থা	দাঁতের মাড়ি ও গলার ঘা, পেট ফাঁপা, অজীর্ণ, হৃদরোগ, রক্ত আমাশয়
১৫.	কনকচাঁপা	*Pterospermum acerifolium*	–	*Pterospermum acerifolium Willd.*	-	রক্তস্রাব বন্ধ করে
১৬.	করবী	*Nerium indicum*	Oleander	*Nerium indicum Mill.*	করভীর	কুষ্ঠ রোগ, চর্মরোগ, চোখ ওঠা
১৭.	কর্পূর	*Cinnamomum camphora*	Camphor	*Cinnamomum camphora L.*	কর্পূর	নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, যকৃত রোগ
১৮.	কামিনী	*Murraya paniculata*	Huney bush	*Murraya paniculata (L.) Jacq.*	-	আমাশয়, শোথ রোগ

নং	প্রচলিত বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি নাম	Botanical Name	সংস্কৃত নাম	যে সব রোগে ব্যবহৃত হয়
১৯.	কারান্জা	*Pongamia pinnata*	Indian Beech	*Pangamia pinnata L. Pierre.*	করনজা	গনোরিয়া ও চর্ম রোগ
২০.	কালকাসুন্দা	*Cassia occidentalis*	Western Senna, Negro Coffee	*Cassia occidentalis Linn.*	কাসমার্দা	হুপিং কাশি, কোষ্ঠকাঠিন্য
২১.	কালোজিরা	*Nigella sativa*	Black cumin	*Nigella sativa Linn*	কৃষ্ণজিরাকা	যকৃত, পাকস্থলির, অন্ত্রনালি ও মূত্রাশয়ের সমস্যা
২২.	কালোজাম	*Syzygium cumini*	Black Plum	*Syzygium cuminin (L.) Skeel.*	-	পাকস্থালি, প্লীহা, লিভার ও বহুমূত্র রোগ
২৩.	কালোমেঘ	*Andrographis paniculata*	Creat	*Andrographis paniculata (Burm. f.)*	মহাতিক্ত	জ্বর, যকৃত বিকার, কৃমি
২৪.	কুঁচিলা	*Strychnos nux-vomica*	Nux-Vomica, Snake Wood	*Strychnos nux-vomica Linn.*	কুপিলু	বাতব্যথা, লাকোয়া, ফালেজ, বলগমজনিত রোগ, স্নায়বিক রোগ
২৫.	কুড়চি	*Holarrhena antidysenterica*	Tellicherry tree	*Holarrhena antidysenterica Wall*	কুটাজ	আমাশয়, রক্ত আমাশয়, কৃমি, শ্বাসরোগ, হাঁপানি, ব্রংকাইটিস
২৬.	কুমারীলতা	*Smilax zeylanica.*	Indian Sarsaparilla	*Smilax zeylanica Linn.*	-	গনোরিয়া ও সিফিলিস
২৭.	কুসুম	*Carthamus tinctorius*	Safflower lower	*Carthamus tinctorius Linn.*	কুচনাভা	ত্বকের দাগ, ব্রণের সমস্যায়

নং	প্রচলিত বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি নাম	Botanical Name	সংস্কৃত নাম	যে সব রোগে ব্যবহৃত হয়
২৮.	ক্যালেন্ডুলা	*Calendula officinalis*	Calendula	*Calendula officinalis Linn.*	-	হজম সংক্রান্ত সমস্যা, চর্মরোগ
২৯.	খয়ের	*Acacia catechu*	Catechu	*Acacia catechu Willd.*	খদির, রক্তসার	ডায়রিয়া, গলাব্যথা, চর্মরোগ
৩০.	গন্ধবাদালি	*Paederia foetida*	Chinese Moon creeper	*Paederia foetida Linn.*	গন্ধপ্রসারণী	আমাশয়, পেটের অসুখ, দাঁতের ব্যথা
৩১.	গিলা	*Entada phaseoloides*	Mackay Bean	*Entada phaseoloides (L.) Merr.*	-	জ্বর, কৃমি
৩২.	গোলমরিচ	*Piper nigum*	Black pepper	*Piper nigum Linn.*	মরিচা	জ্বর, সর্দি, গনোরিয়া, পেট ফাঁপা
৩৩.	গোলাপ	*Rosa damascena*	Golap	*Rosa damascena Mill.*	-	অর্শ, কোঁড়া, পেট ব্যথা, যকৃত ও প্লীহার জ্বালা, গলা ও মুখের ঘা
৩৪.	গুলঞ্চ	*Tinospoar cordifolia*	Tinospora	*Tinospora cordifolia (Willd.) Miers.*	গুলঞ্চি	হৃৎপিণ্ড, যকৃত ও পাকস্থলির জ্বালা, বমন, মূর্ছা, কামলা রোগ
৩৫.	গাঁদা	*Tagetes erecta*	Marigold	*Tagetes erecta Linn*	-	কাটা-ছড়ায়, সুতাকৃমি
৩৬.	ঘেড়া নিম	*Melia sempervirens*	Bead Tree	*Melia sempervirens (Linn.) All.*	মহানিম্ব	অর্শরোগ, প্লীহা ও যকৃত রোগ
৩৭.	ঘৃতকুমারী	*Aloe barbadensis*	Aloe Vera, Indian Aloe	*Aloe idica Linn.*	ঘৃতকুমারী কন্যাকুমারী	মেহতা, পাকস্থলি, মস্তিষ্ক ও সন্ধিসমূহের সমস্যা, হাঁপানি

নং	প্রচলিত বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি নাম	Botanical Name	সংস্কৃত নাম	যে সব রোগে ব্যবহৃত হয়
৩৮.	চই	*Pipper chaba*	Cubeba	*Piper chaba Hunter.*	চভিকা	জ্বর, সর্দি, গনোরিয়া, পেট ফাঁপা
৩৯.	চলতা	*Dillenia indica*	Dillenia	*Dillenia idica Linn.*	-	জ্বর ও কাশিতে উপকারী
৪০.	ছাতিম	*Alstonia scholaris*	Devil s Tree	*Alstonia scholaris R. Br.*	সপ্তপর্ণী	ডায়রিয়া, জ্বর, অমাশয়, কুষ্ঠ
৪১.	জবা	*Hibiscus rosa-Sinensis*	China Rose.	*Hibiscus rosa-sinensis Linn.*	-	-
৪২.	জৈন/যোয়ান	*Carum copticum*	Bishop's Weed	*Carum copticum Benth.*	যমানী	যকৃত, পাকস্থলি, হজমের সমস্যা, পাকস্থলির ব্যথা, বায়ু, পেট ফাঁপা
৪৩.	ডালিম	*Punica granatum*	Pomegranate	*Punica granatum Linn.*	ডাদিমা	অপরিষ্কার স্বর, ক্ষুধামন্দ
৪৪.	তেজপাতা	*Cinnamomum tamala*	Bay leaf, Indian Cinnamon	*Cinnamomum tamala Nees.*	তমালপত্র	বাত, যকৃত, অন্ত্রের সমস্যা
৪৫.	তেজবল	*Zanthoxylum rhetsa*		*Zanthoxylum rhetsa (Roxb).*	-	জ্বর, অজীর্ণ, অতিসার, বিসূচিকা
৪৬.	তেঁতুল	*Tamarindus Indica*	Tamarind	*Tamarindus Indica Linn.*	তিন্তিডিক	পিত্তজনিত জ্বর, পিপাসা, দাহ, মূর্ছা, সর্বপ্রকার ফুলকানি
৪৭.	তেলাকুচ	*Coccinia grandis*	Ivy Gourd	*Coccinia cordifolia (L) J. O. Voigt.*	বিম্বী, তুন্ডী	আমাশয় ও রক্ত আমাশয়, চর্মরোগ জিহ্বা ক্ষত, সর্দি মাথাব্যথা, ডায়াবেটিস

নং	প্রচলিত বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি নাম	Botanical Name	সংস্কৃত নাম	যে সব রোগে ব্যবহৃত হয়
৪৮.	তোকমা	*Hyptis suaveolens*	Salvia Seeds	*Hyptis suaveolens (L.) Poit.*	-	পেটের ব্যথা, হৃৎপিণ্ডের সমস্যা
৪৯.	তুলসী	*Ocimum basilicum*	Common Basil	*Ocimum basilicum Linn.*	তুলসী	চর্মরোগ, শিশুর পেটব্যথা, কাশি
৫০.	থানকুনি	*Centella asiatica*	Indian Pennywort	*Centella asiatica (L.) Urban.*	ব্রাহ্মী, মন্ডূকপর্ণী	পেটের ব্যথা, পাকস্থলির রোগ, আমাশয়, কুষ্ঠ, সিফিলিস
৫১.	দারুচিনি	*Cinnamomum verum*	Cinnamon	*Cinnamomum verum Presl.*	গন্ধকল্ক	পাকস্থলি, হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের সমস্যায়
৫২.	ধনিয়া	*Coriandrum sativum*	Coriander	*Coriandrum sativum L.*	ধন্যক, ধান্য	পাতলা পায়খানা, শিশুদের কাশি, বাতরক্ত, বায়ু
৫৩.	ধাইফুল	*Woodfordia fruticosa*	Fire flame Bush	*Woodfordia fruticosa (L) Kurz.*	ধাতকী	পিত্তজনিত রোগে উপকারি
৫৪.	ধুতুরা	*Datura metal*	Thorn Apple	*Datura metel Linn.*	কন্টফল, ঘন্টাপুষ্প	সর্দি, কাশি, হাঁপানি, মাথা ব্যথা, কোমরে ব্যথা
৫৫.	নয়নতারা	*Catharanthus roseus*	Periwinkle	*Catharanthus roseus (L.) G. Don.*	সদাপুষ্প	ডায়াবেটিস, রক্তচাপ
৫৬.	নাগেশ্বর	*Mesua nagassarium*	Cobra's Saffron	*Mesua nagassarium (Burm. F.) Kost.*	নাগকেশর	অর্শরোগ, জ্বর, সর্দি, পেটে বাত, হৃৎপিণ্ড ও রক্তের সমস্যা
৫৭.	নিম	*Azadirachta indica*	Neem	*Azadirachta indica A. Juss.*	নিম্ব	জন্ডিস, অজীর্ণ, বসন্ত

নং	প্রচলিত বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি নাম	Botanical Name	সংস্কৃত নাম	যে সব রোগে ব্যবহৃত হয়
৫৮.	নিশিন্দা	*Vitex negundo*	Chaste Tree	*Vitex negundo Linn.*	নিরগুন্দি	ফোলা ও মচকানোর ব্যথা, কানের রোগ, গুঁড়া কৃমি
৫৯.	পাথরকুচি	*Kalanchoe pinnata*	American Leaf Plant	*Kalanchoe pinnata (Lam.) Pres.*	বটপত্রী, পাষাণভেদ	শীতলজনিত ব্যথা, যকৃত এবং প্লীহার ব্যথা, শ্বেত রোগ
৬০.	পান	*Piper betle*	Betel Leaf	*Piper betle Linn.*	নাগবল্লী	স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালির প্রদাহ, কান ব্যথা
৬১.	পিতরাজ	*Aphanamixis polistachya*	Rayna	*Aphanamixis polistachya*	রোহিতক	প্লীহা, কিডনির সমস্যা
৬২.	পিপুল	*Piper longum*	Long Pepper	*Piper longum Linn.*	পিপ্পলি	কাশি, জীর্ণজ্বর, মেদ, হাঁপানি, বাত
৬৩.	পুদিনা	*Mentha arvensis*	Mint	*Mentha arvensis Linn.*	রোচনী	হজমের সমস্যা, কামলা রোগ, কৃমি
৬৪.	পুনর্ণভা	*Boerhavia diffusa*	Spreading Hogweed	*Boerhaavia diffusa Linn.*	পুনর্নবা, শোথঘ্ন	কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামন্দা, শূলরোগ, লিভারের রোগ, জন্ডিস, শোথ
৬৫.	বকফুল	*Sesban grandifl*	Agati	*Sesbania grandiflora (L) Pers.*	অগস্তি	মাথা ধরা, সর্দি, শরীরের ব্যথা
৬৬.	বহেড়া	*Terminalia belerica.*	Beleric Myrobalan	*Terminalia belerica Rotz.*	বিভিতক	জ্বর, মাথাব্যথা, অর্শ, উদরাময়

নং	প্রচলিত বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি নাম	Botanical Name	সংস্কৃত নাম	যে সব রোগে ব্যবহৃত হয়
৬৭.	বাসক	*Adhatoda vasica*	Malabar Nut	*Adhatoda vasica Nees.*	বাসক	ব্রংকাইটিস, হাঁপানি, কফ, যক্ষা
৬৮.	বিছুটি/ আলকুশী	*Mucuna Pruriens*	Stinging Nettle	*Tragia involucrata Linn.*	কপিকাচ্ছু	বায়ু, কফ, জ্বর
৬৯.	বিষকাঁটালি	*Polygonum hydropiper*	Water pepper	*Polygonum hydropiper L.*	-	ফোড়া, আঙ্গুলের ডিপায় ঘা
৭০.	বেল	*Aegle Marmelos*	Wood Apple. Bengal Quince	*Aegle marmelos (L.) Corr. (Ruta).*	বিল্ব	কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, পেপটিক আলসার, কানের রোগ, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা
৭১.	ভেরেন্ডা	*Ricinus communis*	Castor	*Sida cordifolia L.*	এরেন্ডা	সর্দি, কাশি, হাঁপানি, শোথ, মুখ বাঁকা
৭২.	ভূঁইকুমড়া	*Ipomoea mauritiana*		*Ricinus communis Linn.*	স্বাদুকন্দ, ভূকুষ্মাণ্ড	জ্বর, পিত্তজ্বর, প্লীহা ও লিভার রোগ
৭৩.	ভৃঙ্গরাজ	*Wedelia chinensis*	Trailing Eclipta	*Ipomoea mauritiana Jacq.*	ভৃংগরা	সর্দি, শির, শূল, ইন্দ্রলুপ্ত চর্মরোগ
৭৪.	মেহগনি	*Swietenia mahagoni*	Mehgani	*Swietenia Mahagoni (L. Jacq)*	-	জ্বর, সর্দি, কাশি
৭৫.	মেথী	*Trigonella foenum-graceum*	Fenugreek	*Swietenia mahagoni (L.) Jacq.*	মেথিকা	পিত্তজনিত রোগ
৭৬.	মেহেদী	*Lawsonia inermis*	Samphire. Henna,	*Trigonella foenum-graceum Linn.*	মদয়ন্তিক	চর্মরোগ, খুশকি, গলক্ষত, চুল ওঠা

নং	প্রচলিত বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি নাম	Botanical Name	সংস্কৃত নাম	যে সব রোগে ব্যবহৃত হয়
৭৭.	মুথা	*Cyperus rotundus*	Nut grass	*Lawsonia inermis Linn.*	মুস্তা	আমাশয়, ঘা, জ্বর ও পায়োরিয়া
৭৮.	মুন্ড/ছাগলনাদী	*Sphaeranthus indicus*	Globe-thistle	*Cyperus rotundus Linn.*	-	কৃমি, অর্শরোগ, চুল পড়া
৭৯.	মৌরি	*Foeniculum vulgare*	Sweet Fenel	*Sphaeranthus indicus Linn.*	মাধুরিকা	বক্ষস্থল, যকৃত, প্লীহা ও মূত্রাশয়ের সমস্যা
৮০.	রক্ত চন্দন	*Pterocarpus santalinus*	Read Sandal	*Foeniculum vulgare Gaertn (Mill).*	-	জ্বর, মাথাব্যথা, চোখের রোগ
৮১.	রসুন	*Allium sativum*	Garlic	*Pterocarpus santalinus Linn.*	-	রাতকানা, জীর্ণ জ্বর, শরীরের জড়তা ও পেটের বায়ু
৮২.	রাম তুলসী	*Ocimum gratissimum*	Sweet Basil	*Allium sativum Linn.*	বনতুলসী	মস্তিষ্ক ও ফুসফুসের রোগ, ম্যালেরিয়া, বাত
৮৩.	রীঠা	*Sapindus mukorossi*	Soap Nut	*Ocimum gratissimum Linn.*	অরিষ্টক	কলেরা, উদরাময়, মৃগী, হাঁপানি,, মুছা রোগ
৮৪.	লজ্জাবতী	*Mimosa pudica*	Sensitive plant	*Sapindus mukorosi Gaertn.*	লজ্জালু	আমাশয়, হাত-পা জ্বালা, কানের পুঁজ, ঘামের দুর্গন্ধ, নালি ঘা, অর্শ
৮৫.	লেবুগন্ধী ঘাস	*Cymbopogon citratus*	Lemon Grass	*Mimosa pudica L.*	ভূতৃণ, সুগন্ধতৃণ	পেটে ব্যথা, কৃমি, বাত, শ্বাসনালি প্রদাহ, কুষ্ঠ
৮৬.	শঠী	*Curcuma zedoaria*	Zedoary	*Cymbopogon citratus (DC.) Stap.*	গন্ধশুঠ	কাশি, পাকস্থলি, যকৃত ও হৃৎপিন্ডের রোগ

নং	প্রচলিত বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি নাম	Botanical Name	সংস্কৃত নাম	যে সব রোগে ব্যবহৃত হয়
৮৭.	শতমূলী	*Asparagus racemosus*	Asparagus	*Curcuma zeodoaria Rosc.*	শতাবরী	বসন্ত, শোথ, আমাশয়
৮৮.	শিমুল	*Bombax ceiba*	Silk Cotton Tree	*Asparagus racemosus Willd.*	শ্যামলী	চর্মরোগ, ব্রণ, শ্বেতস্রাব, ডায়রিয়া, কিডনির ক্ষত রোগ
৮৯.	শেফালী/শিউলী	*Nyctanthes arbortristis*	Night Jasmine	*Bombax ceiba Linn.*	পারিজাত	জ্বর, বাত, কৃমি, খুশকি
৯০.	শ্বেত চন্দন	*Santalum album*	Sandal Wood	*Nyctanthes arbortristis Linn.*	চন্দন	উষ্ণ রক্তচাপ, চর্মরোগ, ফোলা
৯১.	শ্বেতদ্রোন/চেতন নাথ	*Leucas cephalotes*	-	*Santalum album Linn.*	দ্রোণপুষ্পি	চুলকানি, ফুল কাশি ও সর্দি
৯২.	সজিনা/সাজনা	*Moringa oleifera*	Drumstick	*Leucas cephalotes (Roth.) Spreng.*	শিগ্রু	অভ্যন্তরীণ প্রদাহ, প্লীহা বৃদ্ধি, অরুচি, হাঁপানি, গেঁটে বাত
৯৩.	সর্পগন্ধা	*Rauwolfia serpentina*	Snake Root	*Moringa oleifera Lam.*	সর্পগন্ধা	পেটের ব্যথা, ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, জ্বর
৯৪.	সিন্দুরী	*Bixa orellana*	Monkey Turmeric	*Rauwolfia serpentina (Linn.) Benth.*	-	জ্বর, রক্ত আমাশয়, কামলা, বৃক্কজনিত রোগ
৯৫.	সুপারি	*Areca catechu*	Betel Nut	*Bixa orellana Linn.*	পোগ	গুঁড়া কৃমি, রক্ত আমাশয়, পেটের পীড়া, মাড়ি ফোলা
৯৬.	সোনাপাতা	*Cassia angustifolia*	Senna/Tinav-ele Senna	*Areca catechu L.*	স্বর্ণপত্রিকা, কল্যাণী	গেঁটে বাত, মৃগীরোগ, কৃমি

নং	প্রচলিত বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি নাম	Botanical Name	সংস্কৃত নাম	যে সব রোগে ব্যবহৃত হয়
৯৭.	সোনালু	*Cassia fistula*	Indian Laburnum	*Cassia angustifolia Vahl.*	শ্যোনাক, শুকনাশ	কলেরা, ডিপথেরিয়া, জণ্ডিস, রক্ত আমাশয়
৯৮.	হলুদ	*Curcuma longa*	Termeric	*Cassia fistula L.*	হরিদ্রা	কৃমি, হামজ্বর, চুলকানি
৯৯.	হাড়জোড়া	*Cissus quadrangularis*	Grandilla	*Curcuma longa Linn.*	অস্থিসংহা	হাড়ভাঙ্গা, ফোলা, ব্যথা, বদহজম
১০০.	হরিতকি	*Terminalia chebula*	Chebulic Myrobalan	*Cissus quadrangularis Linn.*	অভয়া	পেটের সমস্যা, হাঁপানি, বায়ু, বাত
				Terminalia chebula (Gaertn.) Retz.		

অঞ্চলভিত্তিক ঔষধি উদ্ভিদের তালিকা

ঢাকা বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	প্রাপ্ত ঔষধি উদ্ভিদের নাম
০১।	ঢাকা	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, তুলসী, তেজপাতা, শিমুল, বেল, হলুদ, কুড়চি, কুসুম, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
০২।	নারায়ণগঞ্জ	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, তুলসী, বহেড়া, তেঁতুল, বেল, সুপারি, ডালিম, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ।
০৩।	গাজীপুর	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, তুলসী, বহেড়া, সজিনা, বেল, ঘৃতকুমারী, কালোমেঘ, আকন্দ, নিশিন্দা, বিষকাঁটালি, হাড়জোড়, তেঁতুল, ডালিম, বেল, ঘোড়ানিম, শিমুল, কুড়চি, কুসুম, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
০৪।	নরসিংদী	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, তুলসী, বহেড়া, বেল, সুপারি, শিমুল, তেঁতুল, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ।
০৫।	কিশোরগঞ্জ	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, তুলসী, বহেড়া, রক্তচন্দন, উলটকম্বল, ধুতুরা, ঘোড়ানিম, বেল, সুপারি, সোনালু, কুড়চি, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
০৬।	নেত্রকোনা	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, তুলসী, শিমুল, ঘোড়ানিম, কুড়চি, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
০৭।	ময়মনসিংহ	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, তুলসী, তেজপাতা, তেঁতুল, বেল, সুপারি, নাগেশ্বর, কর্পুর, শিমুল, কুড়চি, কুসুম, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।

ক্রমিক	জেলার নাম	প্রাপ্ত ঔষধি উদ্ভিদের নাম
০৮।	শেরপুর	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, তুলসী, বহেড়া, চন্দন, সজিনা, বেল, সুপারি, কুড়চি, কুসুম, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
০৯।	জামালপুর	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, তুলসী, তেজপাতা, শিমুল, তেঁতুল, নাগেশ্বর, সুপারি, কুড়চি, কুসুম, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
১০।	টাংগাইল	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, তুলসী, বহেড়া, বেল, শিমুল, সোনালু, ঘোড়ানিম, কুড়চি, সিন্দুরী, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
১১।	মানিকগঞ্জ	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, তুলসী, তেঁতুল, বেল, সুপারি, শিমুল, সোনালু, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
১২।	রাজবাড়ী	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, তুলসী, সজিনা, ঘোড়ানিম, অশ্বগন্ধা, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
১৩।	ফরিদপুর	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, তুলসী, বেল, সুপারি, মেহগিনি, সোনালু, শিমুল, ঘোড়ানিম, পিতরাজ, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
১৪।	গোপালগঞ্জ	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, তুলসী, নাগেশ্বর, উলটকম্বল, কালোমেঘ, অশোক, সোনালু, ঘোড়ানিম, বেল, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
১৫।	মাদারীপুর	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, তুলসী, বেল, ছাতিম, শিমুল, ঘোড়ানিম, পিতরাজ, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
১৬।	শরীয়তপুর	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, তুলসী, বেল, সুপারি, শিমুল, সোনালু, জবা।
১৭।	মুন্সীগঞ্জ	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, অশোক, তেঁতুল, সুপারি, বেল, সোনালু, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ।

চট্টগ্রাম বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	প্রাপ্ত ঔষধি উদ্ভিদের নাম
১৮।	কক্সবাজার	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়া, তেঁতুল, ডালিম, সুপারি, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
১৯।	চট্টগ্রাম	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, সুপারি, ডালিম, বেল, শিমুল, পিতরাজ, কুড়চি, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
২০।	বান্দরবান	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়া, আকন্দ, কালোমেঘ, গন্ধবাদালি, গোলমরিচ, উলটকম্বল, তেজপাতা, থানকুনি, হাড়জোড়া, সর্পগন্ধা, সিন্দুরী, নিশিন্দা, তেঁতুল, বেল, সুপারি, ঘোড়ানিম, শিমুল, সোনালু কুড়চি, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
২১।	রাঙ্গামাটি	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বেল, বহেড়া, কালোমেঘ, কালোধুতুরা, সর্পগন্ধা, তেঁতুল, সুপারি, শিমুল, কুড়চি, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ. জবা।
২২।	খাগড়াছড়ি	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, সর্পগন্ধা, বহেড়া, শ্বেতচন্দন, মেন্দা, অশোক, তেজপাতা, দারুচিনি, গোলমরিচ, সুপারি, শিমুল কুড়চি, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
২৩।	ফেনী	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়া, চন্দন, বকফুল, ঘৃতকুমারী, বেল, অশোক, বকুল, সুপারি, ডালিম, তেঁতুল, শিমুল, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।

ক্রমিক	জেলার নাম	প্রাপ্ত ঔষধি উদ্ভিদের নাম
২৪।	নোয়াখালী	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়া, অর্জুন, অশোক, সর্পগন্ধা, কালোমেঘ, চন্দন, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, নিশিন্দা, পুনির্না, সজিনা, শিমুল, ঘোড়নিম, সুপারি, বেল, তেঁতুল, পিতরাজ, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
২৫।	লক্ষ্মীপুর	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, সজিনা, সুপারি, তেঁতুল, ডালিম কারনজা, বেল, বয়না, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
২৬।	চাঁদপুর	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, সুপারি, শিমুল, সজিনা, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা
২৭।	কুমিল্লা	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, পাথরকুচি, বেল, ডালিম, তেঁতুল, সুপারি, শিমুল, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
২৮।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, ডালিম, সুপারি, তেঁতুল, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।

সিলেট বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	প্রাপ্ত ঔষধি উদ্ভিদের নাম
২৯।	সিলেট	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, সুপারি, পান, গোলমরিচ, চন্দন, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৩০।	সুনামগঞ্জ	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, সুপারি, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, বাসক, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।

ক্রমিক	জেলার নাম	প্রাপ্ত ঔষধি উদ্ভিদের নাম
৩৭।	চুয়াডাঙ্গা	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বেল, তেঁতুল, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৩৮।	মেহেরপুর	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, ঘোড়ানিম, সুপারি, নাগেশ্বর, তেঁতুল, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৩৯।	কুষ্টিয়া	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়, উলটকম্বল, তেঁতুল, সুপারি, বেল, কদবেল, ডালিম, মেহগিনি, ঘোড়ানিম, শিমুল, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৪০।	মাগুরা	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বেল, কদবেল, ঘোড়ানিম, সুপারি, তেঁতুল, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৪১।	নড়াইল	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, সুপারি, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৪২।	বাগেরহাট	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, সুপারি, বেল, তেঁতুল, শিমুল, ঘোড়ানিম, পান, সুপারি, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।

বরিশাল বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	প্রাপ্ত ঔষধি উদ্ভিদের নাম
৪৩।	বরিশাল	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়া, সুপারি, সোনালু, ঘোড়ানিম, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।

ক্রমিক	জেলার নাম	প্রাপ্ত ঔষধি উদ্ভিদের নাম
৪৪।	পিরোজপুর	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়া, তেঁতুল, বেল, সুপারি, সোনালু, শিমুল, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা
৪৫।	ঝালকাঠি	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়া, সুপারি, বেল, মেহগিনি, ঘোড়ানিম, নাগেশ্বর, শিমুল, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৪৬।	পটুয়াখালী	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়া, তেঁতুল, সুপারি, বেল, সোনালু, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৪৭।	বরগুনা	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়া, তেঁতুল, সোনালু, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৪৮।	ভোলা	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়া, সুপারি, তেঁতুল, বেল, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৪৯।	রাজশাহী	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়া, কারানজা, সাজনা, উলটকম্বল, নিশিন্দা, তেঁতুল, বেল, কদবেল, শিমুল, ছাতিম, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৫০।	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বেল, কদবেল, তেঁতুল, ঘোড়ানিম, কারানজা, সোনালু, শিমুল, খয়ের, রয়না, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, ঘৃতকুমারী, অশোক, স্বর্পগন্ধা, অশ্বগন্ধা, জবা।
৫১।	নাটোর	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, শিমুল, উলটকম্বল, বেল, সুপারি, তেঁতুল, কারানজা, ছাতিয়ান, ঘোড়ানিম, সোনালু, নাগেশ্বর, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।

ক্রমিক	জেলার নাম	প্রাপ্ত ঔষধি উদ্ভিদের নাম
৫২।	পবনা	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, অশোক, সুপারি, বেল, করানজা, নাগেশ্বর, সোনালু, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৫৩	সিরাজগঞ্জ	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়া, অশোক, সুপারি, নাগেশ্বর, সোনালু, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৫৪।	বগুড়া	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়া, তেঁতুল, খয়ের, ঘোড়ানিম, বেল, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৫৫।	নওগাঁ	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়া, সাজনা, তেঁতুল, বেল, কদবেল, মেহগিনি, খয়ের, শিমুল, করানজা, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৫৬।	জয়পুরহাট	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়া, শিমুল, ঘোড়ানিম, তেঁতুল, করানজা, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৫৭।	গাইবান্ধা	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, ঘোড়ানিম, শিমুল, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৫৮।	দিনাজপুর	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, সাজনা, অশোক, শিমুল, সোনালু, নাগেশ্বর, ঘোড়ানিম, বেল, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৫৯।	রংপুর	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়া, তেঁতুল, ডালিম, বেল, সুপারি, লজ্জাবতী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।

ক্রমিক	জেলার নাম	প্রাপ্ত ঔষধি উদ্ভিদের নাম
৬০।	কুড়িগ্রাম	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, রক্তচন্দন, ধুতুরা, লজ্জাবতী, তেঁতুল, ডালিম, বেল, সুপারি, ঘোড়ানিম, শিমুল, মেহগিনি, সোনালু, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৬১।	লালমনিরহাট	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, ডালিম, তেঁতুল, সুপারি, ঘোড়ানিম, শিমুল, পিতরাজ, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৬২।	নীলফামারী	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, মেহগিনি, ঘোড়ানিম, আমলকি, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৬৩।	ঠাকুরগাঁও	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, সাজনা, ঘৃতকুমারী, পিতরাজ, তেঁতুল, ডালিম সুপারি, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।
৬৪।	পঞ্চগড়	আমলকি, হরিতকি, নিম, অর্জুন, বাসক, তুলসী, বহেড়া, ডালিম, বেল, শিমুল, সোনালু, নাগেশ্বর, লজ্জাবতী, ভূঁইকুমড়া, শতমূলী, ধনিয়া, তালমূল, তেজবল, আদা, হলুদ, জবা।

বি. দ্র. বিভাগ ও জেলাওয়ারী এটি সাধারণ তালিকা। এর ব্যতিক্রমও হতে পারে।

মেয়াদভিত্তিক ঔষধি উদ্ভিদের তালিকা

স্বল্পমেয়াদি উদ্ভিদ		মধ্যমমেয়াদি উদ্ভিদ		দীর্ঘমেয়াদি উদ্ভিদ
অনন্তমূল	ধনিয়া	অকন্দ	অর্জুন	তেঁতুল
অড়হর	ধাইফুল	উলটকম্বল	অশোক	দারুচিনি
অশ্বগন্ধা	ধুতুরা	করবী	আগর	নাগেশ্বর
আদা	নয়নতারা	কর্মিনী	আমলকি	নিম
আপাং	পান	কালকাসুন্দা	কদবেল	পিতরাজ
উলটচন্ডাল	পিপুল	গোলাপ	কনকচাঁপা	বহেড়া
একাংগি	পুদিনা	ডালিম	কর্পূর	বেল
কালোজিরা	পুনর্ণভা	নিশিন্দা	কারনজা	মেহগিনি
কালোমেঘ	বিষ কাটালি	পাথরকুচি	কালোজাম	রক্তচন্দন
কুমারীলতা	বেড়েলা	বকফুল	কুঁচিলা	রীঠা
কুসুম	বিছুটি	বাসক	কুড়চি	শিমুল
ক্যালেন্ডুলা	ভেরেন্ডা	ভেরেন্ডা	খয়ের	শিউলী
গন্ধবাদালি	ভৃঙ্গরাজ	মেহেদী	গিনা	শ্বেতচন্দন
গোলমরিচ	মেথি	লজ্জাবতী	গুলঞ্চ	সজিনা
গাঁদা	মুথা	লেবুঘাস	গোড়ানিম	সিন্দুরী
ঘৃতকুমারী	মুভি/ছাগলনাদী	শতমূলী	চালতা	সুপারি

স্বল্পমেয়াদি উদ্ভিদ		মধ্যমমেয়াদি উদ্ভিদ	দীর্ঘমেয়াদি উদ্ভিদ	
চই	মৌরি	সোনাপাতা	ছাতিম	সোনালু
জোয়ান	রসুন	সর্পগন্ধা	জবা	হরিতকি
তেজবল	রাম তুলসী		তেজপাতা	
তেলাকুচা	শঠী			
তোকমা	শ্বেতদ্রোন			
তুলসী	হলুদ			
থানকুনি	হাড়জোড়া			

সহায়ক গ্রন্থ

১. চিরঞ্জীব বনৌষধি (১ম খণ্ড থেকে ১০ম খণ্ড পর্যন্ত)-- আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য
২. ফুলগুলি যেন কথা– দ্বিজেন শর্মা (বাংলা একাডেমী)
৩. লতা পাতার গুণ বা দেশীয় গাছগাছড়ার উপকারীতা– কবিরাজ এম. এ. চৌধুরী
৪. ভেষজ উদ্ভিদ ও লোকজ ব্যবহার (প্রথম খণ্ড)– অবনীভূষণ ঠাকুর (অবসর)
৫. ওষুধি গাছগাছড়া– এ. বি. এম. জাওয়ায়ের হোসেন (গ্রন্থনা প্রকশনা সংস্থা)
৬. ঔষধি উদ্ভিদ পরিচিতি, উপযোগিতা ও ব্যবহার– ড. সামসুদ্দিন আহমদ (দিব্য প্রকাশ)
৭. The Seeds Savers' Handbook- Michel & Jude Fanton
৮. Plant as a Source of Antidiabetic Agents A N R A P —November-16-17, 2000
৯. India's Medicinal Heritage— Goundation for Revitalisation of Local Health Traditions (FRLHT)
১০. সামাজিক বনায়ন ও বন ব্যবস্থাপনা–এ বি এম জাওয়ায়ের হোসেন
১১. স্বাস্থ্য লাভে আটটি রহস্য– এম ডি এথেল রীড নেলসন
১২. বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা ম্যানুয়েল– কামাল সিদ্দীকি ও আলী
১৩. বাঁচার জন্য ওষুধি উদ্ভিদ– কনজারভেনশ সেন্টার
১৪. হৃদ যন্ত্রের ইতিবৃত্ত– জনসন মেরিলিন
১৫. পরিবেশ কথা কাব্য– বাংলা একাডেমী

গাছের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করিতে হইলে গাছের নিকট যাইতে হইবে। সেই ইতিহাস অতি জটিল এবং বহু রহস্যপূর্ণ। এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বারের পার্শ্বে নিঃশব্দে যাদের জীবনের লীলাখেলা চলিতেছে তাহাদের গভীর মর্মের কথা তাহারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চল্য ও মনের আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত করিল।

—জগদীশচন্দ্র বসু।